নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ

নির্বাচিত ত্রৈলোক্যনাথ

১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশক
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
বিশ্বদীপ ঘোষ
চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২
ফোন : ২২৫৭ ৩১৪৪, ৯৮৩০৩৭৯৮৪২

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ
বর্ণনা
৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা-৭০০ ০৩২
ফোন : ০৩৩-৬৪৫১ ৩৩৪২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

প্রকাশকের কথা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সাহিত্য আদৌ দুষ্প্রাপ্য নয়। একাধিক প্রকাশক তা প্রকাশ করেছেন সাধ্যমত যত্নে। তথাপি, আমাদের মনে হয়েছে ক্লাসিক গোত্রের এ-জাতীয় রচনার সুমুদ্রিত রূপ এখনও অধরাই থেকে গিয়েছে। বর্তমান সংগ্রহটি সেই অভাব পূরণেরই উচ্চাভিলাষ। ১৯৭৩ সালে 'গ্রন্থমেলা' যে-সংস্করণটি দু-খণ্ডে প্রকাশ করেছিল সেই সংস্করণের পাঠই নির্ভরযোগ্য বিবেচনায় বর্তমান সংগ্রহটিতে ওই পাঠ এবং পুরোনো বানান-ই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে, উদ্ধৃতি চিহ্নের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহার করা হয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা ছিল কোন যুক্তিতে বর্জন ও গ্রহণ ঘটবে। অকপটে স্বীকার করা কর্তব্য সাধ ও সাধ্যের টানাটানিই এর মূলে। মধ্যপন্থা হিসাবে তাই ত্রৈলোক্য-সাহিত্যের একটা অনু-মানচিত্র এই সংগ্রহ। আবার বিশেষ ঘরানার লেখক ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যের একটা সামগ্রিক স্বাদ যাতে এ কালের নবীন পাঠক আস্বাদন করতে পারেন নির্বাচনের কাজটি সেভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব প্রকাশকের। গৌতম ভদ্র, প্রবীর মুখোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, রণবীর লাহিড়ী, পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল এ কাজে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন।

ভূমিকা

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত যে কয়জন সাহিত্য সমালোচকের টীকা টিপ্পনী নজরে আসে তার মধ্যে অনিবার্যভাবে টের পাওয়া যায় একধরনের উদ্বেগ। উদ্বেগ এই কারণে যে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য মূলধারার সাহিত্য থেকে এতটাই সরে গিয়ে, এতটাই অন্যরকম ও অপরিচিত যে প্রচলিত কোনও সাহিত্যের খোপে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। অথচ সাহিত্য সমালোচনার যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপ্তি ও ক্ষমতা তা নির্ভর করে কিছু সূত্রবদ্ধ তাত্ত্বিক রীতি-নীতির ওপর যার মধ্যস্থতায় একজন লেখক পেয়ে যান অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি আর মর্যাদা। এই একই ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ত্রৈলোক্যনাথের ব্যাপারেও। তাঁকে মূলধারার সাহিত্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া তার প্রথম পদক্ষেপ হল চিহ্নিত করার কাজ, অর্থাৎ কী জাতীয় সাহিত্য তিনি লিখে গেছেন তার যথার্থ সনাক্তকরণ ও নামকরণ। সূত্রায়ণের এই যে তৎপরতা তা ত্রৈলোক্যনাথের মত ক্ষমতাসম্পন্ন লেখককে কেটে ছেঁটে সাধারণভাবে বোধগম্য করে পাঠকের কাছে পেশ করার একটি উপায়। এ জাতীয় প্রয়াসে যা প্রধান হয়ে ওঠে তা হল লেখকের সংহত নবনির্মিত পরিচয়টি।

প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য-সমালোচনার এই যে জঁনর নির্মাণের প্রক্রিয়া তাকে আর একটু কাছ থেকে দেখা যেতে পারে। *বাংলার লেখক* (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে যে ভারডিক্ট দিয়েছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা Satirist।' ভাল কথা। কিন্তু এর পরেই উপরোক্ত উচ্চারণকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশ্ব-সাহিত্যের আঙিনায় এবং ব্যঙ্গসাহিত্যের যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি তারও একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দর্শানো হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গে এই যে ব্যঙ্গসাহিত্যের সাধারণ অবতারণা তার নির্যাস সমালোচকের বিবৃতিতেই শোনা যাক—'ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, কিন্তু কোনমতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য হইতে পারে না।' সাহিত্যের বিভিন্ন জঁনরের মধ্যে যে ভেদাভেদ ও স্তরবিন্যাস তৈরি করা, নামান্তরে যা ক্ষমতারই বিন্যাস, তাই খুব চতুরভাবে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যকে প্রান্তে ঠেলে দেয়। সাহিত্যের এই যে শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) তৈরি করা গেল সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান একরকম পূর্বনির্ধারিত। এক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-আলোচনা ও তার শ্রেণীকরণ স্থান পেয়েছে এক 'normative discourse'-এর মধ্যে।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-আলোচনায় আর একটি প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ করা যায়—তাঁর সাহিত্য ও কর্মজীবনকে এক করে দেখা। এ ব্যাপারে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন প্রমথনাথ বিশী—'ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্মশক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ। এই জন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিকদের অনেকেই কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হয়তো তাঁহারা আর শিল্পমাধ্যমের প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না' (*বাংলার লেখক*, প্রথম খণ্ড)। অতএব, ব্যঙ্গসাহিত্যের পেছনে প্রেরণা হিসেবে যা সক্রিয় তা হল এক ধরনের অভাববোধ, ক্ষতিপূরণের তাগিদ। ব্যঙ্গ সাহিত্যের প্রেরণাকে এতটা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার অর্থ ব্যঙ্গসাহিত্যিককে একজন মধ্যমানের, সীমিত ক্ষমতা-সম্পন্ন লেখকের স্তরে নামিয়ে আনা।

মোটামুটি একই কথা ('তাঁহার রচনা তাঁহার জীবনকর্মেরই একটা প্রক্ষেপ মাত্র'—প্রমথনাথ বিশী, *বাংলার*

লেখক, প্রথম খণ্ড) সজনীকান্ত দাস ভিন্ন একটি অবস্থান থেকে বলেছেন, যেখানে ত্রৈলোক্যনাথকে সিরিয়াস সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এবং সেক্ষেত্রে সমালোচকের কাজ হবে লেখকের সাহিত্য-কর্মটিকে 'সামাজিক ও পারিবারিক মানুষের সংস্কারে' খুঁজে নেওয়া। এই ত্রৈলোক্যনাথ-বহির্ভূত ত্রৈলোক্যনাথ চর্চায় সজনীকান্ত দাসের ভূমিকা কিছুমাত্র কম নয়। অবশ্য এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে স্বপ্নলোকে আবির্ভূত ত্রৈলোক্যনাথের কল্পিত বয়ান—'আমি বালক-মনোরঞ্জক গল্প লিখিবার জন্য কলম ধরি নাই। আমি এই সত্যটাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সততা ও সুনীতি মানুষের একমাত্র রক্ষা কবচ, সংসারে ও সমাজে বাস করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করিতে করিতে যে সাধ্যমত পরের উপকার করিবে, তাহার মার নেই ... আমি নিছক ভূতুড়ে গল্প বলিবার জন্য 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'র শরণাপন্ন হই নাই। তোমরা ভুল করিয়া আমাকে শিশু সাহিত্যিকের পর্যায়েই ফেলিয়া রাখিলে, আমার জীবন দর্শনকে জীবনে কাজে লাগাইলে না' (*দেবালয়, দেব সাহিত্য কুটীর*)। এক্ষেত্রে সজনীকান্ত দাসকে যা পীড়া দেয় তা হল ত্রৈলোক্যনাথের 'খ্যাতি বা অখ্যাতি' কেন 'ভূতের গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত' হবে। সুতরাং, এ ব্যাপারে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-কীর্তিকে অন্য ভিতের (সামাজিক, নৈতিক শুদ্ধিকরণ) ওপর দাঁড় করাতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস সাহিত্যের শরীরে ঘটিয়ে ফেলেছেন এক মস্ত বিভাজন··· বালক/শিশু সাহিত্য বনাম প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্য, মনোরঞ্জক ('আজগুবি') বনাম সিরিয়াস সাহিত্য ('পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়')। এই বিভাজনকে পেছনে রেখে যে আলোচনা সংঘটিত হয় সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য অনুপস্থিত আর থাকলেও সে কর্মটি অন্য এক ত্রৈলোক্যনাথের যা ভীষণভাবে 'mediated' ও 'translated'।

এখানে যা প্রয়োজন তা হল 'সিরিয়াস সাহিত্যে'র বলয় থেকে ত্রৈলোক্যনাথকে উদ্ধার করা। যে নীতিবাগীশ, 'উদ্দেশ্যমূলক' সাহিত্যের তকমা তাঁর গায়ে মেরে দেওয়া হয়েছে তার বিরোধিতায় নামলে প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার তাঁর সাহিত্য কি নিছক ব্যঙ্গাত্মক। যদিও ব্যঙ্গের উপস্থিতি তাঁর সাহিত্যে অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাসকে শুধুমাত্র ব্যঙ্গাত্মক বলে চালিয়ে দেওয়াটা তাঁর কমিক বোধ ও দর্শনের অপরিণত ও অসম্পূর্ণ পাঠ। আসলে কমিক সাহিত্যের অনেক রকমফের আছে—এর একদিকে যেমন দেখতে পাওয়া যায় স্যাটায়ার/হিউমার/আয়রণি'র উপস্থিতি। অন্যদিকে দেখা মিলবে (আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক সময়ে) অ্যাবসার্ড/গ্রোটেস্ক/বিজারে'র মতো অস্বস্তিকর উপাদান। কমিক পরিবারের এই সব সভ্যরই একটি সাধারণ প্রপার্টি থেকে যায় আর সেটি হল অসঙ্গতির বোধ, যদিও এই বোধ একান্তভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি পুষ্ট।

তাহলে প্রশ্ন হল—ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-উপন্যাস যদি সেভাবে ব্যঙ্গাত্মক না হয় তাহলে কাছাকাছি কিছু ভাবা যায় কি না? 'আজগুবি' তকমাটা এক্ষেত্রে চলনসই, কারণ লেবেল হিসেবেও এটি বেশ অনিশ্চিত। এর যে ইংরেজি প্রতিশব্দ (অ্যাবসার্ড) তা ব্যবহারে নাই বা আনলাম। সংস্কৃতিগত কারণে শব্দটি বেশ ভারী কারণ সে বয়ে বেড়ায় ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের একাধিক চিহ্নকে যার সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের কোনও রকম যোগই ছিলনা। তাঁর সাহিত্যের যে আজগুবি চরিত্র সেটি প্রথম সঠিকভাবে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং *কঙ্কাবতী* সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য ('অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা') তা কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে যখন *কঙ্কাবতী* প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পরিসরে যে অঘোষিত, প্রায় অদৃশ্য ঘটনা ঘটে যায় সেটি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নজরে ধরা পড়ে—'.. আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাংলায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারেন। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই' (*সাধনা*, ১৮৯২)। ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাবের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব তার সঙ্গে এডওয়ার্ড লিয়ারের ভীষণরকম সাদৃশ্য চোখে পড়ে। নন-সেন্স সাহিত্যের গবেষক ও তাত্ত্বিক মাইকেল হেমান লিয়ারের এই যুগান্তকারী ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—'When Lear's first work appeared, the children's literature market was in a fairly dire state, being dominated on one hand by utilitarian

efforts at edification and on the other hand by morlistic and didactic religious works. To the children and adults forced to read such works, Lear's non-sense must have displayed a remarkable freshness and originality.' দুই সাহিত্যিকেরই এখানে যা স্বীকৃত অবদান তা হল সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখাকে অভিভাবকতন্ত্র আর জ্যাঠামির হাত থেকে রেসকিউ করা।

এভাবেই তাঁর আজগুবি সাহিত্য 'সজীব', 'সজাগ', 'কৌতুকাবহ' ও নির্ভার হয়ে 'লিটারেরি নন-সেন্স'-এর খুব কাছাকাছি চলে আসে। তাঁর মৃত্যুর বছর চারেক পর ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের *আবোল-তাবোল* যার ভূমিকায় লেখক 'খেয়াল রসে'র অবতারণা করেন যাকে মাইকেল হেনাম ভারতীয় রসতত্ত্বের 'দশম রস' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে সুকুমার রায় শুধুমাত্র ভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনা করেছেন তাই নয়, সেই সাহিত্যকে গ্রহণযোগ্য করার তাত্ত্বিক ভিতটাও তৈরি করে গেছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ 'ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো-পশু-পক্ষী' নিয়ে যে আজগুবি গল্প ফেঁদেছেন তার তাত্ত্বিক আলোচনার 'কনসেপচুয়াল টুলস' কিন্তু সে সময় তৈরি ছিল না; যদিও সে কারণে তাঁর সাহিত্যের রসাস্বাদনে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য নন-সেন্স লিটারেচর না হলেও তাঁর আজগুবি সাহিত্যে একটি 'নন-সেন্স এফেক্ট' থেকেই যায়। তবে কোনওভাবেই তাকে 'নন-সেন্স লিটারেচার'-এর যে পশ্চিমি ডিসকোর্স তার মধ্যে আনা যায় না। এই ডিসকোর্সে একটা স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ করা যায় নন-সেন্স এর উৎপত্তি নিয়ে। একদল বলেন—'ননসেন্স এফেক্ট' অর্থাধিক্যের ফলস্বরূপ, অর্থাৎ অর্থের অভাব নয়, অর্থের বাহুল্যই লিটারেরি ননসেন্স'-এর প্রাণবায়ু। এই অবস্থান থেকেই উমবার্তো ইকো নার্সারি রাইমের ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে ব্যবহার করেন পাঠগত ভাষাবিজ্ঞান (textual philology), স্ট্রাকচারালিস্ট চিহ্নতত্ত্ব, লাকাঁ'র মন সমীক্ষণ, চমস্কি'র রূপান্তরধর্মী ভাষাতত্ত্ব। এই একই কারণে এডওয়ার্ড লিয়ার ও লিউইস ক্যারোলকে তত্ত্বের ভিড় ঠেলে স্পর্শ করা প্রায় অসম্ভব। এখানে এই তত্ত্ব-নির্ভরতা যে বিশ্বাস ও বোধ থেকে উঠে আসে তা হল, ননসেন্স টেক্সটের ভিতরে থাকে এক বিপুল অর্থের চাপ (semantic pressure) যার মুখ খুলে বাইরে নিয়ে আসতে গেলে প্রয়োজন হয় একাধিক ক্রিটিকাল যন্ত্রপাতির। দু-হাজার ছয়ে প্রকাশিত *ফিলজফি অফ ননসেন্স* গ্রন্থে লেসারল (Jean-Jaques Lecerele) পশ্চিমের এই ননসেন্স দর্শনকে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে সামনে উঠে এসেছে ননসেন্স-এর সঙ্গে রাজনীতির গভীর যোগাযোগ, আর তাই লিটারেরি ননসেন্সকে বুঝতে চাওয়ার এহেন ভীতিপ্রদ তাত্ত্বিক আয়োজন।

এই প্রবণতার বিপরীতে গত শতকের প্রথম দিকে বিশ্লেষণের আর একটি ধারাও পশ্চিমি সংস্কৃতিতে দেখা যায়। নন-সেন্স সাহিত্যের ঔপন্যাসিক ইতালির জিয়রজিও ম্যাংগানেল্লি (১৯২২-৯০) এক নতুন ম্যানিফেস্টো (Literature as lie) সমেত হাজির হন। ননসেন্স সাহিত্য হল এমন এক বস্তু যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যেখানে এই বিশুদ্ধ নির্মাণ-বাহির্ভূত সবকিছুই অপ্রাসঙ্গিক। সমাজ-ইতিহাস-দর্শন-রাজনীতি-মনস্তত্ত্ব কোনও কিছুর সাহায্যেই এই নির্মাণ-শিল্পকে ('literature as lie') বোঝা সম্ভব নয়। এ হল এক নিছক মজা ('non-sense is funny because it does not make sense'), এক ধরনের খেলা, বিশুদ্ধ পারফরমেন্স। এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে এ ধরনের লেখা যাবতীয় অভ্যস্ত অর্থের (meaning) বিনাশ, নাকি নতুন কোনও অর্থের বিন্যাস। সুতরাং এ ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্নকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ, রাজনীতি কোনও না কোনওভাবে ঢুকে পড়ছে। ম্যাংগানেল্লি সম্পর্কে লেসারল ঠিক এই জায়গাটাই ধরিয়ে দিয়েছেন— His (Manganelli's) fascination with non-sense acted as an antidote to the ideological tyranny of common sense'. ম্যাংগানেল্লি'র এই গোপন এজেন্ডা (যদি থেকে থাকে) বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র তার ননসেন্স ঘরানার কথা ধরা হয় তাহলে সুকুমার রায়কে তত্ত্বগতভাবে এই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যদিও তাঁর *আবোল-তাবোল* ও *হ-য-ব-র-ল* সম্পূর্ণভাবে (মেজাজ ও উপাদানগতভাবে) বাঙালি সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভূত।

যে দুই তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা বলা হল ত্রৈলোক্যনাথের গল্প উপন্যাসকে তার মধ্যবর্তী কোনও জায়গায় রেখে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ তাঁর আজগুবি সাহিত্যের যে 'ননসেন্স এফেক্ট' তাকে খুঁজতে হবে অর্থাধিক্য ('an

excess of meaning') ও অর্থাভাবের ('a lack of it') অন্তর্বর্তী কোনও পরিসরে। এই কারণে অর্থ ও অর্থহীনতার মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব এবং তদ্ভূত যে টেনশন তাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য। এটি কেন ঘটছে বা কীভাবে ঘটছে সেটি বুঝতে গেলে ফিরে যেতে হবে একেবারে শুরুতে—ত্রৈলোক্যনাথের আজগুবি সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে। যে 'অসম্ভব অদ্ভুত রস'-এর কথা রবীন্দ্রনাথ *কঙ্কাবতী* প্রসঙ্গে বলেছেন তা কিন্তু মোটেই ভাষাগত (linguistic non-sense/absurdity) নয়। তা ভীষণভাবে উপাদানগত। সাহিত্যের পরিভাষায় বললে তা একান্তভাবে মোটিফ-কেন্দ্রিক আর এই মোটিফের যথেচ্ছ ব্যবহারে ত্রৈলোক্যনাথ এমন এক দুনিয়া তৈরি করেছেন যেখানে এরকম বলা অসঙ্গত নয় যে, সাহিত্য হল এক বিশুদ্ধ নির্মাণ। তবে তার গল্পের মজা কিন্তু নিছক উপাদান থেকে উঠে আসেনি, কারণ এরকম উপাদান দিয়েই আমাদের লোককথা, রূপকথার শরীর গড়ে উঠেছে। আসল মজাটা হল ত্রৈলোক্যনাথ এদের যেভাবে পরিবেশন করেছেন, যে অদৃশ্য সম্পর্কের টানে এদের একটা পৃথক কমিউনিটির মর্যাদা দিয়েছেন, যে বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে টেনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। তা অসামান্য কথনদক্ষতার কারণেই পাঠকের মনোযোগ আখ্যানের গল্পকে ছাড়িয়ে ডিসকোর্সমুখী হয়ে ওঠে না। ত্রৈলোক্যনাথের এই বিশেষ ক্ষমতাকে প্রমথনাথ বিশী-ও স্বীকৃতি (বাঁ-হাতি?) না জানিয়ে পারেননি—'ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিম শক্তি বিদ্যমান। সে গল্প-ও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে' (*বাংলার লেখক*, প্রথম খণ্ড)। এই 'আষাঢ়ে গল্প'-র সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের যোগ নেই, যদিও কাব্যিক বিচারের (Poetic justice) দুর্বল উপস্থিতি কাহিনির পরিণতিতে টের পাওয়া যায়। কিন্তু কোনওভাবেই তা আখ্যানকে অযথা ভারাক্রান্ত, নীতিবাগীশ, 'উদ্দেশ্যমূলক'/'প্রচারমূলক' করে তোলে না। গল্প বলার গুণে তার সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে সেই জাতীয় নির্মাণ/'মিথ্যা' যেখানে অস্তিত্বের অন্যান্য দাবিগুলিকে পুরোদস্তুর অস্বীকার না করেও বিশুদ্ধ হাস্যরসের একটা সাময়িক মুক্তাঞ্চল তৈরি করা যায়।

দুই

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম উপন্যাস *কঙ্কাবতী* আঠারোশো বিরানব্বই সালে প্রকাশিত হয়। এর ঠিক বছর তিনেক আগে (১৮৮৯) ধারাবাহিকভাবে *ইন্ডিয়ান নেশন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ভ্রমণকাহিনি *এ ভিজিট টু ইউরোপ*। তাঁর গল্প-উপন্যাসের রসাস্বাদন নির্ভর করে পাঠক কতটা সফলভাবে তাঁর সাহিত্য তাঁর কর্মজীবন থেকে সরিয়ে দেখতে পেরেছেন তার ওপর। কিন্তু এই দেখতে পারা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন পাঠক/সমালোচক *এ ভিজিট টু ইউরোপ*-এর ত্রৈলোক্যনাথকে গুলিয়ে ফেলেন না *কঙ্কাবতী-ডমরুচরিত-লুল্লু*-র ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে। আসলে তাঁর ভ্রমণকাহিনি বোধহয় বাংলা ভাষায় প্রথম আন্তর্সাংস্কৃতিক পাঠ যার মধ্যস্থতায় ত্রৈলোক্যনাথ নির্মাণ করতে চেয়েছেন আধুনিক ভারত/ভারতীয়ত্বের ধারনা। তারই রাজনৈতিক/সাংস্কৃতিক প্রকল্প উপনিবেশের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে খুব ভালোভাবেই খাপ খেয়ে যায়। যেখানে প্রত্যাশিত থাকে সমাজ-ধর্ম-যুক্তি-বিজ্ঞান নিয়ে এক জমজমাট ডিসকোর্স। আর ঠিক এর পরেই যখন আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাসে ফিরে আসি তখন কোথাও একটা হোঁচট, কোথাও একটা ছেদ টের পাই। ত্রৈলোক্যনাথ-চর্চায় এই ছেদের বোধ এতটাই জবরদস্ত যে তাঁর সাহিত্য আলোচনায় বার বার ঘোষিত হয় তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, সংস্কারমুখী মানসিকতার কথা। এই একপেশে, একমাত্রিক ত্রৈলোক্যনাথের নির্মাণের পেছনে সক্রিয় ছিল উপনিবেশের বাঙালির যুক্তিবাদী সংস্কৃতি ও তার মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং উদ্বেগ (অথচ ভালো করে গল্প বলতে পারা ভীষণরকম যুক্তি নির্ভর অর্থনির্মাণের প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের চারপাশটাকে বোধগম্য করে তুলি আর একে অপরের সঙ্গে গড়ে তুলি আদান প্রদান। আখ্যানের এই ভূমিকা ['meaning-making' আর 'mode of communication'] কগনিটিভ ন্যারেটোলজি-র তৎপরতায় বিশেষভাবে আলোচিত)। এই কারণে তাঁর সমকালীন পাঠক/সমালোচক আটকে পড়েছিলেন তাঁর সাহিত্যের বহিরঙ্গে। খুব সহজেই অগ্রাহ্য করা গিয়েছিল তাঁর আখ্যানশিল্পকে, তাঁর গল্প বলার আদিম অকৃত্রিম ক্ষমতাকে। তবে, এপথেই

মিলতে পারে একাধিক ত্রৈলোক্যনাথের খোঁজ— 'ইউরোপ ভ্রমণ'-এর ত্রৈলোক্যনাথ আর *কঙ্কাবতী*-র ত্রৈলোক্যনাথ এবং তাদের মধ্যকার সংলাপ।

সাহিত্যগতভাবে *কঙ্কাবতী*-র জাত নির্ণয়ের কাজ হাতে নিয়ে শুরুতেই বলা যেতে পারে—এ হল ভাঙা রূপকথা (fractured fairy tales) সাম্প্রতিককালে এ জাতীয় একাধিক জনপ্রিয় টেক্সটের উল্লেখ করা যেতে পারে। জেরি পিঙ্কনে অ্যান্ডারসন-এর *দ্য আগলি ডাকলিং* ও *দ্য লিটল ম্যাচ গার্ল* অবলম্বনে দুটি ভাঙা রূপকথা (১৯৯৯) লিখেছেন। অ্যান্ডারসনের *দ্য এমপেরারস নিউ ক্লোথ্স* অবলম্বনে নাওমি লিউইস লিখেছেন এক অসাধারণ নাগরিক রূপকথা (আরবান ফেয়ারি টেল)। বিশেষ করে নারীবাদী সাহিত্য আন্দোলনে ভাঙা রূপকথার বিশেষ প্রচলন ও জনপ্রিয়তা লক্ষ করার মতো ভাঙা রূপকথা যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এটি স্পষ্ট যে ভেঙে ফেলার ব্যাপারটি নিছক ফর্মাল কালোয়াতি নয়, এর মূল লক্ষ্য হল—প্রচলিত রূপকথায় যে ক্ষমতার সমীকরণ থাকে তাকে ওলোট পালোট করে দেওয়া। এক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে পালটে দেওয়া হয় কাহিনিকে এবং তার সঙ্গে স্থান পেয়ে যায় নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্র। *কঙ্কাবতী*-র ক্ষেত্রে এ সব কিছুই ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু *কঙ্কাবতী* যে গল্পবীজ থেকে উদ্ভূত তা কিন্তু মোটেই 'লিটারেরি ফেয়ারি টেল' নয়, এ এক প্রাচীন লোককথা যা সংগৃহীত হয়েছে কোনও প্রাকলিপি (ওরাল) ঐতিহ্য থেকে।

রূপকথার উপাদান থাকলেও *কঙ্কাবতী* রূপকথা নয়। *কঙ্কাবতী* উপন্যাস। কিন্তু একটি রূপকথার আঁচড় থেকে ক্রমশ উপন্যাসের কলেবর ধারণ, এটি সম্ভব হয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের কথনগুণে। শুরুতে যা ছিল অজাচারের (incest) মোটিফ, অর্থাৎ কঙ্কাবতীর সঙ্গে তার ভাইয়ের বিয়ের সম্ভাবনা (প্রাচীন লোককথায় নিষিদ্ধ [taboo] মোটিফের ছড়াছড়ি যে কারণে মনোবিদদের কাছে তা রীতিমতো বিস্ফোরক), তাকে উপন্যাসে এক বৈধ সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। আখ্যানের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে বাস্তবধর্মী রীতিতে এই গল্পের কথনকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আখ্যানের এই অংশটি উনবিংশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এক বিশ্বস্ত দলিল যেখানে বেশ কিছু ছাঁচে ঢালা চরিত্র ও পরিস্থিতির সাক্ষাৎ মেলে যাদের উপস্থিতি উনবিংশ শতাব্দীর একাধিক ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনমূলক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—অসহায় বিবাহযোগ্য কন্যা, অর্থলোভী আত্মীয়স্বজন, কামাতুর কুলীন প্রৌঢ়, বিত্তবান যোগ্য যুবক। এই যে কালো-সাদা, ভালো-মন্দের স্পষ্ট বিভাজন এখানেই ঘটে যায় উপন্যাস আর রূপকথার অধিক্রমন।

সমস্যা দেখা দেয় যখন এই বাস্তবধর্মী উপন্যাস অঘোষিতভাবে রূপকথার পরিসরে ঢুকে পড়ে। আখ্যানের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে এই রূপকথার প্রাধান্য অথচ এর সূচনার প্রাক্কালে আখ্যানগতভাবে পাঠককে আগাম জানান দেওয়া হয় না যে সে অন্য এক আখ্যান পরিসরের দোরগোড়ায়। এখানে তার গোচরে আসে শুধু এইটুকু তথ্য— 'কঙ্কাবতী-র নৌকাখানি নদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।' তারপর ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে এক অসম্ভব, অদ্ভুত, বিচিত্র জগৎ যার বাসিন্দারা হল ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো-রাক্ষস-খোক্কস-পশু-পাখী-মশা-মাছি। কেবল কাহিনির শেষ পরিচ্ছদে পৌঁছোলে পাঠক টের পায় যে কথক আখ্যানের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে তার সঙ্গে মজা করে গেছে, তার বিশ্বাস করার ক্ষমতাকে টানাটানি করে অবশেষে নিজের যাদুদণ্ডটি সরিয়ে নিয়েছে। এই আজগুবি অংশটি কঙ্কাবতী-র স্বপ্নোদ্ভূত। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আখ্যানগতভাবে কাহিনির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত এই স্বপ্নের কতখানি কার্যকরী ভূমিকা, যেখানে মূল কাহিনির সঙ্গে এর যোগ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ, গল্পের যে বিন্দুতে স্বপ্নের সূচনা সেখানেই কিন্তু গল্প থেমে যায়। আর স্বপ্নের অবসানে গল্প আবার চলতে শুরু করে তার পরিণতির দিকে। তাহলে এই যে কাহিনির সময়কে (story time) স্তব্ধ রেখে আখ্যান-সময়কে (telling time) চালু রাখা গেল এবং তার ফলে এক বিকল্প পরিসর তৈরি হল, ন্যারেটিভ ডিসকোর্সে এই ঘটনাটা কি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ছিল? কাহিনিকে এই অন্তর্বর্তী সুবিশাল অংশটি কি কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না? এটি ঠিক যে কঙ্কাবতী-খেতুর প্রেমাখ্যান এই স্বপ্নের মধ্যস্থতায় এগিয়ে-ও যায় না, বিঘ্নিত-ও হয় না। কিন্তু বিষয়গতভাবে আখ্যানের এই দুই পরিসরে গল্পের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা উপেক্ষা করার মতো নয়। কঙ্কাবতী ও খেতুর যে সামাজিক প্রতিকূলতা তাকেই এক কাল্পনিক পরিসরে পরিবেশন

করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি, সমাজ, গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে যে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ডিসকোর্স, সেখানে তৈরি হয় এক 'ফ্যান্টাসটিক'-এর বোধ যা শুধুমাত্র মজা দেয় অস্বস্তি বা উদ্বেগ তৈরি করে না। এ হল এক নির্দিষ্ট সমাজ ও ইতিহাসনির্ভর পরিস্থিতিকে রূপকথার মোড়কে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা। যদিও রূপকথা এখানে যে সরল ফ্রেমওয়ার্ক জুগিয়েছে তার ফলে এক জটিল সময় তার বিশিষ্টতা হারিয়ে অবশেষে হয়ে যায় অপরিবর্তনীয় আর সর্বজনীন। রূপকথার এহেন সর্বজনীন পাঠ আখ্যানতত্ত্বের ফর্মালিস্ট বিশ্লেষণে পাওয়া সম্ভব। ভ্লাদিমির প্রপ তাঁর *মর্ফোলজি অফ দা ফোকটেল* (১৯২৮) গ্রন্থে গল্পের প্লটকে একত্রিশটি কার্যকরী এককে (functional units) ধরতে চেয়েছেন। *কঙ্কাবতী* উপন্যাসে বেশ কিছু প্রচলিত 'প্লট সিচুয়েশন'-এর উল্লেখ করা যায় যা এই ধরনের ন্যারেটিভের কাজ সম্পাদন করে। উদাহরণস্বরূপ—বিপন্ন যুবতী, বিপদসঙ্কুলপথে প্রেমিকের অন্বেষণ, আকৃতিগত ম্যাজিক্যাল রূপান্তর, মানবেতর প্রতিপক্ষের হাত থেকে গল্পের শেষে প্রেমিকার উদ্ধার গল্পের চরিত্রগুলিকেও ভাগ করে নেওয়া যায় প্রপ-নির্দেশিত ভূমিকায় ('roles')। যেমন নায়ক, ভিলেন, সহকারী চরিত্র, বৈমাত্রেয় মা (কঙ্কাবতীর ক্ষেত্রে তার বাবা) ইত্যাদি। এই সংস্থাপনী (structuring) উপাদানের হস্তক্ষেপে কঙ্কাবতীর গল্পও সাধারণভাবে বোধগম্য ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। তবে, *কঙ্কাবতী* পাঠের আসল মজা কিন্তু অন্যত্র—সেটা পাওয়া যায় উপন্যাস ও রূপকথার মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যে।

কোনও পাঠক যদি এই উপন্যাসে রূপকথার বাড়াবাড়ি নিয়ে মন্তব্য করে বসেন, তাহলে অবশ্যই তার একটি যৌক্তিকতা থাকে। রূপকথার এই আধিক্যকে এরকম একটা ব্যাখ্যার ওপর-ও দাঁড় করানো যায় যে ত্রৈলোক্যনাথ ভারতীয় যৌথ মানসে রূপকথার যে উপস্থিতি তারই স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর সঙ্গে তাঁর যুক্তিবাদী মানসিকতার কোনও বিরোধ নেই। কারণ, এ হল তাঁর ভারতীয় জনমানস সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ। বরঞ্চ, তাঁর গল্পের অতিযৌক্তিক বিন্যাস স্বপ্নক্রমের (dream sequence) যে আখ্যান তাকে একটি সরলরেখায় সম্মুখ গতিপথে সাজিয়ে নেয়, যেখানে কার্যকারণ সম্পর্কই মূল নিয়ামক। এর ফলে স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না তা হয়ে যায় ক্রমান্বয়ে ঘটমান ঘটনাশৃঙ্খলার ধারাবাহিক আখ্যান। এখানে উপাদান যাই হোক, তাকে যৌক্তিক শৃঙ্খলায় সংহত করাই আখ্যানের অন্যতম প্রধান কাজ। এই যে স্বপ্নকে একটি 'র‍্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স'-এ স্থান দিয়ে তার চরিত্রকে পালটে ফেলা এটিই বোধহয় *কঙ্কাবতী* উপন্যাসে ত্রৈলোক্যনাথের আখ্যান কৌশলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

তিন

কঙ্কাবতী উপন্যাসের একেবারে গোড়ায় লেখক এই গ্রন্থটির পেছনে যে প্ররোচনা ছিল সে সম্পর্কে পাঠককে জানিয়েছেন। তাঁর চেষ্টা ছিল এক 'প্রাচীন কথা'র সূত্র ধরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাহিনি নির্মাণ এবং সেই উদ্দেশ্যে গড়ে নেওয়া তাঁর উপন্যাসের 'ফ্যাবুলা' (ঘটনা-শৃঙ্খলা) ও তার ডিসকোর্স (যেভাবে ঘটনাগুলিকে সাজানো হয়)। লেখকের এই হস্তক্ষেপ (authorial intervention) যা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে উচ্চারিত ('যাহা সম্ভব, তাহা আমি বলিতেছি') তাই গল্পের শেষে ফিরে এসেছে। গল্পের পরিসমাপ্তি নিয়ে লেখকের মন্তব্য—'তাহার পর? বার বার 'তাহার পর তাহার পর' করিলে চলিবে না; দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল্য দেয় কে, তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।' স্পষ্টতঃই কথাগুলি পাঠককে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে। গল্পের পরিসমাপ্তি (closure) শুধুমাত্র আখ্যানগত কারণে নয়, গ্রন্থের আয়তন ও তার বিক্রয়যোগ্যতাকে মাথায় রেখে এই পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়েছে। কাহিনি-বহির্ভূত এই প্রসঙ্গ টেনে আনার ফলে কাহিনির যে কাল্পনিকতা (fictionality) ও সে সম্পর্কিত যে ভ্রম তৈরি করা গিয়েছিল তা কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ার সামিল। এখানে যা ঘটেছে তা কিন্তু নিছক আপতিক নয়, খুব নির্দিষ্টভাবে তা ঘটানো হয়েছে। সাহিত্য যে কল্পনা-বোধ-স্মৃতির মধ্যস্থতায় তৈরি বাস্তবতার এক বিকল্প বিন্যাস, বাস্তবতার নিছক অনুকৃতি নয় (যা সম্ভবও নয়), ত্রৈলোক্যনাথ পাঠককে বার বার এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেন।

কাহিনিভুবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভ্রম তৈরি করা আর প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাকে ভেঙে দেওয়া—এ ঘটনা ত্রৈলোক্যনাথের ছোটো-বড়ো সব গল্পেই লক্ষ্যণীয়। *লুল্লু*-র মতো জমজমাট মজাদার আজগুবি গল্পেও স্থান পায় ভ্রম-বিনাশী এ জাতীয় মন্তব্য যা গল্পের মূল উপাদান নিয়েও মজা করতে ছাড়ে না—'এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠল। বিজ্ঞান-বেত্তারা-বিশেষতঃ ভূততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা—এ বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প-স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে।' এখানে যে গল্প-বহির্ভূত আখ্যান পরিসর তৈরি করা হয়েছে তার ফলে গল্পজগতের ধারাবাহিকতা-ই যে শুধু ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, তার-ই সঙ্গে পরিবেশিত হচ্ছে ভয়-ভূত-অন্ধকারের যুক্তিবাদী (মজাদার) ব্যাখ্যা। এই আজগুবি গল্পের মধ্যেই কথকের ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত থাকছে এক যুক্তিবাদী আলোচনার আয়োজন যার সঙ্গে গল্পের মূল মেজাজের ভীষণরকম বনিবনা নজরে আসে। তাঁর গল্পের আজগুবি উপাদান যে ঐতিহাসিক কারণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে তা-ও কথক কল্পিত রোজার বয়ানে করেছেন—'এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলা এমনই ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।' এখানে ইংরেজ শাসনের ফলে দেশবাসীর যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় তার সঙ্গে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী সংস্কৃতির প্রভাবকে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলিয়ে দিয়ে এক ধরনের কমিক এফেক্ট তৈরি করা হয়েছে। এখানে 'হিষ্টিরিয়া' শব্দটি জ্ঞানরাজ্যে এক নতুন ক্ষমতা বিনাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে যেখানে বিজ্ঞান সমর্থিত নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্বের দাপটে দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে প্রান্তে চলে যাওয়া তার-ও একটা গল্প থেকে যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যপাঠের একটা জোরদার অভিজ্ঞতা হল—আমরা পাঠকেরা তাঁর গল্প শুধুমাত্র পড়ি না, আমরা তাঁর গল্প শুনি: এক্ষেত্রে একজন (ন্যারেটর) গল্প বলেন আর এক বা একাধিক শ্রোতার (narrattee) উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। *ডমরু-চরিত* গল্পে মূল কথক ডমরু একটির পর একটি গল্প তার শ্রোতাদের বলে চলে আর সেক্ষেত্রে শ্রোতারা (লম্বোদর, শঙ্কর ঘোষ, পুরোহিত) কেউ-ই নির্বাক-নীরব থাকে না। শ্রোতারা ক্রমাগত তাদের প্রতিক্রিয়া, মতামত জানিয়ে যায়। পুরো ঘটনাটিই ঘটে চলে দুর্গাপূজার পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ডমরুর নিজস্ব পূজা দালানে। এ রকম একটি পরিবেশ পাওয়া যাবে *নয়নচাঁদের ব্যবসা* গল্পে যেখানে নয়নচাঁদ হল প্রধান কথক আর তার সান্ধ্যকালীন আড্ডায় বাকি দুজন আড্ডাধারী হল লম্বোদর ও গগন। এ দুটি ক্ষেত্রেই গল্প বলার উপলক্ষ্য দেবী মাহাত্ম্য প্রচার—*ডমরু চরিত*-এ দেবী দুর্গা আর *নয়নচাঁদের ব্যবসা*-য় দেবী শীতলা। এভাবে স্থান-কাল-পাত্র'র বিশেষ উল্লেখের মধ্য দিয়ে গল্প শুরু হওয়ার ফলে পুরো ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক ধরনের 'ওরাল পারফরমেন্স' যেখানে কথক ও শ্রোতা উভয়েই কথন-প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশীদার হয়ে উঠছে। গল্প বলার এই যে বাচনিক ঐতিহ্য সেখানে আখ্যানের চরিত্র নির্ধারিত হয় এই অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে। এ ব্যাপারে শোনা যাক পল জুমথোর (ওরাল কালচার বিশেষজ্ঞ) কী বলছেন—'The bard and his audience interact to such an extent that both parties are full, active participants in the tale being told The listener contributes to the production of the work in performance. The listener is author, scarcely less than the performer is author.' গল্প-নির্মাণের এই যৌথ অভিজ্ঞতার ('empathetic', 'participators'—Walter Ong) জোরে তৈরি হয় এক ধরনের 'ওরাল কম্যুনিটি'। ত্রৈলোক্যনাথের সব গল্পেই এই কম্যুনিটির উপস্থিতি না থাকলেও গল্প যে কাউকে বলা হচ্ছে সে বোধটি কিন্তু অগ্রাহ্য করার মতন নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য অবশ্যই লিখিত সাহিত্য, কিন্তু তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে বাচনিকতার (orality) অজস্র চিহ্ন যারা চিহ্নিত হতে পারে 'রেসিডুয়াল অর‍্যালিটি' হিসেবে। এ রকম কিছু কথন-বৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্যে গভীর

ছাপ রেখে গেছে। *ডমরু-চরিত* এই বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। দেবী মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে ডমরুধরকে একাধিক আজগুবি উপাখ্যানের (episode) অবতারণা করতে হয় যাদের মধ্যে ডমরু চরিত্রের উপস্থিতি ব্যতিরেকে অন্য কোনওরকম যোগ চোখে পড়ে না। এই *ডমরু-চরিত*-এর প্রত্যেকটি উপাখ্যানই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আর এর যোগফলেই তৈরি হয়েছে এই গল্পের পরিপূর্ণ শরীর। এই বৈশিষ্ট্যকেই ওয়ালটার ওঙ বলেছেন 'additive rather than subordinative, aggregative rather than analytic' যা প্রাকলিপি আখ্যান ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, *ডমরু-চরিত*-এর কাহিনি একাধিক রৈখিক উপাখ্যানে বিভাজিত (episodic) এবং সেখানেও অর্থ ও বার্তা নির্মাণের যে প্রক্রিয়া তা প্রতিটি উপাখ্যানেই সক্রিয় ও সমভাবে বন্টিত। কাহিনির এই বিন্যাসের ('non linear, non-hierarchal') কারণ প্রাকলিপি সংস্কৃতির স্মৃতিনির্ভর তথ্যসঞ্চয় ও তার উদ্ধারের প্রক্রিয়া। কাহিনির এই যে বিন্যাস তা কিন্তু কাহিনির সময়কেও প্রভাবিত করে। এখানে আখ্যান-সময় একটি নির্দিষ্ট পরিসরে আটকে রাখা হয়েছে। যে সাতটি উপাখ্যান এখানে স্থান পেয়েছে তার প্রতিটি এভাবে শুরু হয়— 'ডমরু ধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে ডমরু ধর, তাঁহার পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন।' একই সন্ধ্যায় সাতটি উপাখ্যান উগরে দেওয়ার ফলে যা মনে হয় তা হল একই সঙ্গে বহুবিধ ঘটনা ঘটে চলেছে। সময়ের এই চরিত্রকে 'polychronic time' নাম দেওয়া হয়েছে যখন অনেক কিছু একই সময়ে ঘটতে থাকে, অর্থাৎ এ হল এমন এক সময় যেখানে ভবিষ্যৎ ও অতীত বলে কিছু থাকে না। থাকে শুধু বর্তমান।

সংকলিত বাকি তিনটি গল্পের (*বাঙ্গাল নিধিরাম, লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা*) কাহিনি সময় (story time) প্রচলিত অর্থেই সরলরৈখিক। এখানে কাহিনির কেন্দ্রে উপস্থিত থাকে যে চরিত্রটি তারই জীবনের গল্প একটি নির্দিষ্ট রেখায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। গল্পের এই কালিক বিস্তার যা তিনটি ধাপে বিন্যস্ত (আদি, মধ্য, অন্ত) কাহিনিকে এক সম্মুখ গতিতে বেগবান করে তোলে। এখানে আজগুবি ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার বাড়াবাড়ি অবশ্যই আছে, কিন্তু তাদের এমন এক শৃঙ্খলায় আনা হয়েছে যার মধ্যে কাজ করে কার্যকারণ সম্পর্কের অমোঘ নিয়ম। নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবন আর তাকে একটি সময়ের ক্রমিক বিন্যাসে ঢেলে সাজানো— এটি ই হল ত্রৈলোক্যনাথের কথনশিল্পের জাদুদণ্ড।

উপরোক্ত তিনটি গল্পেরই কথন সংঘটিত হয়েছে উত্তম পুরুষে। কথক এখানে গল্প-বহির্ভূত অনির্দিষ্ট এক উপস্থিতি (extra-diegetic), কিন্তু তার এক্তিয়ার সীমিত, অর্থাৎ সবজান্তা গোছের অন্যের ব্যাপারে নাক-গলানো টাইপ নয়। এর ফলে গল্পের চরিত্ররা তাদের নিজস্ব বয়ানে (অপরোক্ষ উক্তি) তাদের গল্প বলার সুযোগ পেয়ে যায়। এভাবেই সারা আখ্যান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সংলাপ, নিরন্তর চলতে থাকে বাক-বিনিময়, বাদ বিতণ্ডা, তর্ক বিতর্ক যার মধ্যস্থতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে কাহিনির সমগ্র আখ্যান পরিসরটি। এই মুখরিত পরিসরটি ক্রমশই এক 'interactive session'-এর চেহারা নিয়ে নেয়, আখ্যানতত্ত্বে সম্প্রতি যা এক নতুন জঁনরে অভিষিক্ত হয়েছে 'Spontaneous conversational story-telling.'

এ কথা ঠিক-ই যে আখ্যান শিল্প সময়/আইডিয়লজি/মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কোনও ফরমাল কালোয়াতি নয়। এ কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের কথনকাণ্ডটি কোনও নিউট্রাল জোনে সংঘটিত হয় না। সময়ের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে, গল্পের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে, গল্পের পরিণতিতে। তাঁর সময়ের যে পাঠক সমাজ তা মূলত সময়ের এই দৃষ্টিগ্রাহ্য চিহ্নগুলি সামনে রেখেই ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য বুঝতে চেয়েছে। এর ফলে তাঁর সাহিত্যের আখ্যানগত দিকটি গোচর হয়নি। অথচ, প্রতিটি আখ্যানের মধ্যেই বিধৃত থাকে তার নিজস্ব জ্ঞানতত্ত্ব, সময় ও তার আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতাকে এক যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামোর মধ্যে সাজিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। গল্প বলার ধরন ও তৎসংলগ্ন জ্ঞানতত্ত্বর আলোচনাকে বাদ দিয়ে সময়ের পরিপূর্ণ চাপকে বোঝা সম্ভব নয়। এই আলোচনায় তাই সামনে উঠে এসেছে ত্রৈলোক্যনাথের কথনশিল্প।

রণধীর লাহিড়ী

সূচি

বাঙ্গাল নিধিরাম

প্রথম অধ্যায় : পীড়িত পথিক

নিধিরাম দেবশর্মার বাটী পূর্বদেশ। নিধিরাম মহাকুলীন। কিন্তু বিবাহ করা তাঁহার ব্যবসায় নয়। একটির অধিক তিনি বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিয়া টাকা লন নাই। নিধিরামের পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ ভূমি-সম্পত্তি ছিল। সন্তান-সন্ততি হয় নাই। সেই ভূমি হইতেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কোনওরূপে দিনপাত হইত।

যখন নিধিরামের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর, তখন তাঁহার গৃহ শূন্য হইল। ব্রাহ্মণীর শোকে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন? সকলই ভগবানের ইচ্ছা, পুনরায় বিবাহ করিতে অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিল। নিধিরাম সে কথা শুনিলেন না। বাকি কয়টা দিন ভগবানের আরাধনা করিয়া কাটাইবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একবার তাঁহার গঙ্গাস্নান করিবার ইচ্ছা হইল। একাকী তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন, একাকী চণ্ডীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসা লইয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যায় গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইলেন। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া, মা'র বক্ষে প্রাণ সমর্পণ করিবার অভিলাষে আস্তে আস্তে বুকে হাঁটিয়া তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। বালুকাময় তটে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। বেলা দশটা বাজিল। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে জগৎ ক্রমে অগ্নিময় হইতে লাগিল। নিধিরামের প্রাণ তবুও বাহির হয় না। উঠিবার শক্তি নাই, নড়িবার শক্তি নাই। কণ্ঠাগত প্রাণ, কিন্তু সে সামান্য প্রাণটুকু শরীর হইতে বাহির হইতে চায় না। তাঁহার জ্ঞান ছিল। 'শীঘ্র লও মা! আর কেন মা?' ধীরে ধীরে মাকে ডাকিতে লাগিলেন।

দুই জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। নিধিরাম ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে বলিলেন:— 'মহাশয়! পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া যদি আমার মুখে একটু জল দেন, তাহা হইলে এই আসন্ন কালে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি।'

এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস?'

নিধিরাম বলিলেন,—'আমার নিবাস পূর্বদেশে।'

পুনরায় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'মহাশয়ের নাম?'

নিধিরাম উত্তর করিলেন,—'আমার নাম নিধিরাম দেবশর্মা। কিন্তু মহাশয়! আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি এক্ষণে পরিচয় দিতে পারি না। মুখে যদি একটু জল দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।'

পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার ব্যাতোন?'

নিধিরাম বলিলেন,—'আমি চাকরি করি না। আমার বেতন নাই। যান্‌, আপনারা বাড়ী যান্‌। আমার জলে কাজ নাই।'

ব্রাহ্মণ, আপনার সঙ্গী অপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—'চল, হে, এককড়ি! চল বাড়ী যাই, বেলা হইল, রৌদ্রে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।'

এককড়ি কোনও উত্তর না করিয়া গঙ্গার জলে নামিয়া, এক কোষা জল লইলেন। নিধিরামের নিকট আসিয়া তাঁহার হাত-মুখ ধোয়াইতে লাগিলেন।

এককড়ির সঙ্গী বলিলেন,—'ছি! এই বিদেশী ঘাটের মড়াকে ছুঁইয়া ফেলিলে? তোমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইবে। আমি বাটী চলিলাম।' এই বলিয়া এককড়ির সঙ্গী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এককড়ি নিধিরামকে উত্তমরূপে ধোয়াইয়া মুছাইয়া জলপান করাইলেন। তাহার পর নিধিরামের নাড়ী দেখিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—'মহাশয়! আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র কিঞ্চিৎ অবগত আছি। আপনার নাড়ী নাই সত্য; শরীর শীতল হইয়াছে সত্য। কিন্তু বোধ হয়, নাড়ী শীঘ্রই গছিবে, শরীর শীঘ্রই উষ্ণ হইবে। এ যাত্রা আপনি রক্ষা পাইবেন।'

নিধিরাম বলিলেন,—'রক্ষা পাইতে আমার কিছুমাত্র সাধ নাই। জীবনে আমার সুখ নাই। আজ মা'র তীরে দেহ ত্যাগ করিব, ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি আছে?'

বৃদ্ধ এককড়ি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুই-চারিজন প্রতিবাসীর সহায়তায়, নিধিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইলেন। যথাবিধি তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এককড়ির বাড়ীতে কেবল স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি শিশু-পুত্র। এককড়ি সদ্‌বংশ-জাত কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু দরিদ্র। কন্যার বিবাহ দিতে টাকা লাগে, সে জন্য আজ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে কন্যাটির বয়স ষোল বৎসর হইয়া পড়িল। তাঁহাদিগের ঘরে কন্যা বড় হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। তা বলিয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে এককড়ি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কুলমর্য্যাদায় আপনার সমান অনেকের নিকট গিয়া তিনি কত মিনতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই এত টাকা চাহিয়াছিলেন যে, এককড়ির ভিটা-মাটি বিক্রয় করিলেও সে টাকা হয় না। এককড়ির কন্যার নাম হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী পরমা সুন্দরী। কিন্তু কুলীনের ঘরে সৌন্দর্য্যের গৌরব নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বদরুদ্দিনের বেটা গবিরুদ্দিন

নিধিরামকে ঘরে আনিয়া এককড়ি সপরিবারে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, এককড়ি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তখন বুঝিলেন যে, নিধিরাম উচ্চশ্রেণীর স্বভাব কুলীন। এককড়ি মনে করিলেন,—'বিধাতা এইবার বুঝি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। এরূপ পাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলে, পিতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে।'

নিধিরাম ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। সুস্থ হইয়া তিনি এককড়ির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—'মহাশয়! যদিও এ প্রাণ আমার অতি তুচ্ছ পদার্থ, তথাপি আপনার দয়া-মায়া কখনও ভুলিতে পারিব না, আপনার ধার কখনও শুধিতে পারিব না। আমার এমন কিছু নাই, যাহা দিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।'

এককড়ি বলিলেন,—'প্রাণরক্ষা করি, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? সমুদয় ঈশ্বরের হাত। আপনার আয়ু ছিল, আপনি রক্ষা পাইলেন। আমি আপনার কিছুই করিতে পারি নাই! দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি কোথায় কি পাইব? তবে যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি ভিক্ষা আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি।'

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি মহাশয়? আজ্ঞা করুন। ক্ষমতা থাকিলে অবশ্য আপনার আজ্ঞা পালন করিব।'

এককড়ি বলিলেন,—'ক্ষমতা আপনার সম্পূর্ণ আছে। মনে করিলেই আপনি করিতে পারেন। সত্য করুন যে, আপনি করিবেন, তাহা হইলে বলি।'

নিধিরাম বলিলেন,—'ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।'

এককড়ি বলিলেন—'আমি কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ। টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারি নাই। আপনি মহাকুলীন, স্বমেল, স্বভাব। আপনাতে কন্যা অর্পণ করিলে আমার কুল রক্ষা হয়, পিতৃপুরুষদিগের মুখ উজ্জ্বল হয়। আপনি আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন, আপনার নিকট আমার এই ভিক্ষা।'

নিধিরাম স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হিরণ্ময়ীর রূপে-গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইযাছিল। তবে অধিক বয়স হইয়াছে। এ বয়সে একরূপ লাবণ্যময়ী বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া হিরণ্ময়ীর চিন্তা মন হইতে দূর করিতে সর্বদাই তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্যই পীড়া হইতে উঠিয়া, সম্পূর্ণভাবে পূর্বরূপ বল পাইতে না পাইতে, এ স্থান হইতে পলাইতেছিলেন। সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্যটন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্মকর্মে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন, এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়! আমার বয়স হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবার সময় নাই। বিশেষতঃ কন্যা হিরণ্ময়ী পরম রূপবতী, কিছুতেই আমি তাহার উপযুক্ত নই। আর সংসার করিব না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব এ অনুরোধটি আমাকে করিবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন।'

এককড়ি বলিলেন,—'আপনি এইমাত্র সত্য করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যা দায় হইতে উদ্ধার না করিলে আপনি সত্যে পতিত হইবেন। আপনার বিবাহ করিবার বয়স যায় নাই। আপনার মত পাত্র পাইলে হিরণ্ময়ীকে ভাগ্যবতী বলিয়া জানিব। সত্যভ্রষ্ট হইবেন না।'

নিধিরাম বলিলেন,—'আপনি আমাকে ঘোর বিপদে ফেলিলেন। হিরণ্ময়ী রূপবতী, আমি কিছুতেই তাহার উপযুক্ত পতি নই। আমাকে ক্ষমা করুন।'

এককড়ি বলিলেন,—'আপনার আর বিপদ কি? বিপদ আমার। কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আজ কয় বৎসর আমি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি। কিন্তু আমার টাকা নাই। বিনা টাকায় কেহ বিবাহ করিবেন না। সম্প্রতি আমি জয়দেবপুরে গিয়াছিলাম। সেখানকার জমিদার আমাদের ঘর। তিনি এই গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র নবীন যেমন কুলে-শীলে, সেইরূপ রূপে-গুণে সুপাত্র। সে মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। গৃহিণীর বড় সাধ হইল যে, তাহাকে জামাতা করেন। আমি তাহার পিতার নিকট গিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া কত কাঁদিলাম। তিনি তিন হাজার টাকা চাহিলেন। তিন হাজার টাকা কোনও পুরুষে কখনও চক্ষে দেখি নাই। যেমন উচ্চ আশা করিয়াছিলাম, সেইরূপ ফল পাইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।'

এককড়ি পুনরায় বলিলেন,—"তাহার পর আবার বিপদের উপর বিপদ। এই গ্রামে বদরুদ্দিন সেখ বলিয়া একজন ডাক্তার আছেন। এখন আর তিনি বদরুদ্দিন নাই। চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে জমিদারী কিনিলেন, এই স্থানে ইমারত বাড়ী করিলেন, ও টাকার মহাজনী করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক টাকার মানুষ। যখন তাঁহার অনেক টাকা হইল, তখন তিনি 'বদরুদ্দিন সেখ' নাম ছাড়িয়া 'বৈদ্যনাথ সেন' নাম লইলেন। টাকা হইলে কি না হয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পর একগাছা সূতা তিনি পরিলেন। প্রথম প্রথম সূতাগাছটি কোমরে রাখিতেন, নাভির উপরে তুলিতেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে সূতাগাছটি কাঁধের উপর তুলিলেন। তখন সেটি যজ্ঞোপবীত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তিনি 'সেন' ছাড়িয়া 'শর্মা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। আজকাল তিনি 'দেবশর্মা' হইয়াছেন। এখন তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ দেবশর্মা। তাঁহার পুত্র গবিরুদ্দিন এখন গোবিন্দচন্দ্র দেবশর্মা হইয়াছেন। সমাজে বেশ চলিয়া গিয়াছেন। কোনও উৎপাত নাই। গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জমা হইয়াছিলেন। এক এক ঘড়া আর দশ দশ টাকা হইতে এক শত টাকা নগদ দিয়া পণ্ডিতসমাজকে বিদায় করিয়াছিলেন। চারিদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের সম্প্রতি গৃহ শূন্য হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর রূপের কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবেন এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। হিরণ্ময়ীর সহিত বিবাহ না দিলে তিনি আত্মহত্যা হইয়া মরিবেন, বাপ-মার নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ৫০০ টাকা ধারি। তিনি আমার নামে ডিক্রি করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকাইয়া প্রথম নানা প্রলোভন দেখাইলেন। অনেক টাকা দিবেন, অনেক গহনা দিবেন, কত কি বলিলেন। আমি যখন তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম না, তখন নানারূপ ভয় দেখাইলেন। আমাকে জেলে দিবেন, বৃদ্ধ বয়সে কয়েদখানায় পাঠাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আজ যেন তিনি বৈদ্যনাথ দেবশর্মা হইয়াছেন, কিন্তু আমি ত জানি তিনি কে? না হিন্দু না মুসলমান, না ব্রাহ্মণ না কায়স্থ। প্রাণ থাকিতে তাঁহার

ঘরে আমি কি করিয়া কন্যা দিই? এখন বুঝিয়া দেখুন, আমি কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি। আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই হয়।"

ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনিয়া নিধিরাম অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া অবশেষে বলিলেন;—'আচ্ছা মহাশয়! কা'ল আপনাকে আমি এ কথার উত্তর দিব।'

তৃতীয় অধ্যায় : এ কালের মেয়ে

এককড়ি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। মেটে বাড়ী। অন্দরমহল সদর-বাড়ী সব এক। এককড়ির পরিবারবর্গ সকলেই নিধিরামের পীড়িতাবস্থায় সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। সেই দিন একটু অবসর পাইয়া নিধিরাম হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী! তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। তুমি এক্ষণে বালিকা নও। আমি যাহা বলি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার বয়স হইয়াছে। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না। বৃদ্ধ স্বামী হইয়াছে বলিয়া চিরকাল তুমি দুঃখ করিবে। আমার সেই বড় ভয় হইতেছে। কি করি বল দেখি?'

হিরণ্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, চুপ করিয়া রহিলেন, একটিও কথা কহিলেন না।

নিধিরাম পুনরায় বলিলেন,—'কি করি বল না? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। তুমি কিছু না বলিলে কা'ল আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।'

হিরণ্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'কাঁদিও না, কান্না কিসের? বৃদ্ধ স্বামী হইবে বলিয়া কাঁদিতেছ? তা, তোমার বাপকে বুঝাইয়া বলিব। আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার কথা আর তিনি উত্থাপন করিবেন না।'

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আপনি বৃদ্ধ বলিয়া আমি কাঁদি নাই, আপনি চলিয়া যাইবেন, তাই কাঁদিতেছি। আপনি তো বৃদ্ধ নন, 'বৃদ্ধ, বৃদ্ধ' কেন বলিতেছেন?"

নিধিরাম বলিলেন,—'তবে আমাকে বিবাহ করিতে তোমার অমত নাই? তুমি সুখী হইবে? তুমি আমাকে ভক্তি করিবে? তুমি আমাকে ভালবাসিবে?'

হিরণ্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—'নিশ্চয়।'

নিধিরাম বলিলেন,—'সত্য?'

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—'সত্য।'

নিধিরাম বলিলেন,—'ঠিক?'

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—'ঠিক।'

নিধিরাম বলিলেন,—'দেখ, দুই দিন পরে আমার চুল পাকিয়া যাইবে, দাঁত পড়িয়া যাইবে, আমি কদাকার বৃদ্ধ হইয়া যাইব। তখন তো তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না? তখনও তো ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে?'

হিরণ্ময়ী বলিলেন—'নিশ্চয়। আপনি বৃদ্ধ হইবেন, আর আমি কি চিরকাল এইরূপই থাকিব?'

নিধিরাম বলিলেন,— 'দেখ হিরণ্ময়ী! তোমাকে দেখিয়াই আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছিলাম। এরূপ বয়সে তোমার মত সুরূপা বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া আমি এ স্থান হইতে এত সত্বর প্রস্থান করিতেছিলাম। তোমাকে বড় ভালবাসি। এ বয়সে আমাদের মনে যে কোনও ভাব অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। কিন্তু তোমাদের চিত্ত এখন অন্যরূপ। তোমাদের চিত্ত এখন চঞ্চল। আজ তোমাদের মন একরূপ, কা'ল অন্যরূপ। আমার সেই বড় ভয়।'

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—'দেখুন মহাশয়! আমি এক্ষণে আর বালিকা নাই। সকল কথা আমি বুঝিতে পারি। মনে মনে আপনাকে পতি বলিয়া বরিয়াছি। আপনি আমাকে বিবাহ করেন, সে নিমিত্ত দেবতাদিগকে কত ডাকিয়াছি। চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার পতি। চিরকাল আপনার দাসী হইয়া থাকিব। আমি কুলটা নই

যে, দুই দিন পরে আমার মনের পরিবর্তন হইবে। বৃদ্ধ হউন, আতুর হউন, যাহা হউন, দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনার পদে এখন যেরূপ আমার মতি রহিয়াছে, চিরকাল সেইরূপই থাকিবে।'

এই বলিয়া হিরণ্ময়ী সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। নিধিরাম সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে করিলেন,—'ভাল গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম! খুব ফাঁদে পড়িলাম! এ বয়সে আবার এরূপ মন কেন? হিরণ্ময়ীতে প্রাণ আমার একবারে জড়িত হইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ী বিনা জীবন বৃথা। পুস্তকে যে ভালবাসার কথা বলে, তাই এই। ভালবাসার কথা শুনিলে পূর্বে হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, মনে করিতাম, সে আবার কি? বুড়ো বয়সে আচ্ছা আমাকে ধেড়ে রোগে ধরিল!'

নিধিরামের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ স্থির হইল। পাড়া-প্রতিবাসী সকলে জানিল। বদরুদ্দিন সেখ অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মাও এ কথা শুনিলেন। চুপি চুপি তিনি ডিক্রিখানি জারি করিলেন। এককড়ির নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিলেন। বিবাহের একদিন থাকিতে তাঁহাকে ধরাইয়া রামনগরের জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

এককড়ির ঘরে কান্নাকাটি পড়িল। হিরণ্ময়ী ও তাঁহার মাতা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'বৃদ্ধ বয়সে জেলখানায় গিয়া বাবা আর বাঁচিবেন না,' এই কথা বলিয়া হিরণ্ময়ী ঘোরতর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী! কাঁদিও না। আমি দেশে যাই। সেখানে আমার যাহা কিছু ভূমিসম্পত্তি আছে, তাহা বেচিলে পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে আমি উদ্ধার করিব।'

এইরূপ অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রবোধ দিয়া, নিধিরাম বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম রামনগর যাইয়া জেলখানায় এককড়ির যাহাতে কোনও ক্লেশ না হয়, এইরূপ উপায় করিয়া আপনার দেশাভিমুখে চলিলেন। দেশে উপস্থিত হইয়া আপনার সমুদয় ভূমি-সম্পত্তি ৭০০ টাকায় বিক্রয় করিলেন। ৬০০ টাকার নোট একটি টিনের চোঙ্গের ভিতর রাখিয়া ও এক শত টাকা নগদ গেঁজেতে করিয়া আপনার কোমরে বাঁধিলেন। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় : তুমুল ঝড়

নিধিরাম নৌকা করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একদিন অতিশয় দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন পূর্ব-বাতাস চলিতে লাগিল, টিপটিপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, নদীতে ঘোরতর তরঙ্গ উঠিল। অতি ক্লেশে মাঝিরা নৌকা চালাইতে লাগিল। ঝড় ও তুফান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মাঝিরা এক স্থানে নৌকা লাগাইল। সে স্থানে তিনখানি বড় নৌকা বাঁধা ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল, বায়ু ও ঢেউ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একখানি চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরাম নৌকার ভিতর শুইয়া হিরণ্ময়ীর রূপ মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারেন না। হঠাৎ তিনি জাগরিত হইলেন। জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ঝড় ও তরঙ্গের শব্দে কানে তালা লাগে। ছইয়ের ভিতর হইতে যেই একটু মুখ বাহির করিয়াছেন, আর জলে ঝাপটা তাঁহার মুখে লাগিল। বারিকণাগুলি যেন সূচের মত তাঁহার মুখে বিঁধিয়া যাইল। মাঝিরা বলিল, 'মহাশয়! এরূপ ঝড় তুফান তো কখনও দেখি নাই। বাতাস এখন উত্তরে হইয়াছে, আমরা নদীর উত্তর ধারে রহিয়াছি। নৌকা রাখা ভার হইয়াছে।'

নিধিরাম একবার ভাবিলেন,—'নৌকা হইতে উঠিয়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় লই।' কিন্তু দিনের বেলা তিনি দেখিয়াছিলেন যে, নদীর উপরেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ, তাহার পর গ্রাম; সে অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড়ে, সে জলের ঝাপটে, এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া গ্রামে যায় কার সাধ্য? তাই তিনি নৌকাতেই বসিয়া রহিলেন। ঝড়ের বেগে পট্‌পট্ করিয়া নৌকার কাছি ছিঁড়িতে লাগিল, লগি উঠিয়া পড়িতে লাগিল। সকলের ভয় হইল, কাছি ছিঁড়িয়া নৌকা পাছে নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। যতবার কাছি ছিঁড়িয়া যায়, মাঝিরা ততবার কাছি বাঁধিয়া দেয়, যতবার লগি উঠিয়া পড়ে, মাঝিরা ততবার পুনরায় পুঁতিয়া দেয়। নিধিরামও মাঝিদিগের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। বড় নৌকাগুলির

কাছি ছিঁড়িয়া একে একে নদীমধ্যে চলিয়া গেল। অন্ধকারে ভালরূপ কিছু দেখিবার যো ছিল না। ঝড়ের শব্দের মাঝখানে একটু মনুষ্য-কোলাহলশব্দ পান, চাহিয়া দেখেন যে, নক্ষত্রবেগে বড় নৌকার আলোটি মাঝখানে দিকে যাইতেছে ; মুহূর্তমধ্যে নৌকার লণ্ঠনের আলোটি নিবিয়া যায়। মাঝিরা বলে,—'মহাশয়, ঐ একখানি নৌকা ডুবিয়া গেল।' এইরূপে একে একে দুইখানি বড় নৌকা নদীর মাঝখানে গিয়া ডুবিয়া গেল। কেবল একখানি বড় নৌকা রহিল। নদীর উচ্চ পাড়ের নীচে নিধিরামের নৌকা ছিল। তাঁহার নৌকাখানি ছোট, সে জন্য ঝড়ের প্রবল বেগ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নৌকায় লাগিতেছিল না। তাঁহার নৌকাখানি হয় তো বাঁচিয়া যাইবে, নিধিরামের এই একটু ভরসা ছিল।

কিন্তু সে ভরসা মিথ্যা হইল। অবশিষ্ট বড় নৌকাখানি কাছি ছিঁড়িয়া, তাঁহার নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার নৌকার হালটি উচ্চ ভাবে ছিল। বড় নৌকার লোকেরা সেই হালটি ধরিয়া ফেলিল। নিধিরামের নৌকার সমস্ত কাছিগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া গেল। দুইখানি নৌকাই তীরের মত নদীর মাঝখানে দৌড়িল। অল্পক্ষণ মধ্যেই দুইখানি নৌকা ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বড় নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। নিধিরামের নৌকাখানিও জলমগ্ন হইল। নিধিরাম নদীর মাঝখানে ভাসিতে লাগিলেন। সাঁতার তিনি উত্তম জানিতেন। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ ঢেউ, ঘোর অন্ধকার, দিকের ঠিক নাই। কাহার সাধ্য সাঁতার দেয়, আর সাঁতার দিয়াই বা কোন্ দিকে যাইবেন? অল্প অল্প হাত-পা নাড়িয়া তিনি কেবল ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাসিয়া থাকাও দুঃসাধ্য কথা। পর্বতসদৃশ তরঙ্গরাশি তৃণবৎ তাঁহাকে তুলিতে ফেলিতে লাগিল। ঢেউয়ের আঘাতে তাঁহার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। একবার তরঙ্গের শিখরদেশে উঠিয়া যখন তিনি পুনরায় নামিতে থাকেন, সেই সময়ে ঢেউয়ের মাথাটি ভাঙ্গিয়া যায় ও জলের ঝাপ্টা তাঁহার নাকে-মুখে প্রবেশ করিয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ক্রমে তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া নিধিরাম ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। 'হা, হিরণ্ময়ী! তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, তোমার সে মধুমাখা মুখখানি আর দেখিতে পাইলাম না। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তুমি আমার হিরণ্ময়ীকে সুখী করিও।' আসন্নকালে নিধিরাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হাত-পা আর নাড়িতে না পারিয়া নিধিরাম জলে ডুবিলেন। প্রাণের মায়া সহসা কেহ ছাড়িতে পারে না। জলে ডুবিয়াই পুনরায় একটু হাত-পা নাড়িতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে আর একবার উপরে ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু আর বল নাই, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘোর কাল-নিদ্রা তাঁহাকে ক্রমে ঘিরিতেছে। পুনরায় ডুবিলেন। ডুবিতে না ডুবিতে তাঁহার পায়ে কি ঠেকিল। অমনি তাঁহার একটু চমক হইল। পায়ে যে দ্রব্য ঠেকিল, তাহা তিনি ধরিলেন, একটু বল প্রকাশ করিয়া পুনরায় উপরে ভাসিয়া উঠিলেন। মনকে প্রবোধ দিয়া নিদ্রাবেশ দূর করিলেন। পুনরায় তাঁহার চেতনা হইল। জীবনের আশা হইল, তাহাতে শরীরে কিঞ্চিৎ শক্তিরও সঞ্চার হইল। দেখিলেন যে, একগাছি কাছি তাঁহার পায়ে ঠেকিয়াছিল। টানিয়া দেখিলেন যে, সেই কাছি অতি দূরে কিছুতে বাঁধা আছে। নিধিরাম ভাবিলেন, কাছির অপর দিক্ হয় জলমগ্ন নৌকায় বাঁধা আছে, না হয় নদীর কিনারায় খোঁটায় বাঁধা আছে। বায়ুর প্রবলবেগে কাছি ডুবিয়া যায় নাই, সরলভাবে ভাসিতেছিল। তিনি সেই কাছিটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্বতাকার তরঙ্গের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নহে। যাহা হউক, অতি কষ্টে কিছু দূর গিয়া তিনি মাটী পাইলেন। ক্রমে এক কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল। ক্রমে কিনারায় গিয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে কাছিগাছটি একটি খোঁটায় বাঁধা আছে। শরীর একবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই খোঁটাটি ঠেশ দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। উপর হইতে চারিদিকে পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নিধিরাম ভাবিলেন,— এত কষ্টে যদি প্রাণ রক্ষা হইল, শেষে কি আবার মাটী-চাপা পড়িয়া মরিব না কি!

নিধিরাম দাঁড়াইলেন। অনেক পরিশ্রম করিয়া পাড়ের উপর গিয়া উঠিলেন। পাড়ের উপর দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার! কোন্ দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। মনে করিলেন যে, 'যদি একটি গাছ পাই তো ধরিয়া বসিয়া থাকি; তাহার পর সকাল হইলে গ্রাম অনুসন্ধান করিব।' একবার একটি গাছ পাইলেন, কিন্তু সেটি চারা বাবলা গাছ। আগ্রহের সহিত ধরিতে গিয়া,

তাঁহার সমস্ত হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বাতাসে পুনরায় তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একবার তাঁহাকে পাড় হইতে নদীর ভিতর ফেলিয়া দিল। অতি কষ্টে পুনরায় তিনি উপরে উঠিলেন। পুনরায় বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, পাছে পুনরায় নদীর ভিতর ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি বুকে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিবার মানসে যেই অগ্রসর হইয়াছেন, আর অমনি ফোঁস করিয়া একটি শব্দ হইল। নিধিরাম ভাবিলেন,—'মন্দ কথা নয়! সর্পাঘাতটিই বা বাকি থাকে কেন?' অপর দিকে গিয়া একটি গাছ পাইলেন। গাছটি ধরিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—''চারিদিক্ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই স্থানটি উচ্চ। এখানে অনেক সাপ আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকিবে। মাটীতে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল নয়। গাছের উপর বসিয়া থাকি। আস্তে আস্তে গাছে উঠিয়া একটি খুব বড় ডালের উপর বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝড় থামিল, বৃষ্টি থামিল, দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল, অন্ধকারের ঘোর নিবিড়তা অনেকটা ঘুচিল। কিন্তু এখনও আর কত রাত্রি আছে, নিধিরাম তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় তিনি গাছের উপর বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় : ঐ গাছে

সন্ধ্যার সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই স্থানে মড়া পোড়াইতে আসিয়াছিলেন। সে দিনকার ঘোর দুর্যোগে তাঁহাদিগের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। কাঠ, পাতা সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা চিতা সাজাইলেন। মড়াটি চিতার উপরে রাখিলেন, কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরাইতে পারিলেন না। সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কর্তা ব্যক্তি ছিলেন—উদ্ধব দাদা। মড়াটি না পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত উদ্ধব দাদা প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আর সকলে সে কথায় সম্মত হইলেন না। অবশেষে উদ্ধব দাদা বলিলেন,—'তা যদি না করিবে, তবে চল, এই গ্রাম হইতে শুষ্ক কাঠ, পাতা ও পাঁকাটি লইয়া আসি। আর অমনি একটু মদ খাইয়া আসি। বৃষ্টিতে ঠিক যেন ভিজা বিড়াল হইয়া গিয়াছি। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কন্ কন্ করিতেছে।' মদের নাম শুনিয়া সকলে একবাক্য হইয়া সম্মত হইলেন। মড়াটি চিতার উপর পড়িয়া রহিল, কাছে কেহ রহিল না। এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া সকলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুঁড়ির দোকানে বসিয়া মনের সুখে মদ খাইতে লাগিলেন। তাহার পর ক্রমে সেই তুমুল ঝড় উঠিল। তখন আর ঘরের বাহিরে যায় কার সাধ্য! সুতরাং সকলকে বসিয়া বসিয়া একটু ভাল করিয়া মদ খাইতে হইল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঝড় থামিল। তখন লোকের গোয়াল হইতে পাঁকাটি ও পাতা চুরি করিয়া উদ্ধব দাদার দল পুনরায় শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় টলিতে টলিতে কেহ গান করিতে লাগিলেন, কেহ বাজে বকিতে লাগিলেন। বক্তা সকলেই, শ্রোতা কেহই নয়।

এক জন বলিলেন,—'উদ্ধব দাদার মদটুকু খাওয়া আছে, আবার টিকিটিও রাখা আছে।'

উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,''ওহে, তোমাদের টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না। বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরাণীর ঘরে থাকি, দেখা সাক্ষাৎ কাওরাণীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি : বলি, 'এই দেখ, বাবা, টিকি আছে।' অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কবার যো থাকে না।''

আর একজন বলিলেন,—'কেন? ফোঁটা কাটিলেই তো হয়? রামেশ্বর খুড়োর মত ফোঁটা দেখালেই তো চলে?'

উদ্ধব দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রামেশ্বর খুড়ো কি করিয়াছিলেন?'

লোকটি বলিল,—'রামেশ্বর খুড়োর নাতনীর বিবাহের কথা হইতেছিল। পাত্রপক্ষীয় লোকেরা কন্যা দেখিতে আসিবেন।' রামেশ্বর খুড়োর ছেলে কিনু বলিল,—'বাবা! আজ আর মদ খাইও না। বাড়ীতে আজ দুই জন ভদ্রলোক আসিবে, একটা দিন নাই খাইলে?'

রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'রাম রাম! আজ কি মদ খাইতে পারি? যাই, সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি। তুমি জলখাবার আর রান্নাবান্নার যোগাড় করিয়া দাও।' এই বলিয়া রামেশ্বর খুড়ো স্নান করিতে গেলেন। স্নান-টান কিছুই নয়, আস্তে আস্তে গিয়া শুঁড়ির বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন।

এদিকে নাতিনীকে দেখিতে ঘরে সেই ভদ্রলোকেরা আসিয়াছেন। 'কর্ত্তা কোথায় কর্ত্তা কোথায়'? বলিয়া কিনুকে তাঁহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'স্নান করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন' এইরূপ বলিয়া কিনু তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই প্রহর হইয়া গেল, রান্না প্রস্তুত, তবুও কর্ত্তার দেখা নাই। যা হইয়াছে, কিনু তাহা বুঝিলেন। বাড়ী আসিয়া পাছে ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে ঢলাঢলি করেন, সে জন্য পিতাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত কিনু শুঁড়ির বাড়ীর দিকে চলিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। বগলে এক বোতল মদ লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন। কিনু বলিলেন,—'বাবা! তোমার কি মান-অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনও পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে?' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'কেন বাবা! হইয়াছে কি? এত রাগ কেন?' কিনু উত্তর করিলেন,—'হইয়াছে কি? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'বগলে এ কি! বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না।' রামেশ্বর খুড়ো শুঁড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটি ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটি দেখাইলেন। টিকি না রাখিয়া ফোঁটা কাটিলেও চলে, না চলে এমন নয়।

আর এক জন বলিলেন,—'মড়াটা আশটা যারা পোড়ায়, টিকি রাখা তাদের পক্ষে ভাল নয়। একবার একটা মড়া দানো পাইয়া এক জনের টিকি ধরিয়াছিল। আর একটু হইলেই তাহার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া দিত। ভাগ্যে তাহার কোমরে একখানি কাস্তে ছিল, চট করিয়া সে কাস্তেখানি বাহির করিয়া টিকিটি কাটিয়া ফেলিল, তাই তাহার প্রাণ বাঁচিল।'

আর এক জন বলিলেন,—'ভাই! আমাদের মড়া যদি দানো পাইয়া থাকে? যদি গিয়া দেখি, চুলির উপর মন্দারাম গট্ হইয়া বসিয়া আছেন? তাহা হইলে কি হইবে?'

সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। তাই তো! বড় ভয়ের কথা বটে!

মড়াটি দানো পাইয়া থাকুক আর নাই থাকুক, কিন্তু চিতার উপর নাই। বোধ হয় শৃগালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, উদ্ধব দাদা প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন যে, চিতাটি খালি পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে তাঁহারা মড়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিকটে একটি ঝোপ দেখিতে পাইয়া, এক জন সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গাছপানে চাহিয়াই তিনি 'আঁ আঁ' করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া ধড়াশ করিয়া পড়িলেন। 'কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?' বলিয়া আর সকলে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিলেন। পড়িয়া পড়িয়া সে লোকটি 'গোঁ গোঁ' করিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাঁহাকে চেতন করিলে, তিনি বলিলেন,—'ঐ গাছে!' সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গাছে কি? গাছে কি দেখিয়াছ?' কিন্তু সে লোকটি আর কিছুই বলিতে পারেন না। 'ঐ গাছে!' এই কথা বলিযাই পুনরায় গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। তখন সকলে উদ্ধব দাদাকে বলিলেন,—'উদ্ধব দাদা! তুমি গিয়া দেখিয়া এস, গাছে কি আছে।' উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,—'তোমরা যাও না কেন? মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি, তা বলিয়া নিজের কাঁচা মাথাটি বাড়াইয়া দিতে পারি না।' এ বলে তুমি যাও; ও বলে তুমি যাও; কিন্তু যাইতে কাহারও সাহস হয় না। অবশেষে সকলে একসঙ্গে গাছের নিকট যাইলেন। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি সকলে জানিতে পারিলেন যে, গাছের ডালে একটি মানুষের মত কি বসিয়া রহিয়াছে। সকলে নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহাদের মড়াটি দানো পাইয়া গাছে বসিয়া আছে। গাছ হইতে লাফ দিয়া এখনও খাইতে কি ঘাড় ভাঙ্গিতে আসিল না, সে জন্য সকলের মনে অনেকটা সাহস হইল। দানো পাইলে যেরূপ প্রতিকার করিতে হয়, তখন সকলে সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দা, কোদাল, কুঠারি, যাহার হাতে যা ছিল, সেই সকল ছুড়িয়া মারিতে লাগিলেন। গাছে নিধিরাম বসিয়া ছিলেন। গাছে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা তিনি কতক কতক শুনিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়গণ! আমাকে মারিবেন না। আমি আপনাদের মড়া নই। আমি পথিক ব্রাহ্মণ, আজ রাত্রির ঝড়ে আমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে আমার প্রাণ বাঁচিয়াছে। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় আমি এই গাছে বসিয়া আছি।'

সকলে বলিলেন,—'আমাদের মড়া নয়, তবে শালা তুই কাদের মড়া? দানো পাইয়া মনের সুখে গাছে বসিয়া

আছেন, আবার বলেন কি না.—'আমি তোমাদের মড়া নই, আমি পথিক ব্রাহ্মণ!' নামিয়া আয় শালা, শীঘ্র নামিয়া আয়!'

নিধিরাম আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। যদিও অন্ধকার, তথাপি উদ্ধব দাদা প্রভৃতি সকলে দেখিলেন যে, লোকটি প্রকৃতই তাঁহাদের মড়া নয়। সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে বোতল আনিয়াছিলেন, সকলে তাহা হইতে এক আধ ঢোক মদ খাইলেন। পুনরায় মদ খাইয়া বুদ্ধি যখন উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিল, তখন উদ্ধব দাদা বলিলেন,—'তা তুমি আমাদের মড়া হও আর নাই হও, তোমাকে আমরা পোড়াইতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, আমাদেব নিজের মড়া কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই!'

নিধিরাম বলিলেন,—'সে কি মহাশয়! আমি জীয়ন্ত মানুষ, আমাকে পোড়াইবার কথা কি বলেন! তামাসা করিতেছেন বুঝি?'

উদ্ধব দাদা উত্তর করিলেন,—'তুমি আমার শালা সম্বন্ধীয় কিছুই নও, যে তোমার সহিত তামাসা করিব! আমরা মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি। শুধু হাতে কি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই? তুমিই বুঝিয়া দেখ, সেটা কি ভাল কাজ হয়? অবুঝের মত কথা বলিও না। চল, ভাল-মানুষের মত পুড়িবে চল। গণ্ডগোল করিও না। চল, যাদু, পুড়িবে চল।'

নিধিরাম প্রথমে তামাসা মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে বুঝিলেন যে, মাতালেরা সত্যসত্যই তাঁহাকে পোড়াইবে। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাতালেরা বলপূর্বক তাঁহাকে ধরিয়া চিতায় শয়ন কবাইল, চিতার সহিত বাঁধিয়া দিল, নিম্নে পাতা ও পাকাটি দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল।

প্রাণে একেবারে হতাশ হইয়া, নিধিরাম বলিলেন,—'যদি আমি তোমাদের মড়াই হইলাম, তবে আমাকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াও। সকলেই জানে যে, মড়াকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াইতে হয়।'

সকলে বলিলেন,—'হাঁ! এ কথা সত্য বটে। মড়াকে স্নান করাইয়া পোড়াইতে হয়।'

আগুন নিবাইয়া নিধিরামকে চিতা হইতে তাঁহারা উঠাইলেন ও দুই জনে দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে যাইলেন।

নদীতে উপস্থিত হইয়া নিধিরাম বলিলেন,— 'একবার ছাড়িয়া দাও, একটি ডুব দিই।'

নিধিরাম ডুব দিলেন, কিন্তু আর উঠিলেন না। 'মড়া পলাইল, মড়া পলাইল,' বলিয়া সকলে গোল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অন্ধকারে নিধিরামের সন্ধান তাঁহারা আর পাইলেন না। নিধিরাম নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। অনেক দূরে তিনি পুনরায় নদীর তীরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জলে ভিজিয়া ও নানারূপ কষ্ট পাইয়া নিধিরামের শরীর একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিয়া তিনি অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার ঘোরতর কম্প উপস্থিত হইল। সেই মাঠের উপর শুইয়া পড়িলেন। শয়ন করিতে না করিতে অজ্ঞান হইয়া যাইলেন।

নদীর উপর প্রায় এক ক্রোশ মাঠ। মাঠের পর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানিতে কেবল চণ্ডাল ও মুসলমানের বাস। রাত্রিতে ঝড় হইয়াছিল। অনেক নৌকা ডুবিয়া থাকিবে, জলমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবে, এই আশায় প্রাতঃকাল হইতে না হইতে গ্রামের লোকে নদীর ধারে আসিয়াছিল। চণ্ডালেরা মৃতপ্রায় ভূতলশায়ী নিধিরামকে দেখিতে পাইল। তখনও তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল। কোমরে তাঁহার টাকা আছে দেখিয়া কাহারও কাহারও লোভ হইল। তাঁহার নির্জীব দেহটি নদীতে ফেলিয়া দিয়া টাকাগুলি লইবার নিমিত্ত কেহ কেহ পরামর্শ করিল। কিন্তু সেই চণ্ডালদিগের মধ্যে দুই-এক জন বৃদ্ধ ছিল। নিধিরামকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না; নিধিরামকে তাহারা বাটী লইয়া যাইল। অগ্নির উত্তাপ দিয়া, ও নানারূপ সেবা করিয়া তাহারা নিধিরামকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার চেতন হইতে না হইতে জ্বর-বিকার উপস্থিত হইল। অনেক দিন তিনি এই চণ্ডালের গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল। আরোগ্য লাভ করিলে, চণ্ডালেরা তাঁহাকে একখানি নৌকা করিয়া দিল। সেই নৌকা করিয়া নিধিরাম পুনরায় রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আড় কাটায়

নিধিরামের নিকট অনেক টাকা আছে, নৌকার মাঝিরা কেহ কেহ এ কথা শুনিয়াছিল। এক দিন রাত্রিকালে নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া তাহারা নৌকাখানি ডুবাইবার উপক্রম করিল। শরীরে জল লাগিতেই নিধিরামের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকাখানি সম্পূর্ণ ভাবে ডুবিতে না ডুবিতে তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। দাঁড়ি-মাঝিরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিল।

কেহ হাত কেহ পা ধরিয়া জলে ডুবাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিল। বাঁচিবার নিমিত্ত সেই অন্ধকার রাত্রিতে জলের মাঝখানে নিধিরাম মাঝিদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি একলা, মাঝিরা চারি জন, কতক্ষণ আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন? বার বার তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া ক্রমে নির্জীব করিয়া ফেলিল। আর অল্পক্ষণ পরেই মাঝিরা তাঁহার প্রাণবধ করিত, কিন্তু এই সময়ে কোথা হইতে একটি কুম্ভীর আসিয়া নিধিরামের কোমর ধরিল ও লেজের আঘাতে দুই জন মাঝির প্রাণবধ করিল। নিধিরামকে কুমীরে লইয়া চলিল। একবার ডুবাইয়া পুনরায় যখন কুমীর জলের উপর ভাসিল, তখনও নিধিরামের শরীরে প্রাণ ছিল। নিধিরামকে মুখে করিয়া কুমীর পুনরায় ডুবিল ও অল্পক্ষণ পরে নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে নলের বন ছিল। নিধিরাম এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি জ্ঞান ছিল। কুমীর তাঁহার কোমর ছাড়িয়া পা ধরিল। মাটীর ভিতর তাঁহার মুখ পুতিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে নিধিরাম কুমীরের দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইলেন। কুমীরের চক্ষুতে তিনি দুইটি অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যাতনায় কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া জলে গিয়া পড়িল। কুমীরের কামড়ে নিধিরামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি প্রাণের দায়ে কোনও রূপে তিনি নল-বন পার হইয়া নদীর উপর গিয়া উঠিলেন। আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। সেই স্থানে বসিয়া আপনার দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে,—'হা ভগবান! আমার কপালে তুমি এত লিখিয়াছিলে? কিন্তু হিরণ্ময়ী! তোমার মত দুর্লভ রত্ন কি অনায়াসে লাভ হয়? তোমার জন্য, তোমার পিতার জন্য, যে আমি এই নিদারুণ ক্লেশ পাইতেছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই,—তাহাতে আমার সুখ। এখন, একবার তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিলে হয়।'

নদীর উপর যে স্থানে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, সে স্থানটি জন-শূন্য প্রান্তর। নিকটে মনুষ্যের বসবাস নাই। উপরে কেবল একটি ভগ্ন কালীর মন্দির ছিল। নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে লোক আসিয়া কালে-ভদ্রে এই কালীর পূজা দিয়া থাকে। উপরে মন্দির আছে, কি, কি আছে, নিধিরাম তাহার কিছুই জানেন না। রাত্রিকাল, অন্ধকার, কি করিয়া তিনি জানিবেন? এক দল ডাকাত এই রাত্রিতে কোথায় ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। কালীর পূজা দিয়া তবে তাহারা ডাকাতি করিতে যাইবে। মহা সমারোহে এই স্থানে কালীর পূজা হইতেছিল। যেখানে নিধিরাম বসিয়া আছেন, সেই স্থানে দুই জন ডাকাত বলি দিবার নিমিত্ত পাঁঠা স্নান করাইতে আনিল। নিধিরামকে তাহারা দেখিতে পাইয়া ধরিল। তাহারা বলিল,—'ভাই! মা'র কি কৃপা! মা আজ আমাদের মানুষপাঁঠা মিলাইয়া দিলেন। এখন বলি, হাঁ, মা কালী জাগ্রত বটে! অনেক কাল পরে মা'র আজ নরবলি খাইতে সাধ হইয়াছে। আজ আমাদের অনেক টাকা মিলিবে।' নিধিরাম তাহাদিগের নিকট হাতযোড় করিয়া কত মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। তাঁহাকে ধরিয়া তাহারা মন্দিরের সম্মুখে দলের মাঝখানে লইয়া গেল। ডাকাতের দলে আর আনন্দের পরিসীমা নাই। মা নিজে আজ নরবলির যোগাড় করিয়াছেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নিধিরাম কত কি বলিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। ডাকাতদিগের সর্দার নিজে কোপ মারিবার নিমিত্ত খাঁড়া তুলিলেন। নিধিরাম বলপূর্বক খর্পর হইতে মাথা সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—'পাপিষ্ঠ নরাধমেরা! ব্রহ্মহত্যায় তোদের ভয় নাই?' কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও মশালের আলোকে নিধিরামের মুখ দেখিয়া, ডাকাতদিগের সর্দার খাঁড়া নামাইল। সর্দার বলিল,—'ইহার সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত, সর্ব শরীর হইতে ইহার রক্তধারা পড়িতেছে। মা'র নিকট এরূপ বলি কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাকে ছাড়িয়া দাও।' বিরস-বদনে ডাকাতেরা নিধিরামকে ছাড়িয়া দিল। নিধিরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দার বলিল,—'ব্রাহ্মণ! তোমার খুব পরমায়ু! এস, তোমাকে গ্রামে যাইবার পথ দেখাইয়া দিই।' একটু দূরে গিয়া

উপস্থিত হইলে সর্দার বলিল,—'আমি কে জান? আমি উদ্ধব দাদা, মদ খাইয়া সে দিন তোমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে সে দিন তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে। আজ সাদা চক্ষে তোমার মাথা কাটিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। যাও; কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, মাঠের পথ তুমি দেখিতে পাইবে না, কোনও গাছতলায় পড়িয়া রাত্রিযাপন কর। প্রাতঃকাল হইলে যেখানে ইচ্ছা যাইও।'

সকাল হইলে নিধিরাম অতিকষ্টে নিকটস্থ একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কুম্ভীরের কামড়ে সর্বশরীর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পথ চলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। এই গ্রামে এক সদ্‌গোপের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই স্থানে থাকিয়া যথাবিধি আপনার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আরোগ্য-লাভ করিয়া পুনর্বার রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে বহুদূর চলিয়া যাইলেন, ক্রমে রামনগরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। এক দিন সন্ধ্যাবেলা কোথাও বাসা না পাইয়া, তিনি একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সাত বেটা। মকদ্দমা-মামলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চুরি-ডাকাতি সকল বিষয়ে তাহারা পরিপক্ক, কর্তাটি মকদ্দমা করিতে রামনগর গিয়াছিলেন। পুত্রেরা নিধিরামকে চণ্ডীমণ্ডপে স্থান দিয়া আহারাদির সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। আহারাদি করিয়া নিধিরাম শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে পাশের একটি দ্বার দিয়া দুইটি বালক উঁকি মারিল। তাহারা দুই জনে বলাবলি করিতে লাগিল,—'ভাই! এই বামুনের কাছে অনেক টাকা আছে, আজ রাত্রিতে বাবা, কাকা সকলে মিলিয়া ইহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ইহার পলাইবার যো নাই। চারি দিকে তাঁহারা পাহারা দিয়া আছেন। কি করিয়া মানুষ মারে, কখনও তাহা দেখি নাই, আয় ভাই, এক কর্ম করি। আরও রাত্রি হইলে চুপি চুপি বাটির ভিতর হইতে আসিয়া ঐ খড়ের গাদার ভিতর লুকাইয়া থাকিব, উহার ভিতর হইতে মানুষ মারা দেখিব।'

নিধিরাম শুইয়া শুইয়া সকল কথা শুনিলেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। চিন্তা করিয়া তিনি কোনওরূপে চণ্ডীমণ্ডপের আড়কাটার উপর উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, বাড়ীর কর্তাটি রামনগর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর ও বালিশ রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, 'রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাহাকেও আর ডাকাডাকি করিব না। এইখানেই শুইয়া থাকি।' চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরামের বিছানায় বাড়ীর কর্তাটি শুইয়া রহিলেন। ঘোর রাত্রিতে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা লাঠি বল্লম প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইল। দুই জন আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া তাহাদের নিদ্রিত পিতার মাথায় সবলে এক মুগুর মারিল। মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। তাহার পর তাহারা ব্রাহ্মণের কোমরে হাত দিয়া টাকা অন্বেষণ করিতে লাগিল! কিন্তু টাকা পাইল না। ভাল করিয়া খুঁজিবার নিমিত্ত প্রদীপ আনিল। প্রদীপ আনিয়া দেখে না, পিতাকে হত্যা করিয়াছে! শোকে, ভয়ে, ক্রোধে সকলে আকুল হইয়া পড়িল। পথিক ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? এই স্থানেই অবশ্য কোথায় লুকাইয়া আছে! এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমেই খড়ের গাদায় চারিদিক হইতে বল্লমের খোঁচা মারিতে লাগিল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটি ভয়ে "আঁ আঁ" করিয়া উঠিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু অধিক আর বলিতে হইলও না, সেই মুহূর্তেই বল্লমের আঘাতে তাহারা প্রাণ হারাইল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটির মৃতদেহ বাহির করিয়া সকলে জানিতে পারিল যে, কি সর্বনাশ হইয়াছে। তাহারা মনে করিল যে, বিধাতা আজ তাহাদের প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। প্রতিবাসীদিগের ভয়ে অধিক আর গোলমাল করিতে পারিল না। তিনটি মৃত দেহ লইয়া খিড়কির বাগানে পুতিতে যাইল।

নিধিরাম আড়কাটার উপর বসিয়া এই সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। যখন তাহারা মৃতদের লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে যাইল, তখন আস্তে আস্তে তিনি আড়কাটা হইতে নামিলেন, নামিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রামনগরের দিকে দৌড়াইলেন। তাহার পরদিন রামনগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই এককড়িকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া এককড়ি তাঁহাকে অগণ্য আশীর্বাদ করিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি আজ বাড়ী গমন করুন। আপনার নিমিত্ত বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত আছেন! আমার এখানে বিশেষ কোনও কাজ আছে। দুই চারি দিন পরে আমিও চণ্ডীপুরে গিয়া উপস্থিত হইব।" এককড়ি, কি করিবেন? একেলা বাটী গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় . অদৃষ্টের লেখা

নিধিরাম থানায় গিয়া গত রাত্রির সমুদয় ঘটনা পুলিশের নিকট জানাইলেন। সাতভেয়েরা বদমায়েশ বলিয়া পুলিশের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। নিধিরামকে সঙ্গে লইয়া পুলিশের লোকে সাতভেয়েদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কির বাগান খুঁড়িয়া তিনটি মৃতদেহ পাইল; সাত ভাই সকলকে বাঁধিয়া রামনগর চালান করিল। পুলিশের নিকট নিধিরামকে চারি দিন থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত দিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি চণ্ডীপুরের নিকট একটি মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে এককড়ির বাড়ী অধিক দূর নয়. প্রায় এক পোয়া পথ। হন হন করিয়া মাঠটুকু পার হইতেছেন. এমন সময় স্ত্রীলোকের কাতর স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল `ওগো, কে যাও গো! আমাকে রক্ষা কর।' এই কয়টি কথা শুনিতে পাইলেন। তাহার পর 'গোঁ গোঁ' শব্দ হইতে লাগিল। যেন কেহ কাপড় দিয়া স্ত্রীলোকটির মুখ বন্ধ করিয়া দিল। নিধিরাম সেই দিক পানে দৌড়িলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, চারিজন লোক একটি শায়িতা স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে, ও একজন কাপড় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নিধিরাম বলিলেন,—'এ কি? কে তোমরা?' তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—'সেই বাঙ্গাল শালা রে। বেটা হিরণ্ময়ীকে বে করিবেন। বামন হইয়া চাঁদে হাত। মার বেটাকে।'

যখন এককড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন বদরুদ্দিন অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ঘরে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যনাথ মনে করিয়াছিলেন যে, অধিক দিন কারাগারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া এককড়ি হিরণ্ময়ীর সহিত তাঁহার পুত্র গরীবুদ্দিন অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। হতাশ হইয়া গোবিন্দ একেবারে পাগল হইয়া উঠিলেন। বলপূর্বক হিরণ্ময়ীকে লইয়া বিবাহ করিবেন, তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। টাকা দিয়া চারিজন ইতর লোককে বশ করিলেন। পাঁচজনে হিরণ্ময়ীকে ধরিবার নিমিত্ত সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে আজ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যার পর একটু বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছিলেন। সেই অবসরে পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ধরিল ও মুখে কাপড় দিয়া মাঠের দিকে লইয়া চলিল। বাটীর লোক কি গ্রামের লোক কেহই ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলে, দৈবক্রমে হিরণ্ময়ীর মুখের কাপড় একটু আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি একবার চীৎকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৈবক্রমে সেই সময় নিধিরামও মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন

গোবিন্দের কথা শুনিয়া নিধিরাম বুঝিলেন যে, তাহারা হিরণ্ময়ীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। নিমেষের মধ্যে তিনি এক ঘা লাঠি মারিয়া দুইটি লোককে ভূতলশায়ী করিলেন। বাকি তিনজন হিরণ্ময়ীকে ছাড়িয়া নিধিরামের উপর লাঠি বর্ষণ করিতে লাগিল। 'কে কোথায় আছ গো। এস গো। ওগো, এখানে সর্বনাশ হয় গো!' এই বলিয়া হিরণ্ময়ী চীৎকার করিতে লাগিলেন। দূর হইতে কে শব্দ করিল,—'যাই, যাই ভয় নাই।' এইরূপ শব্দ শুনিয়া গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ পলাইল। নিধিরামের লাঠিতে যে দুইজন প্রথমেই মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারাও উঠিয়া পলাইল।

গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ যখন পলাইয়া গেল, তখন হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, নিধিরাম মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হিরণ্ময়ী গিয়া তাঁহার মাথাটি তুলিয়া ধরিলেন। দেখিলেন, তাঁহার জ্ঞান নাই, সর্বশরীর রক্তে প্লাবিত হইতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে হিরণ্ময়ী তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দূর হইতে যে লোকটি সাড়া দিয়াছিলেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি সুন্দর যুবাপুরুষ। আর কেহ নয়, জয়দেবপুরের ধনবান্ কুলীনের ছেলে নবীন, যাঁহার মাতুলাশ্রয় চণ্ডীপুরে, যাঁহার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। নবীন আসিয়া উপস্থিত হইলে, হিরণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে দুই-চারি কথায় তাঁহাকে ঘটনার বিষয় বলিলেন। নিধিরামের নাকে মুখে বুকে হাত দিয়া নবীন বলিলেন,—'বোধহয়, ইনি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র ইহাকে গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে। আমরা দুইজনে এত পথ লইয়া যাইতে পারিব না। রও, আমি লোক ডাকি।' এই বলিয়া নবীন চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলেন

সন্ধ্যাবেলা হিরণ্ময়ী বাহিরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, তথাপি হিরণ্ময়ী ফিরিয়া আসিলেন না। এককড়ি ও তাঁহার গৃহিণী প্রথমে বাড়ীর আশেপাশে খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। মহা ভাবনা উপস্থিত হইল। প্রতিবাসিগণ চারিদিকে হিরণ্ময়ীকে খুঁজিতে দৌড়িল। যাহারা মাঠের দিকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহারা নবীনের চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। যেস্থানে ভূতলশায়ী নিধিরামকে লইয়া হিরণ্ময়ী ও নবীন ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। ঘটনার বিষয় সকলে অবগত হইয়া ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষু নিধিরামকে এককড়ির বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রদীপ আনিয়া সকলে দেখিল যে, নিধিরামের আর কিছু বাকী নাই। বক্ষঃস্থলে প্রাণটুকু কেবল অল্পমাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মস্তক দুই চারি স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে, একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, নাসিকা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই পাটি দন্ত একেবারে গিয়াছে। রক্তে রক্তে নিধিরামের সেই সুন্দর, গৌরবান্বিত মুখখানি, একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যের মুখ বলিয়া আর চিনিতে পারা যায় না।

এককড়ির ঘরে সে রাত্রিতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। নিধিরামকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে যত্নবান হইলেন। সে রাত্রিতে নিধিরামের মৃত্যু হইল না। তাহার পরদিনও হইল না। তিন দিনের দিনও মৃত্যু হইল না। একটু যেন আশা হইল। কিন্তু জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই, কিছু নাই। কেবল নিশ্বাসটি পড়িতেছে, এইমাত্র।

হিরণ্ময়ী নিধিরামের সেবা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী সর্বদা অচেতন নিধিরামের নিকট বসিয়া থাকেন। নবীন প্রতিদিন নিধিরামকে দেখিতে আসেন। নিধিরামের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন। একদিন নবীন বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী! আমি শুনিয়াছি, তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। আমার পিতা অনেক টাকা চাহিয়াছিলেন, তাই হয় নাই! তখন যদি জানিতাম যে, তোমার কি অপূর্ব রূপ, তুমি কি অমূল্য রত্ন, তাহা হইলে বাবাকে কি অমত করিতে দিতাম? মা-বাপের আমি একমাত্র সন্তান। আমাদের টাকা-কড়ির অভাব নাই। মায়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া হউক, পিতাকে সম্মত করাইতাম। বড়ই দুরদৃষ্ট, হিরণ্ময়ী! যে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইল না।' হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—'মহাশয়! আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।'

হিরণ্ময়ী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইল। একদিকে দরিদ্র, অর্ধ বৃদ্ধ, একচক্ষুহীন, নাসিকাহীন, দন্তহীন, কিম্ভূত কদাকার ভয়াবহ নিধিরামের পিণ্ডাকার মুখ, অপরদিকে ধন সম্পত্তিবিশিষ্ট নবযৌবনসম্পন্ন, রূপবান নবীনের মুখ। নিধিরাম না বাঁচেন, হিরণ্ময়ীর এইরূপ একটু ইচ্ছা হইল। সেই দিন হইতে নিধিরামের সেবায় একটু কমও পড়িল।

তাহার পরদিন নবীন পুনরায় সেই কথা বলিলেন। সেদিন হিরণ্ময়ী আর তাঁহাকে বকিলেন না। তাহার পরদিন নবীন পুনরায় সেইভাবের কথা বলিলেন। হিরণ্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া শুনিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। হিরণ্ময়ী অবশেষে উত্তর করিলেন,—'আমাকে এ সব কথা বলা বৃথা। আমি স্ত্রীলোক, আমার কি হাত আছে? আমার পিতা-মাতা আছেন, কিছু বলিতে হয়, তাঁহাদিগকে বলুন।' দুই দিন নবীন আর আসিলেন না। তাঁহাকে না দেখিয়া হিরণ্ময়ীর প্রাণ উদাস হইল। দুই দিন পরে নবীন আসিয়া হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—"আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। তোমার সহিত বিবাহ-বিষয়ে আমার পিতা মাতাকে সম্মত করিয়াছি। কিন্তু তোমার পিতা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তিনি বলিলেন,—'নিধিরামকে আমি কন্যা সমর্পণ করিয়াছি। নিধিরাম যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান, তাহা হইলে জানিব, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়া কন্যা আমার ঘরে থাকিবে।'" নবীন বিলাপ করিতে লাগিলেন, হিরণ্ময়ীও কাঁদিতে লাগিলেন।

যাহার পরমায়ু আছে, তাহাকে কে মারিতে পারে? নিধিরামের ক্রমে জ্ঞান হইল, নিধিরাম ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। প্রায় একমাস পরে নিধিরাম উঠিয়া বসিতে পারিলেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি একটু-আধটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। নিধিরামের প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্তু তাঁহার রূপ দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। মাথায় ও মুখের চারিদিকে সেলাই করার মত দাগ। একটি চক্ষুতে ঢেলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নাসিকাটি বিলুপ্তপ্রায়। দন্ত একটিও ছিল না। এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। দেখিলে ভয় হয়। 'ইনি

আমার পতি হইবেন!" এই কথা ভাবিয়া হিরণ্ময়ীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

যে দিন হইতে নিধিরাম চেতন হইলেন, সেই দিন হইতে নবীন আর হিরণ্ময়ীর সহিত মনের কথা বলিতে পারিলেন না। নিধিরাম যখন একটু আধটু বেড়াইতে সমর্থ হইলেন, তখন একদিন সুযোগ পাইয়া নবীন হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী! পৃথিবীতে আর আমাদের কোনও আশা-ভরসা নেই। তোমার নিকট দুইটা মনের কথা বলি, এরূপ অবসর আর পাইব না। আজ সন্ধ্যার পর যদি তুমি তোমাদের বাটীর পশ্চাতে অশ্বত্থতলায় একবার আসিতে পার, তাহা হইলে দুইটা মনের কথা বলিয়া তোমার নিকট হইতে চির বিদায় হই।'

হিরণ্ময়ী কোনও উত্তর করিলেন না। 'যাইব কি না যাইব' সমস্ত দিন এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। যাওয়া উচিত নয়, তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। কিন্তু পুনরায় ভাবিলেন,—'একবার যাই না কেন? একবার গিয়া চিরবিদায় হইয়া আসি না কেন? তাহাতে আর দোষ কি?'

অষ্টম অধ্যায় : সব ফুরাইল

এককড়ির বাটীর পিছনে অশ্বত্থ গাছ ছিল। অশ্বত্থ গাছের তলদেশ গোল করিয়া চারিদিক্ সান বাঁধানো ছিল। সন্ধ্যার সময় হিরণ্ময়ী নবীনের সহিত সেই অশ্বত্থতলায় সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে কত কি বলিলেন, কত কি কহিলেন, কত কাঁদিলেন। নবীন বলিলেন,—'আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে বেড়াইব।' হিরণ্ময়ী বলিলেন,—'বৃদ্ধের কদাকার মুখ মনে করিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, ভয়ে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে।'

দৈবের ঘটনা! সেই দিন সন্ধ্যাবেলা নিধিরাম আসিয়া এই অশ্বত্থতলায় সানের উপর বসিয়াছিলেন। যে দিকে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে বসিয়া হিরণ্ময়ী ও নবীনে কথাবার্তা হইতেছিল। হিরণ্ময়ী ও নবীন নিধিরামকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু নিধিরাম তাঁহাদিগের সকল কথা বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। যখন হিরণ্ময়ী ও নবীন ঘোরতর খেদ, ঘোরতর কান্না কাটনা করিতে লাগিলেন, তখন নিধিরাম আর থাকিতে পারিলেন না। নিধিরাম বলিলেন,—'নবীনবাবু! তুমি বাড়ী যাও। কাল তোমার মাতুলের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। হতাশ হইও না, আমি নরাধম নই।' নবীন চমকিত হইলেন। নিধিরামের গুরুগম্ভীর বাক্যে লজ্জিত হইয়া অধোবদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবীন চলিয়া যাইলে, নিধিরাম হিরণ্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরণ্ময়ী! তোমার মনে এই ছিল? আমি কুরূপ কদাকার হইয়াছি সত্য! কিন্তু মন তো আমার সেই আছে। জীবন মন তো আমার হিরণ্ময়ীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি হিরণ্ময়ী! এ বয়সে মনে কোনও একটা বিষয় অঙ্কিত হইয়া যাইলে তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি! হিরণ্ময়ী! সে কথা তুমি কিছুই জান না। হিরণ্ময়ী! কিন্তু সে কষ্ট কিছুই নয়। আজ আমার মনে তুমি যে শেল মারিলে, তাহার কাছে সে কষ্ট কি ছার! সকলই অদৃষ্টের দোষ। যাও, হিরণ্ময়ী ঘরে যাও। নিধিরাম কুরূপ, কদাকার বাঙ্গাল বটে, কিন্তু অভদ্র নয়। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহা আমি করিব।'

তাহার পরদিন নিধিরাম নবীনের মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবীনের পিতা-মাতা হিরণ্ময়ীর সহিত বিবাহে সম্মত আছেন, তাহা জানিতে পারিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—'আপনারা অধিক আড়ম্বর করিবেন না। কেবল বর, পুরোহিত ও নাপিত লইয়া আসিবেন। এই মাসেই হিরণ্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে। আমি যেমন করিয়া পারি, হিরণ্ময়ীর পিতাকে সম্মত করিব।' নবীনের মাতুল এ কথায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—'মহাশয়! আমার এই বিকট মূর্তি দেখিয়া ভূত পর্য্যন্ত ভয়ে পালায়। নিজের মুখ নিজে দেখিয়া আমি ভয় পাই। আমি হিরণ্ময়ীকে কখনই বিবাহ করিব না, ইহা আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা জানিবেন। হিরণ্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে, সব স্থির হইয়াছে। এখন আপনি অনুমতি করিলেই হয়।'

এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—'আমার কন্যা কুলটা নহে, কন্যা আমি আপনাকে সমর্পণ করিয়াছি। কন্যা আমার আপনার পত্নী, অন্যমত করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব, কন্যাও ধর্মে পতিত হইবে। এ কাজ করিতে আমি কিছুতেই পারিব না।'

নিধিরাম এককড়িকে ক্রমাগত জপাইতে লাগিলেন। কত বলিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এককড়ি বলিলেন,—'তুমি ও গৃহিণী যাহা জান, কর, আমি বাটী হইতে চলিলাম। এ পাপে আমি লিপ্ত থাকিব না।' এই বলিয়া এককড়ি বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরামের হাতে যা অবশিষ্ট টাকা ছিল, তাহা দিয়া বিবাহের সমুদায় আয়োজন করিলেন, বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। একজন জ্ঞাতি ডাকিয়া নিধিরাম কন্যা উৎসর্গ করাইলেন। নবীনের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহকার্য্য সমাধা হইল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া, নিধিরাম তাহার পরদিন এককড়িকে বাহির করিলেন, নিকটস্থ একটি গ্রামে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, শোকে দুঃখে আকুল হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়! কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কন্যা লইয়া আপনার জামাতা নবীন, আজ নিজ গ্রামে গমন করিবেন,—কন্যা বিদায় করিবেন, চলুন।'

এককড়ি উত্তর করিলেন,—'নিধিরাম! তোমাহেন দেব-পুরুষকে যে জামাতা করিতে পারিলাম না, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না, সে দুঃখ বড় রহিল। বৃদ্ধ হইয়াছি, অধিক দিন আর বাঁচিব না, কিন্তু এই মনের কালি আর কখনও ঘুচিবে না। চল যাই, চিরদিনের নিমিত্ত হিরণ্ময়ীকে বিদায় করি। কি জন্য তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে না, তাহা জানি না। কিন্তু আর আমি কখনও তাহার মুখ দেখিব না।'

দশ ক্রোশ দূর, জয়দেবপুর যাইবেন বলিয়া, নবীন নৌকা ভাড়া করিলেন। হিরণ্ময়ীকে লইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত এককড়ি ও নিধিরাম গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—'মহাশয়! আমার বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। মা'র সুশীতল পবিত্র নীরে শরীরের কিয়দংশ কিছুকালের নিমিত্ত নিমগ্ন করিয়া রাখি, তাহা হইলে বোধ হয় শরীর সুস্থ হইবে। আপনি আমার নিকটে বসুন, আপনার কোলে মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করি।'

এককড়ি জলের নিকট গঙ্গাতীরে বসিলেন। নিধিরাম প্রথম তাঁহার চরণধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন। তাহার পর আপনার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিলেন। এককড়ির বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হাতে পৈতা জড়াইয়া জপ করিতে লাগিলেন। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। হরে হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।

হিরণ্ময়ী মৃদুমধুর ভাষে নবীনকে বলিলেন,—'বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আমার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।'

নিধিরাম সেই নৌকাপানে একদৃষ্টে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, এককড়ি দেখিলেন যে, নৌকাখানি যতই দূরে যাইতে লাগিল, আর নিধিরামের শরীর ততই অবশ, অবসন্ন, গুরু হইতে লাগিল। মোড় ফিরিয়া সেই নৌকাখানি অদৃশ্য হইল, আর নিধিরামের প্রাণ-বিয়োগ হইল।

ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ। হরে হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁ রামঃ।

লুল্লু

প্রথম অধ্যায় : চুরি

'লে লুল্লু,' আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কি বিপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী সহরে. আমীর জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—'লে লুল্লু। অর্থাৎ কি না, 'লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।' লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কান্‌কাটারও নাম নয়। 'লুল্লু' একটি বাজে কথা, ইহার কোনও মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্য্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে আমীরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল, শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন্। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন. কিন্তু সাড়াশব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় প্রদীপ হাতে করিয়া আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীর নামগন্ধও নাই। আবার আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাড়ীর দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতী-সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ীর বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপে কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া ত যাইতে হইবে! দ্বার ত আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না! দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে না দেখিয়া গৃহ শূন্য জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। 'আমি আমার অমূল্য নারী-রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম; আমার কথা মত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়াই লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায় হায়! কি হইল!' এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-

ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকী রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমীরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কত দিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু পাকা আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক ত স্ত্রী গেল, তার পর যখন এই কলঙ্কের কথা আমীরের কানে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,— 'দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জন দিব।'

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না;—লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমীর কিছু সৌখীন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আর্‌সির মত তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খান্‌সামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো-কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, তাই সেই হিজিবিজিগুলির বড়ই গৌরব করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনাভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—'চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটিং সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কাজে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি। মূল্য চারি আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।' যাহা হউক আমীর যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া, চীনের উত্তরসীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল। এত মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তেল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া, পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে। বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ নদী গ্রাম প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনওমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়ো-হাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমের চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটি জানের বাড়ী। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান।

সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে ভাষায় বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না,—ইংরেজিতে হউক, কি ফারসীতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্ণমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমীর বলিলেন,—'আমিও জানের বাড়ী যাই, ইন্‌শাল্লাতালা! কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে, সে গণিয়া দিবে।' আমীর গিয়া জানের বাটীর সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা-গাঁথা হইয়া যাইলে, অতি বিনীতভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানি খাপ্‌রা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খাপরায় ফুঁ দিতে লাগিলেন। যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তর দিকে, একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুড়িয়া ফেলিলেন। তার পর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'ফকিরজী! আপনার স্ত্রীর সন্ধান পাইয়াছি। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু করিব কি! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।' এইরূপ আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে কোনও দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজি-ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কি না হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূতদেহে ত রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—'দূর হউক আর কাহাকেও পাইব না।' ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—'দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।' ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। শ্মশান-মশান আজ তাই নীরব। রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশ পানে পা তুলিয়া জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও এক প্রকার লোপ হইয়াছে। নানাস্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনা-দানা পরিয়া, যাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারী। আমীর দেখিলেন, ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে,—'যদি আমাকে পৃথিবী উলট পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।' এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—'হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল ভূতের রোজা আছে?' ছোট-খাট অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যকে দূর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইলেন না; বুক ফুরিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে,—'ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।' অবশেষে অনেক পথ, অনেক দূর যাইয়া আমীর একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?' বৃদ্ধা উত্তর করিল,—'হাঁ বাছা! আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কি বলিব, দু পা দিয়া

জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাহাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক দ্বারে হাতী, ঘোড়া, উট বাঁধা।'

তৃতীয় অধ্যায় : তাঁতি

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'দেখ, ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কি করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? ফকির সাহেব! তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।' এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি। যেমন কঠিন, তেমনি কোমল! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'শুন ফকিরজী! তোমাকে মনের কথা বলি,—প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না। এমন কি, গায়ত্রী পর্য্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে ক খ পর্য্যন্তও শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজি-পড়া বাবু ভায়াদিগের মত নই।' আমীর বলিলেন,—'সে কি মহাশয়! তবে আপনি মহাজনকন্যার ভূত ছাড়াইলেন কি করিয়া?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।' আমীর বলিলেন,—'আল্লার কসম্, আমার মুখ দিয়া এ কথা কখনই বাহির হইবে না।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'এই গ্রামে একটি তাঁতি বাস করে। তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোনও ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটি স্বরটি বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্বার আস্তে আস্তে গাইয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে। তাঁতি মনে মনে ভাবিল, 'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটি এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরা, মণিমুক্তা উপরে চক্মক্ না করিয়া, মাটী কি জলের ভিতর কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাইয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাততঃ প্রতিবাসীদিগকে আমার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।' এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। এক দিন যায়, দুই দিন যায়, গ্রামবাসীবা শশব্যস্ত। দুই চারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল,—'বাপু হে! পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বল ত ঘরদ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও।' তাঁতি বলিল,—'না মহাশয়! সে কি কথা? গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কানে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাহার বোধাবোধ আছে, তিনি মাঠে গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিকস্বরূপ একপণ করিয়া আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামের লোকে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই, শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সেদিক মাড়ায় না। কাক পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—'ফকিরজী! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মত দীনদুঃখী আর কেহ

ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হউক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কি করিব, কোনও উপায় ছিল না, মনের আগুন মনেই নিবাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন—'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে, তাহার গান শুনিলে একপণ কড়ি দিবে। যাও না, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না? এক পণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুইজনে খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম—'দেখ ব্রাহ্মণী! ও কথাটি আমাকে বলিও না। শূলে যাইতে বল, তা যাইতে পারি, আগুনে পুড়িয়া মরিতে বলিলেও মরিতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিও না, তিলেকের নিমিত্তও সে দগ্ধাগ্নি আমি সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার ক্রমে কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—'যাও, একটুখানি তাঁতির গান শুনিয়া এক পণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কি করিব। তাঁতির গান কি করিয়া শুনি? অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া এক জনদের বাটী হইতে একগাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্য দিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, আর একটি মাঠ গিয়া আর একটি অশ্বত্থগাছে দড়িটি খাটাইলাম, ফাঁসটি ঠিক করিয়া লইলাম। গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটি ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল,—'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণন করিলাম। ভূত বলিল,—'আর ভাই! ও কথা বলিস্‌নে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ যুগান্তর হইতে ঐ গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যেদিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পালাইতে হইল। দেখিতেছি, দুই জনেই আমরা এক বিপদে বিপন্ন। তা, তোর আর ভাবনা নাই, তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলিবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সে-ই একমাত্র কন্যা। অনেক ধন-দৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সেখজী! শুনিলে তো। আমি রোজা নই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটি ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে, আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলে সকলে আমাকে লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কানে কানে গিয়া বলি,—''শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে তো যাও, না হইলে এখানে তাঁতির গান দিব।'' তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়সড়, পলাইতে পথ পায় না।'

চতুর্থ অধ্যায় : উদ্‌যোগ

আমীর বলিলেন,—'মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ, ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ-পরিচয় আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি-বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি দুটো কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়, স্ত্রীকে কি করিয়া পাই, তাহার একটা না একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।' ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া, আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া, যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গাছের দিকে চাহিয়া ঊর্ধ্বমুখে দুইজনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা

মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।' মুসলমান বলিল, 'ভূত সাহেব! হুজুরের নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছতলায়, কাঁচা পাকা সিন্নি চড়াইব।' এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে করিতে গাছটি দুলিতে লাগিল, গাছটির উপর যেন এক প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল, ডালপালা সমুদয় মড় মড় করিতে লাগিল। তার পর গাছের ডগায়, এক স্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুই প্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকার। ক্রমে সেই অন্ধকাররাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল! বিজ্ঞান-বেত্তারা, বিশেষতঃ ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্পস্বল্প অন্ধকার থাকেই। তার পর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব সস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। সস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগত ভাবে ভূত বলিল,—'বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস? তোর মত বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেননা, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্তালোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক-বিশিষ্ট নয়।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'প্রভু! আমি নিজের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে আমার আর কিছুরই অভাব নাই। এই লোকটি নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।'

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—'সঙ্গে তোমার ও লোকটি কে?' ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই ভূতকে শুনাইলেন! শুনাইয়া বলিলেন,—'মহাশয়! আপনাকে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটি প্রাণে মরিবে। আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণ রক্ষা করুন।' ভূত বলিল,—'ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয় লুল্লু লইয়া গিয়াছে। লুল্লু সবে নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে বড়ই দুরন্ত।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে? মহাশয়! সে কি প্রকার কথা?' ভূত হাসিয়া বলিল,—'এ কথা তোমরা কিছু জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছি। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেই দিন হইতে ভূতটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটি ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না; কেননা, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনশ্চিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্দ্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়রা ধন লুটিতেছে! ভাল, কাপড় না পরিলেই ত হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে ত আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই ত

হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না? তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনও আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি। আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করিবার উমেদারিতে থাকি। ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে ত কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না? তাই বলি, না মরিলেই ত সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের? অপরাধের মধ্যে এই যে, মরিলে আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

'যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই। অবশেষে কর্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারীতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি-সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে এ কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সে কি কথা মহাশয়? দুরাচার লুল্লুর কার্য্যে আপনি সন্তুষ্ট! আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি!' এইরূপ অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল,—'দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদবিসংবাদ, ভালমন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন ইহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর; এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, সে কূপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঁঘোঁ বলিয়া একটি ভূত বাস করে। ঘ্যাঁঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে। তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল, ঘ্যাঁঘোঁ মনোদুঃখে জর-জর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কূপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার। চেষ্টা করিয়া দেখ।'

পঞ্চম অধ্যায় : ঘ্যাঁঘোঁ

ব্রাহ্মণ এবং আমীর, আর করেন কি? দুই জনে ঘ্যাঁঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূপের ধারে গিয়া ঘ্যাঁঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—'ঘ্যাঁঘোঁ মহারাজ! বাড়ী আছেন?' ডাকিয়া ডাকিয়া দুই জনেরই গলা ভাঙ্গিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঁঘোঁ কূপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্য্যন্ত দিল না। দুই জনে তখন ভাবিলেন, এ ত বড়ই বিপদ! এর আবার উপায় কি করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—'চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই।' বিরস-বদনে দুই জনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুই জনে তাঁতির নিকট যাইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁতিকে বলিলেন, 'ভায়া! তোমাকে একটি উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঁঘোঁ নামে একটি ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কানের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঁঘোঁ এখন একটি কূপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কানে পোকা হইলে অনেক কালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কানের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি তুমি একবার সেই কূপের ধারে বসিয়া একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।' এ পর্য্যন্ত ইচ্ছাসত্ত্বে কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক। এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল,—'আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।' তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিন জনে পুনরায় সেই কূপাভিমুখে চলিলেন। কূপের ধারে পৌঁছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণ ও আমীর কানে অঙ্গুলি দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কূপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঁঘোঁ ভাবিল,—'মনের খেদে জর-জর

হইয়া বিরলে কূপের ভিতর বসিয়া আছি, এখানে আজ আবার এ কি ভীষণ ব্যাপার! সে কালে কবির চিতেন শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়।' ঘ্যাঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে কূপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি? কাজেই বাহির হইতে হইল। হামাগুড়ি দিয়া কূপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঘোঁ বেঁটে-খেঁটে, হাড়-ওটা বুড়ো-সুড়ো ভূত। মনের খেদে দেহ তার এতই জর জর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

কূপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে উর্ধ্বশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ, তুমি পলাইও না, তোমার ভয় নাই, ঐ দেখ তাঁতি ভায়া চুপ করিয়াছে। আর পলাইবে বা কোথা? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতি ভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতি ভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই।' ঘ্যাঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, আমীরের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর একটি গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঘোঁর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইল। সে বলিল,—'আচ্ছা কি বলিবে বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে?' ব্রাহ্মণ বলিল,—'লুল্লু নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার? আর কি করিয়াই বা তাহার উদ্ধার হয়?' ঘ্যাঘোঁ বলিল,—'অনেক দিন ধরিয়া, ঘোর দুঃখ জর-জর হইয়া আমি এই কূপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পলাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।' ঘ্যাঘোঁ উত্তর করিলেন,—'পলাইয়া আর কোথায় যাইব? যেখানে যাইব, সেইখানে গিয়া তোমরা তাঁতির গান জুড়িয়া দিবে। তা ছাড়া আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই বা আমি কি করিয়া বলি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সত্য কর যে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে?' ঘ্যাঘোঁ বলিল, 'আমি সত্য বলিতেছি, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।' তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'আচ্ছা, তবে যাও, শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।' ঘ্যাঘোঁ বলিলেন—'রও, আমি আমার বড় নাগরা জুতাযোড়াটি পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।' এই বলিয়া ঘ্যাঘোঁ পুনরায় কূপের ভিতর যাইল, নাগরা জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। 'কখন্ আসে কখন্ আসে' এই কথা সকলেই মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন—'ঐ আসিতেছে, ঐ যেন উত্তর দিকে কালো দাগটির মত কি দেখা যাইতেছে।' নিকটবর্তী হইলে সকলেই বলিয়া উঠিলেন—'ঘ্যাঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঘোঁ আসিতেছে।' ঘ্যাঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন। সকলেই বলিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ! তুমি সত্যবাদী বট! মনোদুঃখে জর-জর হইয়াও তুমি আপনার সত্য রক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো?' ঘ্যাঘোঁ বলিল,—'সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর আমি সন্ধান পাইয়াছি।' সকলে বলিলেন,—'তবে শীঘ্র বল, আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায়? সে ভাল আছে তো?'

ঘ্যাঘোঁ বলিল,—'হিমালয়-প্রদেশে ভীমতাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটি ঘর খুঁদিয়েছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই 'সে' বিহনে অশোকবনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছেন। কেন যে কাঁদিতেছেন, তা বলিতে পারি না। লুল্লু আমাদের একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে, তার আবার কান্না কি? লুল্লু তাহাকে এক বৎসরকাল সময় দিয়াছে। এক

বৎসরের মধ্যে যদি শান্ত হইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কথা এই, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া লুম্ভুর ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা করিতে পারি না; তাহা হইলে ভূতসমাজে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। তবে এইমাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা একটি হৃষ্টপুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুম্ভুর ঘরে পৌছিতে পারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। মনের খেদে তো জর-জর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীরে আর শরীর নাই, এক বিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁগা নামে একটি গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচী দিয়া আসে। প্রেতিনী, শঙ্খচূণী, চুড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সে জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া যোল আনার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সে কালের মত এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কি বেহারা করিবে, কি গাড়ীতে যুতিয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিও।

'বিবাহের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু হু করিতেছে। একটি পরমরূপবতী ভূতিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তাহার রূপের কথা আর বলিব কি? তাহার নাকটি দেখিয়াই আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। ও হো নাকেশ্বরি! তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়া প্রাণ শান্ত করি। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াও।'

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভূতের তেল

নাকেশ্বরীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; সে একে একে সকলের করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিল। তখন আমীর,—ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন,—'আপনাদিগকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আর আপনাদিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা বাটী ফিরিয়া যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে।' কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না। আমীরের অনেক অনুনয়-বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, বিরস বদনে দুইজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা চলিয়া গেলে ঘ্যাঘোঁর কূপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তার পর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে ত স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।' অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ীটি খুলিলেন। পাগড়ীটি উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার এক পাশে একটি ফাঁস করিলেন। এইরূপ সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁগা নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেই দিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ীর অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—'নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস্ পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা

ধরিয়া টানিব এখন, তা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতিজামাই তোর ভূতগিরি করিতে পাইবে।' আমীর কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিলেন। কৌটাটির ঢাকন ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ওর ভিতর ও—কে?' আমীর বলিলেন,—'একটি ভূত।' গোঁগাঁ বলিল,—'ভূত! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।' খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁগাঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—'উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন?' আমীর বলিলেন,—'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।' গোঁগাঁ বলিল,—'আমি যে লেখাপড়া জানি না।' আমীর বলিলেন,—'পাগল আর কি! লেখাপড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত?' গোঁগাঁ বলিল,—'ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' আমীর বলিলেন,—'তবে আর কি! আবার চাই কি? এত দিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্য্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।' ভূত বলিল,—'তবে কি তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না? ঐ যে পাগড়ী? ঐ যে ফাঁস?' আমীর বলিলেন,—'আমি ত আর ক্ষেপি নি যে, গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাগড়ী আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা! তোরে ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস্? এখন চল্, ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।' এই বলিয়া আমীর তাহাকে চঙুর নলটি দেখাইলেন! ভূত জিজ্ঞাসা করিল, 'ও আবার কি?' আমীর বলিলেন, 'ইহার নাম বাম্বু, নে, শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।' ভূত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমীর টেকোটি বাহির করিয়া বলিলেন,—'দেখিতেছিস্?' ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'ও আবার কি?' আমীর বলিলেন,—'এর নাম আটখিল্লে। সাধু ভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতর যদি না প্রবেশ করিস্, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপাড়িয়া লইব।' বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্ চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন আমীর যদি নাও উপড়ান্ তো থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মূর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল, ভয়ে তাহার সর্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল,—'কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব, তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।' এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্তির উদয় হইল। শিস্ দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন, গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ী আছে?' লোকে বলিল,—'হাঁ আছে।' কলুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন,—'কলু ভায়া! আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।' কলু বলিল,—'তার আটক কি! এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিশিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা! কৈ, লইয়া এস।' দুই জনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত,—'ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল,—'এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?' আমীর হাসিয়া বলিলেন,—'জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে ত? গোঁগাঁ ভায়া!

সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে,—"ওহে ভাই শশধর! আগে এ দায়ে ত তর, তার পর কাজ কাম কর আর না কর।" ঘানি হইতে ক্রমে টপ্ টপ্ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একেবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপে ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে মরিয়া যাইত।

সপ্তম অধ্যায় : উদ্দেশ

তেলের শিশিটি পকেটে লইয়া আমীর পুনরায় চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া কত চড়াই উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটিতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, এই স্থানটিতে ডুব মারিতে হইবে, ইহার নীচেতেই লুল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটি বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্বশরীরে ভূতের তেল মর্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে, দেহ এত লঘু হইল, যেন তিনি পাখীর মত উড়িতে পারেন। তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর 'বিসমিল্লা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব মারিয়া ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্যন্ত তত দূর যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেক দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখান আলোর অভাব ছিল না। উত্তম দিনের আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মত পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—'এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।' এই মনে করিয়া একটি ছোট গর্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, এ কথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক্ হইবেন না। লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় একজন মিস্ত্রি লাহোরে এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটি জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহও এরূপ একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরি নামক পুস্তকে জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—'আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটি জল-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটি জল-গৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাটীতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পারিষদও ছিল, যাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টি দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটি কামরা, যাহাতে উত্তমরূপ আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় এক বিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারে না। কামরায় দশ-বার জন লোক বসিতে পারে। ইহার ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কার স্বরূপ দুহাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।' এক্ষণে ইতিহাস দ্বারাও গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়।

আমীর পাহাড়ের গর্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিরিগহ্বরে সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীর কান পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুঁড়িয়া উপরে যাইতেছে। ভাবিলেন,—'রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।' যখন পুনরায় সে স্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ ঘর সে ঘর, অর্থাৎ কি না এ গর্ত সে গর্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটি সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেই দিক্ পানে গিয়া দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ

মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিন-বসনা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। এমনি হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন, এখনি দৌড়িয়া গিয়া ধরি, আর বলি,—'প্রিয়তমে! জানি! আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর আসিয়াছি।' কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন,—'ভয় নাই কিসে? এখনও ত আমরা ভূতের হাতে! এখনও ত স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই! স্ত্রীর দেখিতেছি, শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ হয়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একেবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।' এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন, এক একবার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তিও করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন,—'হায়! আমার দশা কি হইল! শয়তানের হাতে পড়িয়া আমার জাতিকুল সকলি মজিতে বসিল। ধর্ম বিনা স্ত্রীলোকের আর পৃথিবীতে আছে কি? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, এক বৎসরকাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না? আমীর! আমীর!! একবার আসিয়া দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে।' আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন,—'ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।' আমীর রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। চক্ষুদ্বয় তখন তাঁহার জলে প্লাবিত ছিল কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তি-বশতই তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশাকণাটুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন,—'চাহিয়া দেখ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।' এই বলিয়া একেবারে স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, স্ত্রীও তাঁহার গলা ধরিলেন। এইভাবে বসিয়া দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—'আর কাঁদিও না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। প্রথম আমাকে বল, ভূত তোমাকে কি করিয়া ধরিয়া আনিল।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, তুমি কি ভিতর হইতে বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তার পর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। অমনি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে, সম্মুখে এক বিকটমূর্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া যাইলাম। তার পর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, নানারূপ আহারীয় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে। আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বিকটমূর্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম। মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে? সেই বিকটমূর্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'সুন্দরি! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার এই সমুদয় ঘরকন্না তোমার। অনুমতি হইলেই এক্ষণেই আমাদের কাজিকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমরা নিকা দিয়া দিবেন।' সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম,—'তুমি কে? স্বামী আমায় তোমাকে কি করিয়া দিলেন?' সে বলিল,—'আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত নই, আমি একজন সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আর এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি

অতি প্রবল-পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান-মর্য্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।' আমি বলিলাম,—'স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন, এ কথা একেবারেই মিথ্যা। তার পর মানবী হইয়া ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে? দেখ, আমরা খোদা-পরস্ত মুসলমান, ভূতপরস্তদিগের মত শয়তানের শাগ্‌রেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে খোদা তোমাকে দণ্ড করিবেন।'

'এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই। প্রথম কয়েক দিন আমি আহার-নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তার পর যখন দেখিলাম যে, আপাততঃ ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনওরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ভূত শাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবিজ আছে। আমিনদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমার উদ্ধার করিবে। ভূত প্রতিদিন আসে আর বলে,—'কেমন, আজ কাজি আনি?' প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমার বড় ভয় হয় না, পূর্ব্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলে, এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। এক দিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয় ত ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটি খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুই পা ঘুরান হইলে, চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তার পর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, 'সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া খাইব।' কি করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি বলিলাম,—'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই খা'ক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইলাম? ভাল চাও ত আমাকে ঘরে রাখিয়া এস।' তখন সে বলিল,—'আচ্ছা! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না, আজ হইতে এক বৎসর কাল তোমাকে কিছু বলিব না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব। মনে করিও না আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়া দিব।' সেই দিন হইতে আর আমাকে বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ী আসে, পরে ঐ বড় গর্তটিতে শুইয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল তিন চার দিন অন্তর একবার আসিয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে,—'কেমন; এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে ত? কাজি আনিব কি?' গতবার আসিয়া বলিল,—'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফর্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব সকলে বলিবে, "লুল্লু না, এ সাহেব ভূত। কোনও লার্ডের ছেলে হইবে।" তখন তুমি বলিবে 'আমার লুল্লু কই? আমার লুল্লু কোথা গেল?' তখন তুমি বলিবে, 'আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি নলপতঃ করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্য-সাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিব। মনে করিব, এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্ব্বস্ব। সকল ভূতেই বলে যে, লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুই জনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ী আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। দু-এক দিনের মধ্যে আবার বোধ হয় আসিবে।'

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহা কি ভূতের মেস্, না মুফলিসের বাড়ী? অর্থাৎ কিনা, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একলা থাকে?' আমীর-রমণী বলিলেন যে,—'এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোনও ভূতকে দেখি নাই। লুল্লু একলা একলা থাকে এই আমার বিশ্বাস।' আমীর বলিলেন,—'এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাততঃ আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা হইলে আমাকে দাও।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'খাবারের এখানে কিছুমাত্র অভাব

নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।' এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাবাব, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন।

অষ্টম অধ্যায় : চণ্ডু-মাহাত্ম্য

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—'কি করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করি।' ধূমপান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন,—'এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তুমি কি বল? লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ আমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধ হয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঘ্যাঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে,—'কৌশল করিয়া স্ত্রীর উদ্ধার করিও।' সে জন্য তুমি একটি কাজ কর। অল্প অল্প লুল্লুকে প্রশ্রয় দাও। দিনকতকাল তাহাকে চণ্ডুর ধূম পান করাও। তার পর কি হয় বুঝা যাইবে। গোকুলের বাঁকা কালাচাঁদের সহিত পরিণয় করিলে রক্ষা আছে, কিন্তু আফিম-কালাচাঁদের সহিত প্রেম করিলে আর রক্ষা নাই। চণ্ডুর পরিণয়ে তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকতকাল কাঁচা আফিম খাইয়া না হয়, কষ্টেশ্রেষ্ঠে কাল কাটাইব।'

আমীর-রমণী বলিলেন,—'এ পরামর্শ মন্দ নয়।'

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান-প্রায় হইল। তখন আমীর-রমণী বলিলেন,—'আর তুমি এখানে থাকিও না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে। ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিও। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি কি করিতে পারি। কিছু খাবার দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।' আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকাল না হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইল। তার পর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল,—'ক্রমে এইবার দুধে-আলতার রং হইয়া আসিতেছে?' তার পর সাজগোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল,—'কি সুন্দরি! দেখিতেছ? দিন দিন কি হইতেছি? দুধে আল্‌তার রং।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'তাই তো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।' ভূত বলিল,—'পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং!' আমীর-রমণী বলিলেন,—'সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।' ভূত বলিল,—'তবে কাজি ডাকি?' আমীর-রমণী বলিলেন,—'কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি না জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুই জনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ, দুই জনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি না। হয় তো কোন্ দিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তার পর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা! আজ পর্য্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।' ভূত বলিল,—'বটে! তা, আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বট, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ। রীতিমত চণ্ডুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে,

আর তোমার গায়ে সে গন্ধ থাকিবে না, মানুষ-মানুষ গন্ধ হইবে।' ভূত বলিল,— 'তা দাও, খাইব।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। কারণ, তোমার প্রতি এখন আমরা নব অনুরাগ বই ত নয়? যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অচেতন হইয়া পড়ে বলিয়া, সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে, শুইয়া খাইতে বাগ হয় বলিয়া খায়।' এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরের এক পার্শ্বে মাটীতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন। কি করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। সে অল্প অল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন,—'এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও। কিছু কি টের পাইতেছ?' ভূত বলিল,—'আর কিছু টের পাইতেছি না, কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমী বমী করিতেছে।' আমীর-রমণী বলিল,—'ঐটুকুই এর আয়েস, একেই নেশা বলে।' ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে যাইল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

নবম অধ্যায় : উদ্ধার

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্বেকার মত কথোপকথনে দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত না হইতে হইতে আপনার গর্তে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকটে থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আর ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন,—'কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিও না; বলিও চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যালয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।' তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন,—'দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম, সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।' এই কথা শুনিয়া ভূতের মন বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্বনাশের কথা সে শুনিল। বিরসবদনে আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পূরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তার পর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্বশরীরে ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকালবেলা খালি নলটি লইয়া প্রদীপের শীসের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে, লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ভীমতালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর সে-নগর, এ-দেশ সে-দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবকারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উড়িতে বা চলিতে পারে না। তখন ভাবিল,—'বৃথা আর ঘুরিয়া কি হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রিয়তমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব! তাহাকে বলিব, 'দেখ, তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া আমি এই প্রাণ বিসর্জন করিলাম।' হয়ত আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে। অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সে দিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিয়াছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল।

সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগামেণ্ট সমস্ত আলগা হইল, শরীরের জয়েন সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক পৃথক হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুল্লু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি করিয়া, আমীর ও আমীর-রমণী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন,—'কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটা কি কখনও শুন নাই? 'থোড়া থোড়া কর্‌কে খাও-মুঝে, ময় লগুঁ কড়ুয়া। আর জরু বেচো, গরু বেচো, মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, 'অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাও; কেন না, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া। স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।' ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল,—'এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস্ তুই আবার কে?' আমীর বলিলেন,—'আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস; তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছি।' ভূত বলিল,—'তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই। বাবা! ওতো জরু নয়! সুখে স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, এ কি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ঐতো আমাকে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে ত দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না পাইলে ত আর বাঁচিব না; সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করিতে হইবে। দুইবেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তাহা করিব, তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।' আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে তাহা প্রকৃত কথা। প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইল; শরীরের অস্থি সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া যোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তার পর আমীর তাহাকে চণ্ডু পান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ-সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল। লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—'মহাশয়! আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনরা ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।' আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুই জনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন। জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশ-পথে উঠিল। তড়িৎবেগে আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লী নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশ গৃহত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটি ঘর নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'লুল্লু! এই ঘরটি তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব। লুল্লু বলিল—'হাঁ, এ জনমে আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ছাড়িবার যোও নাই।' পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। আমীর বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

দশম অধ্যায় : লুচি

যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইলে, লুল্লু ও আমীর দুই জনে এক সঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া চণ্ডু পান করিলেন। এইরূপে ভূতে মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন,—'হে লুল্লু!

হে চণ্ড-সেবক-কুল-তিলক! আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি,—যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জান্, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তার পর সেই ব্রাহ্মণ, যাঁহার মত রোজা এ ধরাধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তার পর আমাদের তাঁতি-ভায়া, যাঁর মত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তার পর সেই কলুর পো, যাঁর মত তৈলনিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে ত বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূততত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঁঘোঁ, আর সেই ভাবিসম্পাদক তৈলপ্রদায়ক গোঁগাঁ! তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা! ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিয়া যদি দুই জনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই।' লুল্লু বলিল,—'আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।' সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্বার আকাশ-পথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঁঘোঁ, গোঁগাঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঁঘোঁর মনোহর নাক-ধারিণী বিশ্ববিমোহিনী সেই ভূতিনীকেও আনিয়া দিল। ভূতিনী অন্তঃপুরে আমীর-পত্নীর নিকট গমন করিলেন। পুরুষ মানুষ ও পুরুষ-ভূত সকলে বহির্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন,—'মহোদয়গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরীবখানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটি বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা করুন। বড় ইচ্ছা, নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ-কার্য্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগাঁ যে ঘ্যাঁঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, নাকেশ্বরীর মাসীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁগাঁও এ কথা এখন স্বীকার করিতেছে। নাকেশ্বরীর মাসী বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছেন, এখন আপনাদিগের কি মত?' সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'তথাস্তু, শুভকার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।' তখন আমীর,—লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীরের আদেশ পালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়?' লুল্লু উত্তর করিল,—'মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।' আমীর বলিলেন,—'তবে আর তত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।'

নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান-ভোজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলে, আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় আয়োজন হইলে, মহাসমারোহে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁর বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণটি পুরোহিত হইলেন। বিবাহের মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য, কিন্তু একটি দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ওঁ আং করিয়া কোনও রকমে সে রাত্রির কার্য্য

সারিলেন। পূর্ণযৌবনী ভূতকামিনী ঘ্যাঁঘোঁপত্নীর রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমন অনিমিষনয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। যিনি যত দেখেন, দেখিয়া পিপাসা হৃদয়ে তাঁহার ততই প্রজ্জ্বলিত হইল। বরকে সকলে বলিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ! তুমি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ! যে, এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে।' ঘ্যাঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বর কি না? অধিক কথা ত আর কহিতে পারেন না? তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই— 'আমি পূর্বেই না বলিয়াছিলাম, ও রূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে?' নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপে সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সভাস্থলেই বাসর-ঘর হইল। বাসর-ঘরে গান গাইবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখভঙ্গীমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তুলা দিয়া সকলেই কান একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূত-ভূতিনীরা দলে দলে কতই যে নাচিল তাহা আর কি বলিব! প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে মজলিস ভাঙ্গিল। তখন লুল্লু,—জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায় : লেখকদল! সাবধান!

ভূত ও ভূতিনী সকল বিদায় হইবার পূর্বে, আমীরকে তাহার বলিল,—'মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোনও বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি ত বলুন, আমরা বড়ই সুখী হইব।' আমীর বলিলেন,—'আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের রাজার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একেবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।' ভূতেরা বলিল,— 'যে আজ্ঞে, আমরা এইক্ষণেই করিতেছি।' এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্তে ভূমির নিকট যাইল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্বের মত উর্বর ও ফলশালী হইল। তখন তাহারা আমীরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগাঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন তাহাকে বলিলেন,—'গোঁগাঁ! তুমি যাইও না। তোমার অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যেহেতু আফিম অতি অপূর্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায়, সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া বিষ-জনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডু পান করিতে অভ্যাস কর।' গোঁগাঁ তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্যমান্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তির প্রভাবে তাঁহার বিকৃতি আকার ক্রমে সুকৃতি হইয়া উঠিল। নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য ভব্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ-ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও, লুল্লু তাঁহাকে গাড়ী করিতে দেন নাই। তাঁহার যেখানে যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে লইয়া যাইতেন। তাহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী

কতবার বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। লুল্লুকে সর্বদা এখানে সেখানে যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন। কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুইখানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া অনেক দূর যাইলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন,—'তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটি ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখাইয়া আনিতেছি।' এই প্রকারে তিনি আমীর-রমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

ধন্য লুল্লু

কিছুদিন পরে, গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলে, আমীর তাহাকে বলিলেন,—'গোঁগাঁ! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।' যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীর আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র-আফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব! তাই বলি, লেখক দল! সাবধান!

নয়নচাঁদের ব্যবসা

প্রথম পর্ব : আঠারো

নয়নচাঁদের বাড়ী ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নয়ান! আজকাল তোমার কিছু সুখ সাওয়াল দেখিতেছি। চিনি জলে আর সে তোমার যোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চা'ট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ না কি?'

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—'সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।'

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই স্বরে বলিলেন,—'আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?'

গগন বলিলেন,—'ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড় খারাপ হইয়া গিয়াছে।'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'চট কেন ভাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভাল। আজকাল আমার হইল ধর্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না। আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।'

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ কথাটি শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়ই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—'আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, কৃস্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকী রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?'

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—'আর কি বাকী আছে? বাকী আর কিছুই নাই। সে যে ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতর পর্য্যন্ত বলিল, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল; 'তা নয়ান! তুমি সতর ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকী আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃস্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতর আঠারোর মানে কি?'

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—'এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি ত যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুড়িয়া সেই ব্রাহ্মণদেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্‌মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ! বড়ই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ও-দিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্মা মূর্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুরপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে?' এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের, চোদ্দ, পনর, ষোল, সতর।—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতর বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকি রইল কি? যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যেদিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃস্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।'

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,—'না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি, যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।'

দ্বিতীয় পর্ব : কপাৎ

নয়ন বলিলেন,—'মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব, তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে মনের মিল রহিল কোথায়?'

সকলে বলিলেন,—'ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।'

নয়ন বলিলেন,—'আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত আর হাবড় হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।'

সকলেই বলিলেন,—'ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটীর চাল-কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকী সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।'

নয়ন বলিলেন,—'আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।'

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটীতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটীতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—'হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।'

নয়ন পুনরায় বলিলেন,—'কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটি বাকী রাখিয়াছি। সে দেবতাটি, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ, সম্পত্তি, আর আমার ঐশ্বর্য্য। সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!'

সকলেই বলিলেন,—'সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!'

নয়ন বলিলেন,—'এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মাণিকপীর নয়! এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্য্যন্ত মা'র নাম বাহির হইয়াছে। মা'র বরে আমার সব।'

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটী দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন, এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিয়া হইল, ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে ঘোলা ফেলিয়া, সেই ঘোলাটি চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল, ভাই?'

নয়ন বলিলেন,—'হাঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ান এই চুপ!'

এই কথা বলিয়া নয়ন 'কপাৎ' করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব : এই কিল তো এই কিল!

নয়ন বলিতেছেন,—'এবার আমার বড়ই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয়, কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটীর একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্ত রোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙ্গিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়ীওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তাই তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,—'মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।'

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজকার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন।

সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুনহুর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি, শুন—

শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো অ্যাণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই।।
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল।।
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি।।
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল।।
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই।।
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত।।
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ।।
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল।।
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই।।
শীতলা বলেন আমি চাল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই।।
চাল পয়সা আনো হবে পূজোর বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার।

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চাল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে,—'নয়ান' হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটি কর।' আমি তাতেও রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নিকে বলিলাম—'গিন্নি! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধোন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?'

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদাচোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে কথা বলা বাহুল্য! সাদা-চোখোদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ, ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বল, বাটি চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচকে কে কবে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা-চোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্যকথা বলিতে শিখিবে না?'

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—'ঠিক বলিয়াছ। সাদা-চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা-চোখোদের ছাঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।'

নয়ন বলিলেন,—'আর বিশ্বাস করিও না এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন্ কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে, সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়-হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্মান্তিক করে। পা'ল-পার্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি। তা নয়! সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে! মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়ীতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! এরে কি ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম বলে? থুঃ! ছি!'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।'

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ব্যাপারখানা কি বল দেখি?'

নয়ন বলিলেন,—'ভাই! এক দিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ী? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়ীতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া, সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—'শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই' আর মিন্‌সে করিল কি জান ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চম্‌কিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পালাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মত আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তার পর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জয়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি, সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।'

চতুর্থ পর্ব : বসিয়া আছে দুইটি ভূত

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিন্‌সে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—'মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

গগন বলিলেন,—'ঈশ। তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সুবলের কি হইয়াছিল?'

গগন বলিলেন,—'দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুরগড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড়, এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিকুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটি বাহির হইয়া পড়িল। তার পর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গোলের

জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জনের সময় ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত যোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না, মা! মান চাই না মা! চাই না পুত্তুর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই বেরিয়েছে গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর।।

নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চাল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি যোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?'

নয়ন বলিলেন,—'হাঁ ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! য শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তার চিঠি! ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোনও ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—'যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?'

আমি বলিলাম,—'তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুণে-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-ই-না ছাই। এঁটেল মাটী দিয়া আর একটি শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটী দিয়া গড়িতে পারিব না!'

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপ্ রে বলিতে এখনও সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরেব ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!'

লম্বোদর বলিলেন,—'মাইরি?'

নয়ন বলিলেন,—'মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।'

সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটীতে পুতিয়া গেল! টাকরা পর্য্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্ব হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই জনের মধ্যে যিনি কর্তা-ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে, ভাবিব চিন্তিব? সুড় সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের এক পাশে বসিলাম।

কর্তা ভূত বলিলেন,—'আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিস্তির জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আর বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটি ফিরিয়া লও, যে আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।'

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দু পয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।'

কর্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?'

'ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,— 'আজ্ঞে হাঁ, শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।'

কর্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—'না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।'

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—'নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছ করিলে? বুকের পাটা তো কম নয়?'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না! কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড়-সুড় করিতেছে; এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশ-পিশ করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোনও বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভাল-মানুষ ভূত। সেই কর্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য্য কাহিনী শুন।'

পঞ্চম পর্ব : কর্তা-ভূত বলিতেছেন

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভাল এঁটেল মাটী, ভাল সিন্দুর, ভাল রাঙ্গতা দিয়া গড়া। বেলে মাটী নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙ্গতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্তি, দেখিলেই প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম! গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির জা! আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ: সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম-সার হইয়াছিল। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তপোষের উপর, কখনও তক্তপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল

চারি জন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করি? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটী মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের সান-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিন জন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,—'খুব মজার লোক তো তুমি! এত লোককে আমরা লইয়া যাই, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজকাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাহাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাহাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাহাদের দুই গালে দুই থাপর মারে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?'

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কিসের জন্য? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।'

যমদূত বলিলেন,—'ওঃ! বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—'তোমাদের পাড়ার নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?'

আমি বলিলাম,—'জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি মরিয়া ভূত হইয়াছেন।'

যমদূত বলিলেন,—'হাঁ। তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।'

আমি বলিলাম,—'এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির!'

যমদূত বলিলেন,—'হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার— সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছিল, বলিবেন?'

যমদূত বলিলেন,—'বলিব না কেন, বলিব। তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।'

ষষ্ঠ পর্ব · নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—''নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আগুট পাতা রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কা'ল এই আগুট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্মে, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে আসিলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল! সেই ঘরের ভিতর, সেই রাত্রিতে বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল! অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন

তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জর জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে, —'হায় রে! যদি আমার নেই আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত?' যমের কাণে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মাগি কি বলিতেছে?' আমরা বলিলাম,—'বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমার একপ সাজা করিত।' যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—'নিয়ে আয় তো রে, ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি, কি করিয়া সে আপনার বোন্‌কে বাঁচায়?' নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম,—'চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার কি সময় হইয়াছে?' আমরা বলিলাম;—'না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া আসিবেন।' নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, —'কথাটা কি? শুনিতে পাই না?' যমের বাড়ী গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম, নেই আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—'বটে। আচ্ছা, চল যাই।' পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—'দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।' আবার খানিক দূর গিয়া,— 'এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।' আবার খানিক দূর গিয়া 'সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।' এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন! যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—'নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোর বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়েছি। কি করিয়া বোন্‌কে বাঁচাইবি, বাঁচা।' নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—'আমার পুণ্যের অর্দ্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।' নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতাপত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—'শুন্‌লি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোন্‌কে তার আবার ভাগ দিবি কি?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—'পুণ্য আছে কি না আছে, আপনরা এই সমুদয় দূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন!' যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—'হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে, এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।' যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?' নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—'আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিয়াছিলেন?' যম বলিলেন,—'মানস করিয়াছিল।' নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—'তবে?'' যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনি করিয়া তিনি বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল, তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব : এঁড়ে গরু

কর্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন. —যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা-পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াসী। পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতা-পত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মত মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্বে এক জন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণের ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—'কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও। তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?'

আমি উত্তর করিলাম,—'মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইনকানুন, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তার পর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।'

যম উত্তর করিলেন,—'সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সে জন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূত তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াসী দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চীৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্বে সেই যে মর মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহাকে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।'

আমি বলিলাম,—'পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।'

যম আজ্ঞা করিলেন,—'ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গরুটা আন্‌তো!'

এঁড়ে গরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না। যমপুরীতে অনেক খোল ভুষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্য্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্য্যয় দুই সিং! দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটী চষিয়া ফেলিতেছেন। কারে ঘুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ি ধরিয়া চারি জন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—'মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে!'

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সিং নীচে করিয়া, এঁড়ে গরু আসিয়া আমার নিকটা দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেমন হে এঁড়ে গরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?'

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—'আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।'

আমি বলিলাম,—'এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটি সিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে বন বন্ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।'

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—'বাহবা! বাহবা! মিত্তির-জা! তুমি এক জন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তিরজা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তিরজা-ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তিরজা-ভূত কি বলিতেছেন, তাহা শুন।'

মিত্তিরজা-ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তার পর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গরু না-ছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পালান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব : মিত্তিরজার পুণ্য!

কর্তা-ভূত বলিতেছেন,—''যমপুরীর ভিতর কোনও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্তঘূর্ণিত নয়নে এঁড়ে গরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মালোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু। পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। সেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদ্ঘর্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিংএ লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—'এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মনুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকীর হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই সেই মানুষটির কাছে যাই।'

যম বলিলেন,—'দ্বারে সেই এঁড়ে গরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।'

নারায়ণ বলিলেন,—'তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।'

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে

চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গরু বলিল,—'মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।'

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—'এঁড়ে গরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?'

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—'মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন, না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।'

নারায়ণ বলিলেন,—'তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল, মিত্তির-জার কাছে যাই।' "

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—'আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত-শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,—'যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাশ কর।'

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাশ পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পূতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপিগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্ত-পদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া যোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—'ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দয় যম আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।'

সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে পাপিগণ এইরূপে আমার স্তবস্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তার পর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?'

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'না মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার না করে।'

এঁড়ে গরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্বে যোড়-হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম?'

নারায়ণ বলিলেন,—'ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।''

কি করিবে? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এই বলিয়া মিত্তির-জা-ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব : পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আচ্ছা নয়ান! সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'হাঁ, করিয়াছিলাম! শুনি যে, সেটি নেই আকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্যে আসিবার পূর্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।'

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর কি হইল?'

নয়ন বলিলেন,—'শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হইল। তাহার পর হাযুই-বাজির মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল।'

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর তুমি কি করিলে?'

নয়ন বলিলেন,—'আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কালেজের সেই যারা এম এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকা-কড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটি কমিয়া গেল। সাহেবেরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।'

সকলে মাটীতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—'হে মা কাটি-গঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।'

ডমরু-চরিত

ডমরু-চরিত কথা অমৃত সমান।
স্বয়ং ডমরু ভণে শুনে ভাগ্যবান।

প্রথম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূচনা

ডমরুধর বলিলেন,—'এই যে দুর্গোৎসবটী, এটী তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। কিন্তু এখনকার বাবুদের সে বোধ নাই। বাবুরা এখন হাওয়াখোর হইয়াছেন। দেশে হাওয়া নাই, বিদেশে গমন করিয়া বাবুরা হাওয়া সেবন করেন, আর বাপ-পিতামহের পূজার দালান ছুঁচো-চামচীকাতে অপরিষ্কার করে।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সত্য কথা! সেকালে পূজার সময় লোকে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিত। বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইত। যাহার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজা করিত, গরীব দুঃখীরা অন্ততঃ একশরা খয়ে-মুড়কি ও দুইটা নারিকেল-নাড়ু পাইত।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় পূজা করা এক নূতন ব্যবসা হইয়াছে। একটী প্রতিমা খাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে লোক নিমন্ত্রণ করে, পরে তাহাদের কান মলিয়া প্রণামি আদায় করে। পূজা করিয়া অনেকে দুই পয়সা উপার্জ্জন করে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহাতে আর দোষ কি? পূজার সময় আমি আমার আবাদের প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করি ভক্তিভাবে মায়ের পাদপদ্মে তাহারা যদি কিছু প্রণামি প্রদান করে, তাহাতে আর আপত্তি কি? যাহা হউক, বিলক্ষণ ঠেকিয়া এই দুর্গোৎসবটী আরম্ভ করিয়াছি। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, ভগবতীর আরাধনা করিলে ধন-সম্পদ হয়।

পুরোহিত বলিলেন,—'তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং, তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ। হে দেবী! তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, জনপদে সে পূজিত হয়; তাহার ধন ও যশ হয়, তাহার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে।'

কলিকাতার দক্ষিণে একখানি গ্রামে ডমরুধরের বাস। প্রথম বয়সে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। অনেক কৌশল করিয়া, সাধ্যমতে একটি পয়সাও খরচ না করিয়া তিনি এখন প্রভূত ধনশালী হইয়াছেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে সুন্দরবনের আবাদে তাঁহার এখন বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ডমরুধর এখন পাকা ইমারতে বাস করেন। পূজার পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পর দালানে, যেস্থানে প্রতিমা হইয়াছে, সেই স্থানে গল্পগাছা প্রসঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—'হাঁ! মা আমাকে ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বিপদে পড়িয়া, একান্ত মনে মাকে ডাকিয়া আমি বলিয়াছিলাম, মা! তুমি আমাকে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। তাহা করিলে প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করিব।'

লম্বোদর বলিলেন,—'তুমি তো কেবল তিন বৎসর পূজা করিতেছ। এ তিন বৎসরের ভিতর তোমাকে তো কোনও বিপদে পড়িতে দেখি নাই। বরং তিন বৎসর পূর্বে এই বৃদ্ধবয়সে তুমি নূতন পত্নী লাভ করিয়াছ।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তিন বৎসর পূর্বে আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। তৃতীয় পক্ষ বিবাহের সময় আমি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলাম। গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কেহই সে কথা জানে না। মুখ ফুটিয়া আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট সে কথা আমি প্রকাশ করি নাই। মা জগদম্বা আমাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি লোকের ভক্তি ক্রমে লোপ হইতেছে। কলেরা ম্যালেরিয়া বসন্ত প্লেগ তো আছেই, মায়ের প্রতি ভক্তির অভাবে এখন আবার পুলো রোগ দেখা দিয়াছে, ঘুমন্ত রোগও আসিয়াছে। জগদম্বার প্রতি ভক্তি থাকলে লোকের এ সব বিপদ হয় না।'

পুরোহিত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।।

হে দুর্গে! বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে জীবগণের ভয় তুমি দূর কর। সুস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদের মঙ্গল কর। হে দারিদ্র্যদুঃখহারিণি! সর্বপ্রকার উপকার করিবার নিমিত্ত তুমি ভিন্ন দয়ার্দ্রচিত্তা আর কে আছে?'

লম্বোদর বলিলেন,—'কিন্তু বিপদটা কি? কি বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে?'

ডমরুধর বলিলেন,—'এতদিন পরে সে বিপদের কথা আজ আমি প্রকাশ করিতেছি, শুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি?

ডমরুধর বলিলেন,—'আমার তৃতীয় বিবাহের সময় এ বিপদ ঘটিয়াছিল। আমার বয়স তখন পঁয়ষট্টি বৎসর। এত বয়সে লোক বিবাহ করে না। তবে আমার ছেলে-বেটা মানুষ হইল না। আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। কোথায় সে চলিয়া গেল। সে একটি স্বতন্ত্র গল্প।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'সে গল্প আর একদিন হইবে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহার পর বিবাহ না করিলে গৃহ শূন্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিবাহ করিলেও কি হয়, তা জান তো, লম্বোদর?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'খ্যাচ, খ্যাচ, রাত্রি দিন খ্যাচ খ্যাচ।'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ, তুমি ভুক্তভোগী। ঘটনাচক্রে আমার এই বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। আমডাঙ্গার মাঠে আমার যে বৃহৎ বাগান আছে, সে বৎসর বৈশাখ মাসে সেই বাগানে গিয়া আমি ডাব পাড়াইতেছিলাম। দুই চারি দিন পূর্বে আমার পুরাতন উড়ে মালী দেশে গিয়াছিল, ভাইপোকে তাহার স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে আমাকে কখন দেখে নাই, আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। উদ্ধব ঘোষের জামাতা সেই ছোঁড়ার সহিত সড করিয়া চোর বলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর মারিতে মারিতে কুতবপুরের মহকুমাতে আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু সে আবার একটী স্বতন্ত্র গল্প।'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই বিপদ?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'রাম রাম! এ সামান্য কথা। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর সঙ্কটে আমি পড়িয়াছিলাম। সেই সঙ্কট হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—'কুতবপুরে ঘটকীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পুনরায় বিবাহ করিতে সে আমাকে প্রবৃত্তি দিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। টাকায় কি না হয়? বাঁশপুরে এক বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইল। তিনিই আমার বর্ত্তমান গৃহিণী।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সে কথা আমরা জানি, আমরা বরযাত্র গিয়াছিলাম।'

ডমরুধর বলিলেন,—'কন্যার মাতা পিতা অর্থহীন বটে, কিন্তু আমার নিকট হইতে নগদ টাকা চাহিলেন না। তবে ঘটকী বলিল যে, বিবাহের সমুদয় খরচা আমাকে দিতে হইবে এবং কন্যার শরীরে যেখানে যা ধরে, সেইরূপ অলঙ্কার দিতে হইবে। তোমরা জান যে, আমি কখন একটি পয়সা বাজে খরচা করি না। লোক পাছে অলস হইয়া পড়ে সেই ভয়ে ভিখারীকে কখন মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করি না। সেকরার পেট ভরাইতে প্রথম আমি সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে, গহনার পরিবর্তে কন্যার আঁচলে নোট বাঁধিয়া দিব। কিন্তু কন্যার মাতা পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটীও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে। এইসব কথা ভাবিয়া গহনা দিতে আমি সম্মত হইলাম। যতদূর সাধ্য সাদা-মাটা পেটা সোনার গহনা গড়াইলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার অনেক টাকা খরচ হইল। ফৰ্দ্দ অনেক। একবাক্স গহনা হইল।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'তা বটে। কিন্তু বিপদটা কি?'

ডমরুধর বলিলেন,—'ব্যস্ত হইও না। শুন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : গাছে-ঝোলা সাধু

ডমরুধর বলিলেন,—'গ্রামের প্রান্তভাগে বিন্দী গোয়ালিনীর যে ভিটা আছে, সে জমি আমার। কিছুদিন পূর্বে বিন্দী মরিয়া গিয়াছিল। তাহার চালাঘরখানি তখনও ছিল। দুইজন চেলা সঙ্গে কোথা হইতে এক সাধু আসিয়া সেই চালাঘরে আশ্রয় লইল। সে সাধুকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, তাহাকে সকলেই জান। সাধুর দুইটী চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত তিপ্পান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে, চেলারা তাহার ডালে সাধুর দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম-এ, পাস করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহ পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা গান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল; সেই ধামায় পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।'

লম্বোদর বলিলেন,—'তুমিও সেই হুজুগে দু' পয়সা লাভ করিয়াছিলে!'

ডমরুধর বলিলেন,—"সে জমি আমার, সে চালা আমার, সে আমগাছ আমার; কেন আমি লাভ করিব না? আমি সাধুকে গিয়া বলিলাম,—'ঠাকুর! সন্ন্যাসী মোহান্তের প্রতি আমার যে ভক্তি নাই, তাহা নহে। তবে কি জান, আমি বিষয়ী লোক। তুমি আমার জমিতে আস্তানা গাড়িয়াছ। দু'পয়সা বিলক্ষণ তোমার আমদানি হইতেছে। ভূস্বামীকে ট্যাক্স দিতে হইবে।'

সাধু উত্তর করিলেন,—'আমরা উদাসীন। আমি নিজে বায়ু ভক্ষণ করি। চেলারা এখনও যৎকিঞ্চিৎ আহার করে। দীন দুঃখীকে আমরা কিছু দান করি। কোন পরিব্রাজক আসিলে তাহার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করি। সেজন্য পুণ্যাত্মা ভক্তগণ যাহা প্রদান করে, আমার শিষ্যদ্বয় এ স্থানে খরচের জন্য তাহার অর্দ্ধেক রাখিয়া, অবশিষ্ট ধন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দিয়া আসিবে।" বলা বাহুল্য যে, আহ্লাদসহকারে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কোনওদিন চারি টাকা কোনওদিন পাঁচ টাকা আমার লাভ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। যাহাতে তাহার পসার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটাকে আমি পুষিয়া রাখিব। কিন্তু একটা হুজুগ লইয়া বাঙ্গালী অধিক দিন থাকিতে পারে না। হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙালী পুনরায় নূতন

হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটির গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়। এই সময় এ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে পাঁচগেছে গ্রামে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার স্কন্ধে মাকাল ঠাকুর অধিষ্ঠান হইলেন। রসিক মণ্ডল জাতিতে পোদ। মাকালঠাকুরের ভরে সেই কন্যা লোককে ঔষধ দিতে লাগিল। দেবদত্ত ঔষধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হইতে লাগিল। বোবার কথা ফুটিতে লাগিল। কতকগুলি সুস্থ লোককে কানা খোঁড়া, হাবা, কালা, জোরো অম্বুলে সাজাইতে হয়, তা না করিলে এ কাজে পসার হয় না। তুলসীর মালা গলায় দিয়া সেই ইংরাজী কাগজের লেখকও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া কত কি তাহাদের কাগজে লিখিয়া বসিল। বি-এ, এম-এ, পাস করা ছোঁড়ারা আবার সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া সেই পোদ ছুঁড়ীর পাদক-জল খাইতে গেল। কাতারে কাতারে সেই গ্রামে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। রসিক মণ্ডলের ঘরে টাকা পয়সা আর ধরে না। আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল। রসিক মণ্ডলের মত আমার কেন বুদ্ধি যোগায় নাই, আমি কেন সেইরূপ ফন্দি করি নাই, আমি কেন একটা ছোট ছুঁড়ীকে জাহির করি নাই, সেই আপশোসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপ দুঃখে আছি, এমন সময় একজন চেলা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী বলিল যে, 'নিভৃতে তোমার সহিত কোনও কথা আছে। আমি, সন্ন্যাসী ও তাহার চেলা এক ঘরে যাইলাম।' সন্ন্যাসী বলিল যে, 'ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে জন্য নিশ্চয় তোমার মনে সন্তাপ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখ করিও না, অন্য উপায়ে তোমাকে আমি বিপুল ধনে অধিকারী করিব। একটি টাকা দাও দেখি!'

সন্ন্যাসীর হাতে আমি একটী টাকা দিলাম। সেই টাকাটীকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া দুইটী টাকা সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। তাহার পর সন্ন্যাসীর আদেশে ভিতর হইতে একটী মোহর আনিয়া দিলাম, তাহাও ডবল করিয়া দুইটী মোহর সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। শেষে একখানি দশ টাকার নোটও ডবল করিয়া আমার হাতে দিল।

তাহার পর সন্ন্যাসী আমাকে বলিল,—'এ কাজ অধিক পরিমাণে করিতে গেলে পূজা-পাঠের আবশ্যক। তোমার ঘরে যত টাকা, মোহর, নোট, সোনা রূপা আছে, পূজা-পাঠ করিয়া সমুদয় আমি ডবল করিয়া দিব।'

আমি উত্তর করিলাম,—'সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি নিতান্ত বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটী টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকা-কড়ি গহনা-পত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ী অথবা বাক্সের ভিতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাত দিন কি আট দিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। সাত আট দিন পরে গৃহস্বামী খুলিয়া দেখে যে হাঁড়ী ঢন ঢন। বাজিকরের ও-চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।'

সন্ন্যাসী বলিল,—'পূজা-পাঠ করিয়া আমি চলিযা যাইব না। তোমার ঘরে তুমি আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিও। আর দেখ আমি অন্ধ। কাহারও সহায়তা ভিন্ন দুই পা চলিতে পারি না। পলাইব কি করিয়া? পূজার দিন কোন শিষ্যকে আমি এ স্থানে আসিতে দিব না। সাত আট দিন পরে তোমাকে টাকাকড়ি খুলিয়া দেখিতে বলিব না; পূজা সমাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ তুমি খুলিয়া দেখিবে যে, সমুদয় সম্পত্তি দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে।'

সন্ন্যাসীর এরূপ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। সন্ন্যাসী শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির করিল। পূজা ও হোমের উপকরণের ফর্দ্দ দিল। সে সমুদয় আমি সংগ্রহ করিলাম। বাড়ীর দোতালায় নিভৃত একটী ঘরে পূজার স্থানে লইয়া যাইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি—মোটা দড়ি নয়

নির্দ্ধারিত দিন সন্ধ্যার সময় কেবল সন্ন্যাসী ও আমি সেই ঘরে গিয়া উপবেশন করিলাম। সন্ন্যাসী পাছে কোনওরূপে পলায়ন করে, সেজন্য ঘরের দ্বারে চাকরকে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিতে বলিলাম এবং একটু দূরে তাহাকে সতর্কভাবে

পাহারা দিতে আদেশ করিলাম। সন্ন্যাসী ঘট স্থাপন করিল। দধি, পিঠালি ও সিন্দুর দিয়া ঘটে কি সব অঙ্কন করিল। তাহার পর ফট্ বষট্ খ্রীং ঐং এইরূপ কত কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। অবশেষে হোম করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্বাহা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঘৃত দিয়া সন্ন্যাসী আপনার থলি হাতড়াইয়া একটী টিনের কৌটা বাহির করিল। সেই কৌটাতে এক প্রকার সবুজ রঙের গুঁড়া ছিল। হরিৎ বর্ণের সেই চূর্ণ সন্ন্যাসী আগুনে ফেলিয়া দিল।

ঘর সবুজ বর্ণের ধূমে পরিপূর্ণ হইল। আমার নিদ্রার আবেশ হইল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার সন্ন্যাসী বেটা একটা কাণ্ড করিবে, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার টাকাকড়ি লইয়া কোনওরূপে পলায়ন করিবে। উঠিয়া, দ্বারে ধাক্কা মারিয়া আমার চাকরকে ডাকিব এইরূপ মানস করিলাম। আমি উঠিতে পারিলাম না। আমার হাত-পা অবশ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল। হঠাৎ আমার মাথা হইতে 'আমি' বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার শরীরটী তৎক্ষণাৎ মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। শরীর হইতে যে 'আমি' বাহির হইয়াছি, তাহার দিকে তখন চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে 'আমি' বাহির হইয়াছি, সে 'আমি' অতি ক্ষুদ্র, ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত, আর সে শরীর বায়ু দিয়া গঠিত। সেই ক্ষুদ্রশরীরে আমি উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম। মনে করিলাম যে, ঔষধের ধূমে সন্ন্যাসী আমাকে হত্যা করিয়াছে, মৃত্যুর পর লোকের যে লিঙ্গশরীর থাকে, তাহাই এখন যমের বাড়ী যাইতেছে।

ছাদ ফুঁড়িয়া আমি উপরে উঠিয়া পড়িলাম। সোঁ সোঁ করিয়া আকাশ-পথে চলিলাম। দূর-দূর-দূর—কতদূর উপরে উঠিয়া পড়িলাম, তাহা বলিতে পারি না। মেঘ পার হইয়া যাইলাম, চন্দ্রলোক পার হইয়া যাইলাম, সূর্য্যলোকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম। দেখিলাম যে, আকাশ বুড়ী এক কদম-গাছতলায় বসিয়া, আঁশবঁটি দিয়া সূর্য্যটাকে কুটি কুটি করিয়া কাটিতেছে, আর ছোট ছোট সেই সূর্য্য-খণ্ডগুলি আকাশ-পটে জুড়িয়া দিতেছে। তখন আমি ভাবিলাম,—"ওঃ! নক্ষত্র এই প্রকারে হয় বটে! তবে এই যে নক্ষত্র সব, ইহারা সূর্য্যখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে খণ্ডগুলি বুড়ী আকাশ-পটে ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পারে না, আলগা হইয়া সেইগুলি খসিয়া পড়ে। তখন লোকে বলে,—'নক্ষত্র পাত হইল।' কিছুক্ষণ পরে আমার ভয় হইল যে,—সূর্য্যটা তো গেল, পৃথিবীতে পুনরায় দিন হইবে কি করিয়া? আকাশ-বুড়ী আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—ভোরে ভোরে উঠিয়া আকাশে ঝাড়ু দিয়া সমুদয় নক্ষত্রগুলি আমি একত্র করিব। সেইগুলি জুড়িয়া পুনরায় আস্ত সূর্য্য করিয়া প্রাতঃকালে উদয় হইতে পাঠাইব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আঁশবটি দিয়া সূর্য্য কাটিয়া নক্ষত্র করি, সকালবেলা আবার সেইগুলি জুড়িয়া আস্ত সূর্য্য প্রস্তুত করি। আমার এই কাজ।"

আকাশ-বুড়ীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া, আমি ভাবিলাম যে, নভোমণ্ডলের সমুদয় ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে সোঁ সোঁ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! কিছুদূর গিয়া দেখি যে, দুইটা বিকটাকার যমদূত আমার মত আর একটা সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া যাইতেছে। আমার বড় ভয় হইল। সে স্থানে মেঘ নাই যে, তাহার ভিতর লুকাইব। পলাইবার সময় পাইলাম না। খপ করিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই বেটা কে রে? সত্য যুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন বেওয়ারিশ হইয়া আর কাহারও এখানে বেড়াইবার হুকুম নাই। নিশ্চয় তুমি বেটা কুম্ভিপাক অথবা রৌরব নরকের ফেরারি আসামী।' এই বলিয়া তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল।

ক্রমে আমরা যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যম দরবার করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে স্তূপাকার খাতাপত্রের সহিত চিত্রগুপ্ত, সম্মুখে ডাঙ্গস হাতে ভীষণমূর্ত্তি যমদূতের পাল। আমাদের দুইজনকে যমদূতেরা সেই রাজসভায় হাজির করিল। প্রথমে অপর লোকটীর বিচার আরম্ভ হইল।

চিত্রগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম?'

সে উত্তর করিল,—'আমার নাম বৃন্দাবন গুঁই।'

তাহার পর কোথায় নিবাস, কি জাতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া খাতা-পত্র দেখিয়া যমকে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—'মহাশয়! এ লোকটী অতি ধার্মিক, অতি পুণ্যবান্। পৃথিবীতে বসিয়া এ বার মাসে তের পার্বণ করিত, দীন-দুঃখীর

প্রতি সর্বদা দয়া করিত, সত্য ও পরোপকার ইহার ব্রত ছিল।'

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—'চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে দোষ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন,—

গো-মেষাশ্ব-মহিষক-গোধাজোষ্ট্র-মৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্।।

গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গোধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস—এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস বলে। এই সকল মাংসই দেবতাদিগের প্রীতিদায়ক। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে' অথবা 'ওঁ ব্রহ্মাপণমস্তু' এই মন্ত্রে সংশোধন করিয়া লইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও এই সমুদয় মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। মৃগমাংসের ভিতর শূকরের মাংসও ধরিয়া লইতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাতে কলামাংস বলে, শিব তাহা খাইতেও অনুমতি দিয়াছেন। আর দেখ, চিত্রগুপ্ত! তুমি এ কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দাও। পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরেজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি যে, চিত্রগুপ্ত! তুমিও ইংরেজী পড়। ইংরেজী পড়িয়া তোমার হেড গরম কর। হেড গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্মা' নাম গ্রহণ কর।"

এই কথা বলিয়া যম নিজে সেই লোকটীকে জেরা করিতে লাগিলেন,—'কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?'

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞা না।'

যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিলাতি পাণি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?'

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞা না।'

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্য করিয়া বল, কোনওরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?'

সে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল,—'আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।'

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে! এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর্। ইহার পূর্ব পুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগকেও সেই নরকে নিক্ষেপ্ কর্। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্তও সেই নরকে যাইবে। চিত্রগুপ্ত! আমার এই আদেশ তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ।'

যমের এই বিচার দেখিয়া আমি তো অবাক। এইবার আমার বিচার। কিন্তু আমার বিচার আরম্ভ হইতে না হইতে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—'মহারাজ! আমি কখনও একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।'

আমার কথায় যম চমৎকৃত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন,—'সাধু সাধু! এই লোকটী একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু, সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন.—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত কোকিল-কুহরিত, অপ্সরাপদ-নূপুর-ঝুনঝুনিত হীরা-মাণিক-খচিত নূতন একটী স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।'

চিত্রগুপ্তের—ওঁ থুরি! চিত্রবর্মার হিংসা হইল। তিনি বলিলেন,—'মহাশয়! পৃথিবীতে লোকটীর এখনও আয়ু শেষ হয় না। স্থূল দেহের রক্তমাংসের আঁষটে গন্ধ এখনও ইহার সূক্ষ্ম শরীরে রহিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া আগুন হইলেন। আমার আদর লোপ হইল। তিনি বলিলেন,—'কি! সাদা সাদা গোল গোল হাঁসের ডিমের গন্ধ গায়ে! মার, ইহার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস মার।'

যম বলিবামাত্র তাঁহার একজন দূত আমার মাথায় এক ঘা ডাঙ্গস মারিল। বলিব কি হে, মাথায় আমার যেন ঠিক বজ্রাঘাত হইল। যাতনায় ত্রাহি মধুসূদন বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সেই এক ঘা ডাঙ্গসে যমপুরী হইতে আকাশপথে অনেক নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। দমাস করিয়া আর এক ডাঙ্গসের ঘা' শূন্যপথে আরও নীচে আসিয়া পড়িলাম। আর এক ঘা! আরও নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। এইরূপ দশম আঘাতে পৃথিবীতে আসিয়া আমার বাড়ীর ছাদ ফুঁড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় সেই পূজার ঘরে আসিয়া পড়িল।

নিজের বাড়ীতে সেই পূজার ঘরে আসিয়া ক্ষুদ্র মাথায় ক্ষুদ্র হাত বুলাইতে লাগিলাম। প্রহারের চোটে চক্ষুতে সরিষা-ফুল দেখিতেছিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি যে, ' আমি ' বসিয়া আছি। অর্থাৎ আমার সেই বড় শরীর আসনে বসিয়া আছে, আর সন্ন্যাসীর শরীর মাটীতে পড়িয়া আছে। কি হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, যে সবুজ গুঁড়ার ধূম দিয়া আমার শরীর হইতে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আর সকল কোষ বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী আপনার সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা আমার স্থূল অন্নময় কোষ অধিকার করিয়াছে। আমার শরীর বটে, কিন্তু ঐ যে আসনে বসিয়া আছে, ও আমি নই, ও সন্ন্যাসী। সূক্ষ্ম শরীরে মুখ দিয়া আমি সন্ন্যাসীব সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না! সেজন্য নিরুপায় হইয়া আমি সন্ন্যাসীর দেহে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের তপস্যা

সন্ন্যাসীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহার পর ক্রোধে আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—'ভণ্ড! আমার শরীর ছাড়িয়া নিজের শরীরে পুনরায় প্রবেশ কর্।'

সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—'এ পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলাম। ভোগ-বাসনা এখনও আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই। মানস করিয়াছিলাম যে, কোন যুবা ধনবান লোকের শরীর আশ্রয় করিব। সেরূপ লোকের যোগাড় করিতে পারি নাই। কাজেই তোমার জীর্ণ শরীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার এই শরীর দ্বারা এখন সুখাদ্য ভক্ষণ করিব, নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিব। তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছে। তোমার শরীরে আমি বিবাহ করিব। তোমার গৃহিণীকে লইয়া ঘরকন্না করিব। মিছামিছি তুমি গোল করিও না। লোকের নিজের যেরূপ অধ্যাস হয় অর্থাৎ শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, অন্য লোকেরও সেইরূপ হয়। তোমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই ডমরুধর; আমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই সন্ন্যাসী। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, আমার আত্মা তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও তোমার আত্মা আমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ও হস্তামলকের গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ তাই হইয়াছে! শরীর ভাগ কেবল একটু হের ফের।'

ক্রোধে অধীর হইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমি সন্ন্যাসীর গলা টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তখন আমি পাঁচ শত তিপ্পান্ন বৎসরের পুরাতন সন্ন্যাসীর শরীরে ছিলাম। তাহার উপর আবার দুই চক্ষু অন্ধ। সন্ন্যাসীর আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। হাসিয়া সে দূরে আমাকে ফেলিয়া দিল।

আমার দেহধারী সন্ন্যাসী পুনরায় বলিল,—'যদি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তোমার চাকরের দ্বারাই তোমাকে আমি এই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। ঐ অন্ধ ও বৃদ্ধ শরীর লইয়া তখন তুমি কি করিয়া দিন যাপন করিবে? আমার শিষ্যদ্বয় এ ব্যাপার অবগত আছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তাহাদের সহিত আস্তে আস্তে আমার আস্তানায় গমন কর। প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল তাহারা তোমাকে নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলাইবে। সমস্ত দিন তুমি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ঘোর রাত্রিতে চুপি চুপি আহার করিবে। যতদিন তোমার ঐ বর্তমান শরীর জীবিত থাকে, তত দিন তোমাকে আমি খাইতে দিব।'

আর উপায় কি? আমি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর দুই জন চেলা আসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধ দুইটা চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিন্দী গোয়ালিনীর চালা ঘরে তাহারা আমাকে লইয়া গেল। সে রাত্রি মাটির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যূষে চেলা দুই জন আমার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া দিল। এক ঘণ্টাকাল অধোমুখে আমি ঝুলিতে লাগিলাম। সে যে কি যাতনা, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব। অন্ধ, তা না হইলে চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণও কাল ছিল, তা না হইলে মুখ লাল হইয়া যাইত। ঘোর কষ্ট! ঘোর কষ্ট! কেন যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাই নাই, তাহাই আশ্চর্য্য।

লম্বোদর প্রভৃতি একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—'ঈশ্! তুমি ত সামান্য বিপদে পড় নাই!'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ! আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। কেবল মা দুর্গার কৃপায় আমি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম!'

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'এক ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইল। তাহার পর সমস্ত দিন তাহারা আমাকে জলটুকু পর্য্যন্ত খাইতে দিল না। তাহারা কিন্তু একে একে আমার বাড়ীতে গিয়া আহার করিয়া আসিল। আসিয়া বলিল যে,—'ডমরু বাবুর বাড়ীতে আজ খুব ঘটা। পাঁচ ছয়টা খাসি কাটা হইয়াছে। নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রামশুদ্ধকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সকলকে ভোজন করাইবেন।'

লম্বোদর বলিলেন,—''হাঁ! সেই সময় দিনকত তোমার বাড়ীতে খুব ধুম হইয়াছিল। প্রতিদিন ষোড়শ উপাচারে তোমার বাড়ীতে আমরা ভোজন করিয়াছিলাম। তখন তোমার সেই শরীরটীকে 'তুমি' বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। সহসা তোমার মতিগতির কিরূপে পরিবর্তন হইল, তাহা ভাবিয়া সকলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তোমার কেনারাম চাকর ও চেলা দুই জন বলিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার সমুদয় সম্পত্তি ডবল করিয়া দিয়াছিলেন, সেই আহ্লাদে তুমি মুক্ত হস্ত হইয়াছ। কেহ কেহ বলিল যে, নূতন বিবাহের আমোদে আটখানা হইয়া তুমি এত টাকা খরচ করিতেছ। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে. সে তুমি নও, তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসী।''

ডমরুধর বলিলেন,—''আমি বৃথা টাকা খরচ করিব? আমি সে পাত্র নই। আমি সাজিয়া সন্ন্যাসী বেটা আমার সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোর রাত্রিতে এক জন চেলা আমার জন্য খাবার লইয়া আসিল। পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, বেদানা, অঙ্গুর, সেব প্রভৃতি সামগ্রী! ঈষৎ হাসিয়া চেলা বলিল,—'আপনার প্রতি ডমরু বাবুর বড় ভক্তি! উঠুন, আহার করুন।' কিন্তু ছাই আমি আর খাইব কি! আমার সর্বনাশ করিয়া সেই সমুদয় সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল।''

পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় আমাকে তাহারা গাছে ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর সমস্ত দিন অনশনে রাখিয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে খাবার দিল। প্রতিদিন এই ভাবে চলিতে লাগিল। ওদিকে আমার নিজ বাটীতে ধুমধামের সীমা-পরিসীমা নাই। প্রতি দিন যজ্ঞ। দিনের বেলা সাধারণ লোকের ভোজন, রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের ফিষ্টি। শুনিলাম, ঐ ফিষ্টিতে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধবের সহিত কিছু উচ্চরকমের স্ফূর্তি করিতেছিল। সেরি শ্যাম্পেন প্রভৃতি বহুমূল্য মদ চলিতেছিল। কেবল আমার টাকার শ্রাদ্ধ!

ক্রমে শ্রাবণ মাস আসিল। আমার বিবাহের জন্য যে শুভদিন স্থির হইয়াছিল, সেই দিন নিকটবর্তী হইল। যে শরীরে আমি অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা অন্ধ বটে, কিন্তু কান তো অন্ধ ছিল না; কয়দিন আগে থাকিতে রোশনচৌকির বাজনা আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার পর বিবাহের পূর্ব দিনে ইংরাজি বাজনা, দেশী বাজনা, ঢাক ঢোল সানাইয়ের রোলে ও লোকের কোলাহলে আমার কান ছেঁদা হইয়া গেল। শুনিলাম যে ' ডমরুবাবু ' মহাসমারোহের সহিত বিবাহ করিতে যাইবেন।

পাছে কোনও যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে বেওয়ারিস আসামী বলিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, পাছে

পুনরায় আমার মাথায় ডাঙ্গস মারে, সেই ভয়ে এত দিন সন্ন্যাসীর শরীর হইতে আমার সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু একে আমার টাকার শ্রাদ্ধ, তাহার উপর সন্ন্যাসী আমার শরীরে আমার জন্য মনোনীত কন্যাকে গিয়া বিবাহ করিবে, এই দুঃখে মনের ভিতর আমার দাবানল জ্বলিতে লাগিল। সে দিন চেলা দুই জন যখন গাছ হইতে আমাকে নামাইয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসীর শরীর হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কৃতকার্য্য হইলাম. সন্ন্যাসীর শরীর অন্ধ, কিন্তু আমার লিঙ্গ শরীর অন্ধ নহে। অনেক দিন পরে পৃথিবীর বস্তুসমূহ দেখিয়া মনে আমার আনন্দ হইল। সন্ন্যাসীর দেহ বিন্দীর চালা ঘরে ফেলিয়া সূক্ষ্ম শরীরে আমি আমার নিজের বাটীতে গমন করিলাম। সে স্থানের ঘোর ঘটা দেখিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৃহটী সুসজ্জিত হইয়াছে, কোনও স্থানে বাজনাওয়ালারা বসিয়া আছে, কোনও স্থানে রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে, বরযাত্রিদিগের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ফাষ্টোকেলাস গাড়ি আসিয়াছে; বরের জন্য চারি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে কন্যার গ্রাম সাত ক্রোশ। পথ ভাল নহে—মেটে রাস্তা, কিন্তু শুনিলাম যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া 'ডমরু বাবু' সে রাস্তা মেরামত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ছাল ছাড়ান বাঘ

এইরূপে চারিদিকে আমি দেখিয়া বেড়াইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সূক্ষ্মশরীর অতি ক্ষুদ্র, হাওয়া দিয়া গঠিত, সূক্ষ্মশরীর কেহ দেখিতে পায় না। একে যমদূতের ভয়, তাহার উপর আবার এই সমুদয় হৃদয়বিদারক দৃশ্য! সে স্থানে আমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম,—'দূর কর! বনে গিয়া বসিয়া থাকি। সুন্দর বনে মনুষ্যের অধিক বাস নাই, যমদূতদিগের সে দিকে বড় যাতায়াত নাই, সেই সুন্দরবনে গিয়া বসিয়া থাকি।'

বায়ুবেগে সুন্দরবনের দিকে চলিলাম। প্রথম আমি আমার আবাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার কোনও কর্মচারীকে দেখিতে পাইলাম না। কেহ মাছ, কেহ ঘৃত, কেহ মধু, কেহ পাঁঠা লইয়া তাহারা 'আমার' বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে আমি গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, এক গাঙের ধারে একখানি নৌকা লাগিয়া আছে, উপরে পাঁচ ছয়জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে; তাহাদের সঙ্গে মুগুর হাতে একজন ফকীর আছে। মন্ত্র পড়িয়া ফকীর বাঘদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্ভয়ে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতেছে; সেই স্থানে গিয়া আমি একটি শুষ্ক কাঠের উপর উপবেশন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

এই স্থানে বসিয়া মনের বেদনায় আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। না এদিক, না ওদিক্, না মরা, না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ 'আমি' সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসর-ঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আর আমার প্রাণে সয় না। হায় হায়! আমার সব গেল! হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা! তুমি জগতের মা! তোমার এই অভাগা পুত্রের প্রতি তুমি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে দেবতাদিগকে তুমি পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সন্ন্যাসীর হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখনও পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোনও দেবতার পূজা করি নাই; কিন্তু এখন হইতে, মা প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব। অকালে তোমার পূজা করিয়া রামচন্দ্র বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমিও মা! সেইরূপ অকালে তোমার পূজা করিব। তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নবপ্রসূত গোবৎস বিক্রয় করেন, কসাই যখন শিশু বৎসের গলায় দড়ি দিয়া হিচড়াইয়া লইয়া যায়, তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতরকণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জগদম্বার মহিমা কে জানে! প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কৃপা করেন। জগদম্বা আমার প্রতি কৃপা করিলেন। বন হইতে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া কাঠুরিয়াদিগের মাঝখানে পড়িল। সুন্দরবনের মানুষখেগো প্রকাণ্ড

ব্যাঘ্র! শরীরটী হরিদ্রাবর্ণের লোমে আচ্ছাদিত, তাহার উপর কাল কাল ডোরা। এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুল্ বাঘ নয়, এ বাবা, টাইগার! ইংরাজিতে যাহাকে রয়াল টাইগার বলে, এ সেই আসল রয়াল টাইগার!

এক চাপড়ে একজন কাঠুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী করিল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধরিতে পারিল না। সেই স্থানে শুইয়া থাবা দিয়া মানুষটাকে পিঠে তুলিতে চেষ্টা করিল। না মোটা না সরু নিকটে একটা গাছ ছিল। বাঘের দীর্ঘ লাঙ্গুলটী সেই গাছের পাশে পড়িয়াছিল। একজন কাঠুরিয়ার একবার উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বাঘের লাঙ্গুলটী লইয়া সে সেই গাছে এক পাক দিয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল।

বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—'মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়া হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন। তোমাদের একি নূতন কাণ্ড!' পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। একবার, দুইবার, তিনবার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটী বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটী সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতায় হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীয়ন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্ম্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল। মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।

ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ ঘোরতর বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাঘের লাঙ্গুল লইয়া গাছে যে পাক দিয়াছিল, লেজ ফেলিয়া সেও সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্র চর্ম্মের ভিতর আার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবামাত্র ছালটা সজীব হইল। গা ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাছ হইতে লাঙ্গুলটী সরাইয়া লইলাম। পাছে ফের পাক দেয়! তাহার পর দুই একবার আস্ফালন করিলাম। পূর্বে তো অবাক হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন দশগুণ অবাক হইয়া ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া দ্রুতবেগে ভাটার স্রোতে তাহারা পলায়ন করিল।

এখন এই নূতন শরীরের প্রতি একবার আমি চাহিয়া দেখিলাম। এখন আমি সুন্দরবনের কেঁদোবাঘ হইয়াছি— সেই যারে বলে রয়াল টাইগার। ভাবিলাম যে,—এ মন্দ কথা নয়, এখন যাই, এই শরীরে বিবাহ-আসরে গিয়া উপস্থিত হই। এখন দেখি, সন্ন্যাসী বেটা কেমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি দৌড়িলাম। কখনও নিবিড় বনের ভিতর দিয়া চলিলাম, কখনও লোকের আবাদের ধার দিয়া চলিলাম। সাঁতার দিয়া অথবা লম্ফ দিয়া শত শত নদী-নালা পার হইলাম। যে গ্রামে কন্যার বাড়ী, সন্ধ্যার সময় তাহার এক ক্রোশ দূরে গিয়া পৌঁছিলাম। দূর হইতে আলো দেখিয়া ও বাজনা-বাদ্যের শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, ঐ বর আসিতেছে। সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। আলুম করিয়া এক লাফ দিয়া প্রথম বাদ্যকরদিগের ভিতর পড়িলাম, কালো কালো বিলাতী সাহেবেরা কোট-পেন্টু পিঁধে যাহারা বিলাতী বাজা বাজাইতেছিল, তাহারা আমার সেই মেঘগর্জনের ন্যায় আলুম শব্দ শুনিয়া আর আমার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আপন আপন যন্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ঢাকী ঢুলীদের ত কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ কেহ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও সকলে পলায়ন করিল। ঢাকী ঢুলীদের ত কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ কেহ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও সকলে পলায়ন করিল। তাহার পর পুনরায় আলুম করিয়া আমি বরযাত্রদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। টপ টপ করিয়া তাহারা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল ও যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

লম্বোদর বলিলেন,—'আমিও বরযাত্র গিয়াছিলাম। আমি একটি গাছে গিয়া উঠিয়াছিলাম।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষে কেলেহাঁড়ী মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি একটা পুষ্করিণীতে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের গলায় কফ

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহার পর লম্ফ দিয়া একেবারে আমি বরের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ঘোর ত্রাসে সন্ন্যাসীর হৃৎকম্প হইল। আমার শরীর হইতে ফট করিয়া সে সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিল। আপনার সূক্ষ্ম শরীর লইয়া কোথায় যে সে পলায়ন করিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে তাহাকে অথবা তাহার চেলা দুইজনকে আর কখন আমি দেখি নাই। বিন্দীর চালায় তাহার দেহটীও আমি দেখিতে পাই নাই।

আমি দেখিলাম যে, গাড়ীর উপর আমার দেহটী পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘ ছাল হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ আমি নিজদেহে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর গদিতে বাঘছালখানি পাতিয়া তাহার উপর আমি গঠ হইয়া বসিলাম। নিজের শরীর পুনরায় পাইয়া আনন্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। কন্যার জন্য যে সমুদয় গহনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সম্মুখে দেখিলাম যে সেই গহনার বাক্সটী রহিয়াছে। পরে শুনিলাম যে, ঘটকীর পরামর্শে সন্ন্যাসী এই গহনার বাক্স সঙ্গে আনিয়াছিল।

এখন বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। একেলা বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে পারি না। গাড়ী হইতে নামিলাম। পথ হইতে একটী ঢোল লইয়া নিজেই ঢ্যাং ঢ্যাং করিয়া বাজাইতে লাগিলাম। যে তিন চারি জন ঢাকী ঢুলী বাঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহাদের চেতনা হইল। পিট পিট করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। অন্য বাদ্যকর কেহ আসিল না। পরে শুনিলাম যে, তাহারা প্রাণপণে দৌড়িয়া একেবারে কলিকাতা গিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। ভালই হইয়াছিল। তাহাদিগকে টাকা দিতে হয় নাই। বিবাহের পর দিন, কন্যা লইয়া যখন নিজ গ্রামে আমি প্রত্যাগমন করি, তখন তাহাদের যন্ত্রগুলি আমি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে যখন তাহারা আসিল, তখন অনেক কষ্টে আমার নিকট হইতে যন্ত্রগুলি বাহির করিল। টাকা আর চাহিবে কোন লজ্জায়?

আমার কেনারাম চাকর ও দুই চারিজন বরযাত্র ক্রমে আসিয়া জুটিল। প্রথম তাহারা মনে করিয়াছিল যে, নিকটে মানুষ আনিবার নিমিত্ত বাঘ স্বয়ং ঢোল বাজাইতেছে। যাহা হউক, সেই দুই চারি জন বরযাত্র ও দুই চারি জন বাদ্যকর লইয়া আমি বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অধিক কথায় প্রয়োজন কি? প্রথম তো কন্যা সম্প্রদান হইল। তাহার পর আমাকে সকলে ছাদনাতলায় লইয়া গেল। এক পাল স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাড়কা রাক্ষসীর মত এক মাগী প্রথম আমার এক কান মলিয়া দিল, আর বলিল,—'বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিণ্ডি রক্ষে।' পুনরায় আর এক কান মলিয়া বলিল,—'বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিণ্ডি রক্ষে।' এইরূপে একবার এ কান একবার সে কান মলিতে লাগিল এবং ঐ কথা বলিতে লাগিল। মাগীর হাত কি কড়া। আমি মনে করিলাম যে, সাঁড়াশি দিয়া বুঝি আমার কান ছিঁড়িয়া লইতেছে। তার দেখা-দেখি, নয় দশ বৎসরের একটা ফচকে ছুঁড়ি ডিঙ্গি দিয়া আমার কান টানিতে লাগিল আর ঐ কথা বলিতে লাগিল। আমার আর সহ্য হইল না। আমি বলিলাম,—'নে নে! তোর আর অত ফচকুমিতে কাজ নাই, আমি তোর পিতেমোর বয়সি।'

কিন্তু এই সময়ে আবার এক বিপত্তি ঘটিল। বরণ-ডালা হস্তে আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী বরণ করিতে আসিলেন। আমার মুখপানে একবার কটাক্ষ করিয়াই তিনি অজ্ঞান! বরণ-ডালা ফেলিয়া, কন্যার হাত ধরিয়া, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গিয়া মাটীর উপর তিনি শুইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার সুরে তিনি বলিলেন,—'ও গো, মা গো, ও পোড়া বাঁদরের হাতে তোরে কি করিয়া দিব গো! ও গো মা গো! ও বুড়ো ডেকরার হাতে কি করিয়া তোকে দিব গো! ঘরে যে কালীঘাটের কালীর পট আছে, যা এক পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম, তার মত তোর যে মুখখানি গো! তুই যে আমার কেলেসোনা গো!' ইত্যাদি। কালীঘাটের পটের মত মুখ বটে! কন্যাকে

বাড়ী আনিয়া যখন ভাল করিয়া প্রথম তাঁহার মুখ দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, ইনি মানুষ নহেন, কালীঘাটের মা কালীর বাচ্ছা।

গুড়তে পুড়তে এই সময় ঘটকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঘটকী বলিল,—'শীঘ্র গহনার বাক্স লইয়া এস।'

কেনা চাকরের নিকট গহনার বাক্স আমি রাখিয়াছিলাম। গহনার বাক্স সে লইয়া আসিল। আমার নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া ঘটকী কন্যার গায়ে গহনা পরাইতে বসিল। বাম হাতে তাগা, জসম, তাবিজ, বাজু, চুড়ি ও বালা পরাইল। কন্যার কালো গায়ে সোনা ঝকমক করিতে লাগিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী চক্ষুর জলের ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার সুর ক্রমে ঢিলে হইয়া আসিল, আমার রূপবর্ণনাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। এখন তিনি বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত তোর যে মুখখানি গো।' এবার এই পর্য্যন্ত হইল।

যখন অপর হস্তে সমুদয় গহনা পরানো হইল, তখন তিনি বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরেব মত—।' এবার এই পর্য্যন্ত হইল।

যখন গলায় গহনা পরানো হইল, তখন চক্ষু মুছিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার পর কান্নার সুরে বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের—।' এবার এই পর্য্যন্ত।

এইরূপে ক্রমেই কান্নার সুর মৃদু ও ছন্দ পাপড়িভাঙ্গা হইয়া আসিল। অবশেষে কন্যা যখন সমুদয় ভূষণে ভূষিত হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, দুইবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,— 'তা হউক! আমার এলোকেশী সুখে থাকিবে।'

শুভদিনে শুভক্ষণে আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন কন্যা লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি—সেই তাড়কা রাক্ষসীর বোল সকলে যেন লুফিয়া লইল। সেই দিন হইতে সকলে আমার স্ত্রীর নাম রাখিল, 'পিত্তি-রক্ষে।' কেবল স্ত্রীর কেন? আমি একটু বুঝিয়া-সুঝিয়া খরচ-পত্র করি বলিয়া কেহ আমরা নাম করে না। আড়ালে সকলে আমাকেও "পিত্তি-রক্ষে" বলে। আমার গৃহিণী ঘোষেদের গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। ছোঁড়াবা তাঁহাকে 'পিত্তি-রক্ষে' বলে ক্ষেপাইত। সে জন্য এখন ভোরে ভোরে তিনি বসুদের গঙ্গায় স্নান করেন। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, আমাদের কাটী গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য, তেমন আর কোন গঙ্গার নয়; হরিদ্বার, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গঙ্গা কোথায় লাগে!

সন্ন্যাসী আমার কত টাকা নষ্ট করিয়াছিল? সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? কিন্তু চিরকাল আমি কপালে-পুরুষ, আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল। আমি এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিলাম। পূর্ব্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম! তাহার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরাণী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া শেয়ার কিনিল; শত শত দীনদরিদ্র লোকও ঘটি-বাটি বেচিয়া আমার নিকট টাকা পাঠাইল। তারপর—এঃ—এঁঃ—এঃ—এঁঃ—গলায় কিরূপ কফ বসিয়াছে। লম্বোদর বলিলেন,—'কফ কাশীতে আবশ্যক কি? স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাম করিয়াছ। তাহার পর, দেশশুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'ভাগ্যবান পুরুষদিগের টাকা একদিক দিয়া যায়, অন্যদিক দিয়া আসে। যাহা হউক, মা দুর্গা আমাকে সেই সন্ন্যাসী-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি বৎসর আমি মা দশভুজার পূজা করি।'

পুরোহিত বলিলেন,—

যদি বাপি বরো দেযস্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথা পরমাপদঃ।।

দেবগণ বলিলেন,—'হে মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিবে, তবে ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কবিও।'

মন্তব্য। 'পিত্তিরক্ষে' বলিয়াছেন যে—'পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে : আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।'

দ্বিতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্বকাহিনী

ডমরুধর বলিলেন,— পূজার সময় সন্ন্যাসী-সঙ্কটের গল্পে আমার সম্বন্ধে আরও দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার একটু পূর্বকাহিনী না বলিলে তোমরা সে সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিবে না। আজ যদি কৃত্তিবাস, কাশীদাস থাকিতেন, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি, আমার বীরত্ব, আমরা কীর্ত্তির বিষয়ে তাঁহারা ছড়া বাঁধিতেন। ঘরে ঘরে লোকে তাহা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইত। আর, যাত্রায় যাহারা দূতী সাজে, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা আমার বিষয়ে গান করিত। এক দিন রেলগাড়ীতে যাইবার সময় শুনিয়াছিলাম যে, কে এক জন মাইকেল ছিলেন। কে এক জন আবার তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। এ বৎসর আমার বাগানে অনেক কাঁচাকলা হইয়াছে : খরিদ্দার নাই, যিনি মাইকেলের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তিনি যদি আমার বিষয়ে সেইরূপ একখানি পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি তের পণ কাঁচাকলা দিতে সম্মত আছি।

আমার পিতা জমিদারী কাছারীতে মুহুরিগিরি করিতেন। যৎসামান্য যাহা বেতন পাইতেন, অতি কষ্টে তাহাতে আমাদের দিনপাত হইত। মাতা-পিতা থাকিতে আমার প্রথম নম্বরের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের পরলোকগমনে কলিকাতায় হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম। মাহিনা পাচ টাকা আর খাওয়া। যে বাড়ীতে বাবুর বাসা ছিল, তাহার নীচের এক সেঁতালে ঘরে আমি থাকিতাম। বাবুর এক চাকরাণী ব্যতীত অন্য চাকর ছিল না। তাঁহার গৃহিণী স্বয়ং রন্ধন করিতেন। রান্না হইত—অন্ততঃ আমার ও ঝিয়ের জন্য—মুসুর দাল ও বেগুন বা আলু বা কুমড়া ভাজা। মুসুর দালে কেবল একটু হলুদের রং দেখিতে পাইতাম, দালের সম্পর্ক তাহাতে থাকিত কি না সন্দেহ। তাহার পর বলিহারি যাই গৃহিণীর হাত! কি করিয়া যে তিনি সেরূপ ঝিঝির পাতের ন্যায় বেগুণ কুটিতেন তাহাই আশ্চর্য্য। অভ্রের চেয়ে বোধ হয় পাতলা। বাজারে যে চিংড়িমাছ বিক্রয় হইত না, যাহার বর্ণ লাল হইয়া যাইত, বেলা একটার সময় কালেভদ্রে সেই চিংড়ি মাছ আসিত। তাহার গন্ধে পাড়ার লোককে নাকে কাপড় দিতে হইত। সেই চিংড়ি মাছের ধড়গুলি বাবু ও তাঁহার গৃহিণী খাইতেন। মাথাগুলি আমাদের জন্য ঝাল দিয়া রান্না হইত। যে দিন চিংড়ি মাছ হইত, সেদিন আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না। সেই পচা চিংড়ি অমৃত জ্ঞান করিয়া আমরা খাইতাম। দুইবার ভাত চাহিয়া লইতাম। অধিক ভাত খরচ হইত বলিয়া চিংড়ি কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একগাট তেঁতুল ট্যাঁকে করিয়া আমি ভাত খাইতে বসিতাম। তাহা দিয়া কোনওরূপে ভাত উদরস্থ করিতাম। যাহা হউক, এই স্থানে যাহা আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, পরে তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, টাকা উপার্জন করিলেই টাকা থাকে না; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।

আমার বোধ হয় রাক্ষসগণ। আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স, তখন আমার প্রথম গৃহিণীর কাল হইল। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার আর বিবাহ হইল না। আমার অবস্থা সেই; লোকে বিবাহ দিবে কেন?

এই সময় পাশের বাড়ী আমাদের এক স্বজাতি ভাড়া লইলেন। তাহার নাম প্রহ্লাদ সেন। দোতালায় সপরিবারে তিনি বাস করিলেন। একজন আত্মীয়কে নীচের দুইটি ঘর ভাড়া দিলেন। তাঁহার নাম গোলক দে। প্রহ্লাদ বাবু কোনও বণিকের আফিসে কাজ করিতেন। অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, তবে টাকাকড়ি কি গহনাপত্র কিছুই ছিল না। গোলক

বাবু সরকারী আফিসে অল্প টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করিতেন। তাঁহার পুত্র পশ্চিমে কোথায় কাজ করিতেন, কলিকাতায় তিনি ও তাঁহার গৃহিণী থাকিতেন।

প্রহ্লাদবাবুর গৃহিণী, তাঁহার মাতা, এক বিধবা ভগিনী, দুই শিশু-পুত্র ও এক কন্যা, তাঁহার পরিবার এই ছিল। এই সময়ে কন্যাটির বয়স দশ কি এগার ছিল। আমি তাহাকে যখন প্রথম দেখিলাম, তখন অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইল—কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল যে, ডমরুধর! এই কন্যাটি তোমার দ্বিতীয় পক্ষ হইবে। তোমার জন্যই বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কন্যার পিতার নিকট কথা উত্থাপন করি? বয়স তখন আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর, রূপ আমার এই, অবস্থা আমার সেই—কথা উত্থাপন করিলে তিনি হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? এই সময় একটা ঘটনা ঘটিল, কন্যাটি নিদারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই সূত্রে পাশের বাড়ীতে আমি যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। "আপনার কন্যা আজ কেমন আছে?" দুইবেলা প্রহ্লাদবাবুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাহাদের জন্য কিছু কাজকর্মও করিতে লাগিলাম। প্রয়োজন হইলে ঔষধ আনিয়া দিতাম ও ডাক্তারের বাড়ী যাইতাম। নিজের পয়সা দিয়া বড়বাজার হইতে ছাড়ানো বেদানা আনিয়া দিতাম। ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গিয়া দুই তিনবার কন্যাটিকেও দেখিলাম। কন্যাটির রূপ ছিল না, তথাপি তাহাকে দেখিয়া আমার মন আরও মোহিত হইয়া গেল। এইরূপ আত্মীয়তার গুণে প্রহ্লাদবাবুর সহিত আমার অনেকটা সৌহার্দ্য জন্মিল। শুনিলাম যে, কন্যাটির নাম মালতী। কেমন সুন্দর নাম দেখিয়াছ? নামটি শুনিলে কান জুড়ায়।

ভগবানের কৃপায় মালতী আরোগ্যলাভ করিল। আমাদের ঝিকে মাঝে মাঝে দুই একটি সন্দেশ, দুই একটি রসগোল্লা, দুই একখানি জিলেপি দিয়া বশ করিলাম, ক্রমে তাহার দ্বারা প্রহ্লাদবাবুর মাতা, স্ত্রী ও বিধবা ভগিনীর নিকট কথা উত্থাপন করাইলাম। প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী সংসারের কর্ত্রী। যা বলিয়াছিলাম,—সে কথা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—'কি! ঐ জলার ভূতটার সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিব? পোড়া কপাল!'

কিন্তু কন্যার বিবাহের নিমিত্ত প্রহ্লাদবাবু বিব্রত ছিলেন। তাঁহার টাকা ছিল না। কি করিয়া কন্যাদায় হইতে তিনি উদ্ধার হইবেন, সর্বদাই তাহা ভাবিতেছিলেন। সুতরাং ঝি যে প্রস্তাব করিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বলিলেন,—'পুরুষমানুষের পক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স কিছু অধিক নহে। তাহার পর রূপে কি করে গুণ থাকিলেই হইল। মালতীর পীড়ার সময় সে আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, ডমরুধর মন্দ লোক নহে। কিন্তু কথা এই যে, সে সামান্য বেতনে কাপড়ের দোকানে কাজ করে। পরিবার প্রতিপালন সে কি করিয়া করিবে?'

এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই আমি ঝিকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমার অবস্থা সম্বন্ধে যখন কথা উঠিল, তখন ঝি বলিল যে, 'দেশে ডমরুবাবুর অনেক জমি আছে, তাহাতে অনেক ধান হয়। আম-কাঁঠাল-নারিকেলেরও অনেক বাগান আছে।' বলা বাহুল্য যে, এ সব কথা সমুদয় মিথ্যা। এ সময়ে আমার কিছুই ছিল না। কন্যার মাতা, পিতা ও পিতামহী এক প্রকার সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী ক্রমাগত আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন যে,—হবু জামাতার যদি এত সম্পত্তি আছে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ পাঁচশত টাকার গহনা দিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। পাঁচশত টাকা দূরে থাকুক, তখন আমার পাঁচশত কড়া কড়ি ছিল না।

কিন্তু মালতী পয়মন্ত কন্যা। এই সময় সহসা আমার ভাগ্য খুলিয়া গেল। অভাবনীয় ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ আমি দেড় হাজারের অধিক টাকা পাইলাম। আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার সৌভাগ্যের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি আমার গ্রামে যাইলাম। তেরশত টাকা কোনও স্থানে লুক্কায়িত রাখিলাম। দুইশত টাকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া প্রহ্লাদবাবুর কন্যাকে আমি পাঁচশত টাকার গহনা দিতে স্বীকৃত হইলাম। বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইল। এ বিবাহে কোনও বিড়ম্বনা ঘটে নাই। শুভদিনে আমার দ্বিতীয় বারের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া

গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কন্যার নিমিত্ত পাঁচশত টাকার গহনা আমি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই পাঁচশত টাকার গহনা আমি একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : একশত মোহর

ইহার পর ছয় মাস পরম সুখে অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশেই শ্বশুরবাড়ী। সে স্থানে সর্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত। আমার আদরের সীমা ছিল না। যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন এটা খাই কি সেটা খাই, সর্বদাই এই গোলে পড়িতাম। এত দ্রব্য তাঁহারা আমার সম্মুখে দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন বেলা নয়টার সময় আহার করিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় ঠিক আমার ঘরের পাশের ঘরে একটা ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় গোলোকবাবু নামে আমাদের একজন স্বজাতি বাস করিতেন। এ বাড়ীতে আমার ঘর, সে বাড়ীতে তাঁহার ঘব, ঠিক গায়ে গায়ে ছিল। এ বাড়ীতে আমার ঘর যেরূপ স্যাঁতসেঁতে কদর্য্য ছিল, গোলোকবাবুর ঘর সেইরূপ ছিল না। তাঁহার ঘরটি খটখটে শুষ্ক ফিটফাট ছিল। তিনি নিজে সরকারী আফিসে কাজ করিতেন, পশ্চিমে কোথায় তাঁহার পুত্র কাজ করিত। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। গোলোকবাবুর বয়স হইয়াছিল। কলিকাতায় কেবল তিনি নিজে ও তাঁহার বয়স্কা গৃহিণী থাকিতেন। গোলোকবাবুর ঘরেই এই কোলাহল হইয়াছিল।

গোল শুনিয়া আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে দৌড়িয়া যাইলাম, মনে করিলাম, হয় তো কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর সমুদয় লোক নীচে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া মালতী উপরে পলায়ন করিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা টানিয়া দিলেন। আমার শ্বশুর-মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, গোলোকবাবুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতার নিকট টাকা পাঠাইতেন। পিতা সেই টাকায় মোহর গাঁথাইয়া তাঁহার ঘরের প্রাচীরের গায়ে যে আলমারি আছে, একটি বগলি অর্থাৎ থলি করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একশত মোহর গাঁথাইয়া আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। ঘরের প্রাচীরেব গায়ে আলমারি, তাহাতে চারিটী তক্তার খোপ ছিল, সম্মুখে কাঠের কপাট ছিল, কপাট সর্বদা চাবি-বন্ধ থাকিত। গোলোকবাবুর এই একশত মোহর চুরি গিয়াছিল। তাহার জন্যই এ গোলমাল। গোলোকবাবু মনের দুঃখে নীরবে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছেন। কবে চুরি গিয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলিলেন যে, এক বৎসর পূর্বে ঐ মোহর গুলি তিনি আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আর তিনি ও তাঁহার স্ত্রী থাকেন, অন্য কেহ এ ঘরে প্রবেশ করে না। সেজন্য কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারেন না। আমার শ্বশুরমহাশয় পুলিসে খবর দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম যে,—'কখন কবে চুরি গিয়াছে, তাহার কোনও ঠিক নাই, কাহারও প্রতি গোলোকবাবুর সন্দেহ হয় না, তখন মিছামিছি পুলিসে আর সংবাদ দিয়া কি হইবে?' পুলিসে আর সংবাদ দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পর যখন আমি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ডমরুধর! বড় বিপদের কথা। পাশের বাড়ীতে তুমি যে ঘরে বাস কর, আর এ বাড়ীতে গোলোকবাবু যে ঘরে বাস করেন, এই দুই ঘরের কেবল একটি প্রাচীর, দুই ঘরের কড়ি সেই এক দেওয়ালের উপর। গোলোকবাবুর ঘরে যে স্থানে সে আলমারি আছে, সে স্থানের দেওয়ালটি কাজেই অতিশয় পাতলা। আজ তিনি আলমারির ভিতর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যে স্থানে তিনি মোহর রাখিয়াছিলেন, তাঁহার হাত লাগিতেই সেই স্থানের দেওয়ালটি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে দেওয়ালে ইট ছিল না, কেবল একটু বালি খাম ছিল। সেই বালি ভাঙ্গিয়া প্রাচীরে ফুটা হইয়া গেল। দুই ঘরের এক দেওয়াল, সুতরাং সেই ছিদ্র তোমার ঘরেও হইল। তোমার উপর এখন বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। যদি মোহরগুলি তুমি বাপু লইয়া থাক, তাহা হইলে আস্তে আস্তে ফিরিয়া দাও। তাহা হইলে সকল কথা মিটিয়া যাইবে। তা না হইলে বড় গোলমাল হইবে।'

এই কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমি বলিলাম,—'সে কি মহাশয়! আমি ভদ্রসন্তান, আমি চোর নই। তাহার পর আপনি আমার শ্বশুর। আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।'

তাহার পর গোলোকবাবু নিজে এবং তাঁহার গৃহিণী আমাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন,—'বাপু! ভুলভ্রান্তিক্রমে যদি মোহরগুলি তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তামাসা করিয়া যদি রাখিয়া থাক, তাহা হইলে ফিরিয়া দাও, তোমার পায়ে পড়ি, মোহরগুলি ফিরিয়া দাও।'

তাঁহাদের উপর আমি রাগিয়া উঠিলাম যে,—'আমাকে আপনারা চোর বলেন! আপনারা ভাল মানুষ নহেন।' ইত্যাদি।

ক্রমে এ কথা আমার মনিব হর ঘোষের কানে উঠিল। মোহর ফিরিয়া দিতে তিনিও আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'মহাশয়! আজ কয় বৎসর আপনার দোকানে কাজ করিতেছি, আর কয় বৎসর আপনার বাটীতে বাস করিতেছি। একটা পয়সা কখন কি আপনার লইয়াছি? আমার প্রতি সন্দেহ হয় এমন কাজ কখন কি আমি করিয়াছি?'

দিনকয়েক বিলক্ষণ গোল চলিল। দেখ, লম্বোদর! মানুষ হাজার বুদ্ধিমান হউক, এরূপ কাজে একটা-না-একটা ভুল করে। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা হইল, এখন আর প্রকাশ করিতে দোষ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই হইয়াছিল,—মশার দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইত না। অনেক কষ্টে পাঁচসিকা দিয়া একটি মশারি কিনিয়াছিলাম। মশারিটী খাটাইবার নিমিত্ত দেওয়ালে একদিন পেরেক মারিতেছিলাম। পেরেক মারিতে হঠাৎ দেওয়ালের কতকটা বালি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই স্থানটিতে একটি ছিদ্র হইল। ছিদ্রের ভিতর আমি হাত দিলাম। হাতে কি এক ভারী দ্রব্য ঠেকিয়া গেল। বাহির করিয়া দেখিলাম যে, মোহরপূর্ণ এক বগলি। তৎক্ষণাৎ আমি আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর পুনরায় গর্ত্তের ভিতর হাত দিয়া দেখিলাম যে, তাহার অপর পার্শ্বে কাঠ, হাতে সেই কাঠ ঠেকিয়া গেল। তখন ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর প্রকাশ হইল যে, আমার ঘরের ও গোলোকবাবুর ঘরে এক প্রাচীর, প্রাচীরের অপর পার্শ্বে গোলোকবাবুর ঘরে আলমারি, আমার হাতে আলমারির কপাট ঠেকিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, মোহরগুলি পাইয়া আমার যেন স্বর্গলাভ হইল। চুপি চুপি সেইগুলি গণিতে লাগিলাম। পাছে শব্দ হয়, সেজন্য একটি একটি করিয়া গণিলাম একশত মোহর। চিরকাল পরিশ্রম করিলেও কখন আমি এত টাকা উপার্জন করিতে পারিতাম না। দেখিলাম যে, এ সে কালের মোহর নহে, বিলাতি মোহর, যাহাকে লোকে গিনি বলে। পরদিন একটু বালি ও চূণ আনিয়া দেওয়ালের ছিদ্রটি বুজাইয়া দিলাম। তাহার পর বাজারে গিয়া মোহরগুলি বিক্রয় করিলাম। পনর শত টাকার অধিক হইল। দেশে গিয়া তেরশত টাকা কোন এক নিভৃত স্থানে পুতিয়া রাখিলাম। বিবাহের নিমিত্ত বাকী টাকা কাছে রাখিয়া দিলাম। মোহর যে গিয়াছে, ভাগ্যে গোলোকবাবু ছয় মাস পর্য্যন্ত দেখেন নাই। যে সময় মোহর আমার হস্তগত হইযাছিল, সে সময় যদি তিনি খোঁজ করিতেন, তাহা হইলে আমার আর বিবাহ হইত না।

বলিতেছিলাম যে, এই মোহর সম্বন্ধে আমি একটি ভুল করিয়াছিলাম। বড়বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকানের পার্শ্বে এক পোদ্দারের দোকান ছিল। সেই দোকানে আমি মোহরগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম। একটু দূরে গিয়া যদি এ কাজ করিতাম, তাহা হইলে আর বিশেষ কোনও গণ্ডগোল হইত না। পাশেই দোকান, সেজন্য পোদ্দারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমার মনিব হর ঘোষ মহাশয় আমি যে মোহর বেচিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলেন। প্রহ্লাদবাবুকে তিনি বলিয়া দিলেন। সকলে জটলা করিয়া আমাকে মোহর বিক্রয়ের টাকা গোলোকবাবুকে দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে,—'এ মোহর আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুকালে মা আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহে ও অন্যান্য বিষয়ে মোহর বিক্রয়ের টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। সে টাকা এখন আমি কোথায় পাইব, আর যদি থাকিত, তাহা হইলে কেনই বা দিব?'

অবশ্য আমার এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। যখন নিতান্ত আমার নিকট হইতে তাঁহারা টাকা আদায়

করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে পুলিশে দিবার নিমিত্ত তাঁহারা স্থির করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম,— 'তাহাতে ক্ষতি কি? এক বৎসর কি দুই বৎসর যদি আমার জেল হয়, তাহা হইলে মেয়াদ খাটিয়া পরে সেই টাকা লইয়া কোনওরূপ ব্যবসা করিব। আর এখন যদি টাকাগুলি দিয়া দিই, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? ভগবান আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন! সে টাকা ফিরিয়া দিলে আমার মহাপাতক হইবে।'

কিন্তু আমাকে পুলিশে দেওয়া হইল না। আমার শাশুড়ি ঠাকুরাণী কাঁদিয়া-কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিলেন! অবশেষে সকলে মিলিয়া আমার নিকট হইতে গোলোকবাবুর পুত্রের নামে এক হাজার টাকাব হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন। আর আমি মালতীকে যে গহনাগুলি দিয়াছিলাম, প্রহ্লাদবাবু সেগুলি গোলোকবাবুকে দিয়া দিলেন। তাঁহারা আবও অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আমার বিবাহের সময় যে জমি-জোরাত বাগান-বাগিচার কথা বলিয়াছিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব

আমার নিকট হইতে ইঁহারা যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম,— 'যত পার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লও। উপুড় হস্ত কখন আমি করিব না। নালিশ করিবে? ডিক্রী করিবে? ডিক্রী ধুইয়া খাইও। কি বেচিয়া লইবে বাপু?'

বস্তুতঃ এ হ্যাণ্ডনোটের একটি পয়সাও আমাকে দিতে হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে গোলোকবাবু কর্মত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। সে স্থানে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। টাকা সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র অনেকবার আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তর আমি দিই নাই; দাঁড়াও! একবারেই যে টাকা আমাকে দিতে হয় নাই, তাহা নহে। দুইটা ছুঁড়ী! সে কথা পরে বলিব।

হর ঘোষ আমাকে দোকান হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। সেজনা আমি দুঃখিত হইলাম না। মনে জানি যে, আমার সেই তেরশত টাকা আছে। পূর্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই টাকা দিয়া হয় জমিদারী কিনিব আর না হয় ব্যবসা করিব, কিন্তু যতদিন ঐ হ্যাণ্ডনোটের ভয় থাকিবে, ততদিন কিছু করিব না।

আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন,—'তোমাকে আর আমার বাড়ীতে আসিতে দিব না। আজ হইতে জানিলাম যে, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। তোমার মুখ দেখিলেও পাপ হয়, আর জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, সেজন্য তোমা হেন ইতরের হাতে আমি কন্যা দিয়াছি। তোমার ঘরে আমি কন্যা পাঠাইব না।'

আমি ভাবিলাম যে,—'বটে, এখন আমার পুঁজি হইয়াছে, কি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, হর ঘোষের বাড়ীতে তাহা আমি শিখিয়াছি। যেমন করিয়া পারি, আমি ধনবান হইব, টাকা হইলে কেহ তখন জিজ্ঞাসা করে না যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে। জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, যেমন করিয়া লোক বড়মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর-ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তৈল মর্দন করে, রও একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিব যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়ীতে ফ্যান চাটিতে যাও কি না।' অবশ্য এসব মনের চিন্তা প্রকাশ করিলাম না, কিন্তু যথাকালে আমার সে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।

আমার শ্বশুরমহাশয়ের রাগের আর একটি কারণ ছিল, মালতীকে আমি যে পাঁচশত টাকার গহনা দিয়াছিলাম, তাহা একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম। দুইখানি ব্যতীত সমুদয় অলঙ্কার কেমিক্যাল সোনার অর্থাৎ গিল্টির গহনা ছিল। সুতরাং গহনাগুলি পাইয়া গোলোকবাবুর বিশেষ লাভ হয় নাই।

হর ঘোষের দোকান হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন আমি সুন্দরবনের এক আবাদে চাকরী করিয়াছিলাম। সেই সময় আবাদ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিছুদিন পরে যখন হ্যাণ্ডনোটের ভয় যাইল, তখন নিজের জন্য আমি একটি আবাদ খুঁজিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে শুনিলাম যে, দূরে নিবিড় বনের নিকট এক আবাদ সুলভমূল্যে বিক্রয় হইবে। যাঁহার আবাদ, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদয় তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, এই আবাদ

তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। নোণাজল প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত ইহাতে তিনি ভেড়ি অর্থাৎ বাঁধ বাঁধিয়াছিলেন, পানীয় জলের নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, বন পরিষ্কার করিয়াছিলেন, দুই চারি ঘর প্রজাও বসাইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাহার বাঁধ কয়েক স্থানে ভাঙ্গিয়া গেল, আবাদের ভিতর নোণাজল প্রবেশ করিল, প্রজাগণ পলায়ন করিল, সে আবাদ পুনরায় বনে আবৃত হইয়া পড়িল। পুনরায় উঠিত করিবার টাকা তাঁহার নাই। সেজন্য তিনি আবাদ বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। এই সম্পত্তি তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক হাজার টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিবেন। আমি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সে স্থান দেখিতে যাইলাম। কিন্তু বাঘের ভয়ে নৌকা হইতে নীচে নামিলাম না। এ অঞ্চলে তখন অধিক আবাদ হয় নাই, চারিদিক বনে আবৃত ছিল, সেজন্য বিলক্ষণ বাঘের ভয় ছিল। নৌকার উপর হইতে স্থানটি দেখিয়া আমার মনোনীত হইল। মনে ভাবিলাম যে, একটু বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে এরূপ সম্পত্তি হাজার টাকায় পাওয়া যায় না। মোহর প্রদান করিয়া ভগবান আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পড়তা খুলিয়া গিয়াছে। একটু যত্ন করিলেই এই আবাদে পরে সোনা ফলিবে। আরও ভাবিলাম যে, আমার কাছে পূর্ব হইতেই তেরশত টাকা ছিল। তাহার পর আবাদে কাজ করিয়া আরও পাঁচশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। এক হাজার টাকা দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিলে আমাব কাছে আটশত টাকা থাকিবে। ভেড়ি বাঁধিতে, বন কাটিতে, প্রজা বসাইতে এই আটশত টাকা খরচ করিব। তাহার পর মাছের তেলে মাছ ভাজিব, অর্থাৎ ইহার আয় হইতেই বাকী ভূমি উঠিত করিব। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিষয় আমি ক্রয় করিলাম। তাহার পর শুন বিপত্তির কথা।

আবাদে কাজ করিবার সময় একজন সাঁইয়ের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। মন্ত্রবলে যাহারা বাঘ দূর করিতে পারে, এরূপ লোককে সাঁই বলে। বড়গোছের একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। তাহাতে ছয়জন মাঝি ছিল। আবাদে কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সাঁই ও আমি যাত্রা করিলাম। আমার আবাদের পাশেই এক গাঙ ছিল। এই নদী দিয়া পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নৌকা যাতায়াত করিত। আমি, সাঁই ও তিনজন মাঝি লাঠিসোটা লইয়া নৌকা হইতে নামিলাম। আবাদের এদিক্-ওদিক্ কিয়ৎপরিমাণে ভ্রমণ করিলাম। অনেক ভূমি বনে আবৃত, সকল স্থান দেখিতে পারিলাম না। যে যে স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিলাম। পুষ্করিণীটি উচ্চ ভূমিতে ছিল, তবুও কতক পরিমাণে তাহার ভিতর জোয়ারের নোণাজল প্রবেশ করিয়াছিল। যে কয়জন কৃষক বাস করিয়াছিল, একখানি ব্যতীত আর সকলের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই একখানি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটু আগে গিয়া দেখিলাম যে, একটি মৃত ব্যাঘ্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে লাগিলাম। আমার সাঁই বলিল যে, এ ব্যাঘ্রটিকে অন্য কোন সাঁই মন্ত্রবলে বধ করিয়া থাকিবে। কারণ, ইহার শরীরে গুলী অথবা অন্য কোন অস্ত্র-চিহ্ন নাই।

তাহার পর কৃষকের ভগ্নগৃহ অভিমুখে আমরা গমন করিলাম। এ ঘরখানির চারিদিকে প্রাচীর ও উপরে চাল ছিল, কিন্তু ঘরের দ্বারে আগড় অথবা কপাট ছিল না, যেই আমরা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছি, আর ঘরের ভিতরে বন্ বন করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। প্রথম মনে করিলাম যে, লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুন্‌গুন্ রব। ভিতরে হয় তো বৃহৎ একটি চাক হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কালো কালো চড়াই পাখীর ন্যায় সত শত কি সব দেওয়ালের গায়ে বসিয়া আছে। তাহাদের সর্বশরীর কালো, কিন্তু পেটগুলি রক্তবর্ণের। তাহাদের দুইটি করিয়া ডানা আছে, উড়িবার নিমিত্ত ডানাগুলি নাড়িতেছে। তাহাতেই এরূপ বন্ বন্ শব্দ হইতেছে, রক্তবর্ণের কোনও দ্রব্য খাইয়া পেট পূর্ণ করিয়াছে, সেজন্য উড়িতে পারিতেছে না। এ কি জীব? কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে জীব হউক, এই জীবই রক্তপান করিয়া ব্যাঘ্রটিকে বধ করিয়া থাকিবে। এই সময়ে সাঁই এক বড় নির্বোধের কাজ করিয়া বসিল, লাঠি দ্বারা মাটীতে আঘাত করিয়া শব্দ করিল। গুটিদশ জীব, যাহারা সম্পূর্ণভাবে উদর পূর্ণ করিয়া রক্তপান করে নাই, প্রাচীরের গা হইতে উড্ডীয়মান হইল। সাঁই সকলের অগ্রে ছিল, জীব কয়টি তাহার গায়ে আসিয়া বসিল, প্রাণ গেল প্রাণ গেল বলিয়া সাঁই দৌড়িল, দশহাত যাইতে না যাইতে সাঁই ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মশার মাংস

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—আমরা দেখিলাম যে, সাঁইয়ের গায়ে দশ-বারটি কালো জীব বসিয়াছে। যাতনায় সাঁই ছট্‌ফট্ করিতেছে। লাঠি দিয়া আমি সেই জীবগুলিকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। আমার লাঠির আঘাতে সাঁইয়ের দেহ হইতে তিনটি জীব উড্ডীয়মান হইল। তাহাদের একটি আমার গায়ে বসিতে আসিল। সবলে তাহার উপর আমি লাঠি মারিলাম। লাঠির আঘাতে জীবটি মৃত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি তাহার মৃতদেহ তুলিয়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর দুইটি জীব একজন মাঝির গায়ে গিয়া বসিল। মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল। দশ-বার হাত দৌড়িয়া গিয়া সেও মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমি সাঁইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সাঁই জীবিত নাই, সাঁই মরিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিলাম যে, এ জীব কেবল যে রক্তপান করে, তাহা নহে, ইহার ভয়ানক বিষও আছে। তখন অবশিষ্ট দুইজন মাঝির সহিত আমি দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম ও তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

নৌকায় বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, মোহর বিক্রয়ের টাকাগুলি বুঝি জলাঞ্জলি দিলাম, পাপের ধন বুঝি প্রায়শ্চিত্তে গেল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি কেন সে লোক এক হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। যে জীবটিকে লাঠি দিয়া মারিয়াছিলাম, যাহার মৃতদেহ আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন পর্য্যন্ত আমার হাতেই ছিল। নৌকার উপর রাখিয়া সেইটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমি ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম যে,—সে অন্য কোনও জীব নহে, বৃহৎ মশা! চড়াই পাখীর ন্যায় বৃহৎ মশা! মশা যে এত বড় হয়, তাহা কখনও শুনি নাই। শরীরটি চড়াই পাখীর ন্যায় বড়, শুঁড়টি বৃহৎ জোঁকের ন্যায়। ডাক্তারেরা যেরূপ ছুরি দিয়া ফোঁড়া কাটে শুঁড়ের আগায় সেইরূপ ধারালো পদার্থ আছে। জীব-জন্তু অথবা মানুষের গায়ে বসিয়া প্রথম সেই ছুরি দিয়া কতক চর্ম ও মাংস কাটিয়া লয়। তারপর সেই স্থানে শুঁড় বসাইয়া রক্তপান করে। কেবল যে রক্তপান করিয়া জীবজন্তুর প্রাণ বিনষ্ট করে তাহা নহে, ইহাদের ভয়ানক বিষ আছে, সেই বিষে অপর প্রাণী ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যায়।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি করিয়া জানিলে যে, সে জীব কোনও নূতন প্রকার পক্ষী নহে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পক্ষীদের দুইটি পা থাকে, ইহার ছয়টি পা; পক্ষীদের ডানায় পালক ছিল না; পক্ষীদের ঠোঁট থাকে, ঠোঁটের স্থানে ইহার শুঁড় ছিল; পক্ষীদের শরীরে হাড় থাকে, ইহার শরীর কাদার ন্যায় নরম। সেইজন্য আমি স্থির করিলাম যে, ইহা পক্ষী নহে, মশা।'

লম্বোদর বলিলেন,—'মশা যে এত বড় হয়, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'কেন বিশ্বাস হইবে না? হস্তী বৃহৎ মশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মশার শুঁড় আছে, হস্তীরও শুঁড় আছে। তবে হস্তী যদি রক্তপান করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অপর কোনও জীব জীবিত থাকিত না। সেই জন্য হাতী গাছপালা খাইয়া প্রাণধারণ করে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহা ভিন্ন আমি এ কথার প্রমাণ রাখিয়াছি। যেমন সেই বাঘের ছালখানি ঘরে রাখিয়াছি, সেইরূপ এই মশার প্রমাণস্বরূপ আমি জোঁক রাখিয়াছি। আমাদের গ্রামের নিকট যে বিল আছে, মশার শুঁড়টি কাটিয়া আমি সেই বিলে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেই শুঁড় হইতে এখন অনেক বড় বড় জোঁক হইয়াছে। আমার কথায় তোমাদের প্রত্যয় না হয়, জলায় একবার নামিয়া দেখ। প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলি না।'

লম্বোদর বলিলেন,—'মশার শুঁড় পচিয়া জোঁক হইতে পারে না।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'কেন হইবে না? স্বে হইতে স্বেদজ জীব হয়। বাদা বনের পাতা পচিয়া চিংড়ি মাছ হয়। কোন বি-এ অথবা এম-এ অথবা কি একটা পাশ করা লোক কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একখানা বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পুদিনা গাছ সম্বন্ধে তাহাতে তিনি এরূপ লিখিয়াছিলেন,—একখণ্ড দড়িতে গুড় মাখাইয়া বাহিরে বাঁধিয়া দিবে। গুড়ের লোভে তাহাতে মাছি বসিয়া মলত্যাগ করিবে। মাছির মল-মূত্রে দড়িটি যখন পূর্ণ হইবে, তখন

সেই দড়ি রোপণ করিবে। তাহা হইতে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হইবে। মক্ষিকার বিষ্ঠায় যদি পুদিনা গাছ হইতে পারে, তাহা হইলে মশার শুঁড় হইতে জোঁক হইবে না কেন?'

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—যাহা হউক, আমার বড়ই চিন্তা হইল। এত কষ্টের টাকা সব বৃথায় গেল, তাহা ভাবিয়া আমার মন আকুল হইল। কিন্তু আমি সহজে কোন কাজে হতাশ হই না। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বৃহৎ একটি মশারি প্রস্তুত করিলাম। কাপড়ের মশারি নহে, নেটের মশারি নহে, জেলেরা যে জাল দিয়া মাছ ধরে, সেই জালের মশারি। তাহার পর পাঁচজন সাঁওতালকে চাকর রাখিলাম। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সেই পাঁচজন সাঁওতাল সঙ্গে লইয়া পুনরায় আবাদে গমন করিলাম। ধীরে ধীরে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। চারি কোণে চারিটি বাঁশ দিয়া চারিজন মাঝি ভিতর হইতে মশারি উচ্চ করিয়া ধরিল। তীর ধনু হাতে লইয়া চারিপার্শ্বে চারিজন সাঁওতাল দাঁড়াইল। একজন সাঁওতালের সহিত আমি মশারির মাঝখানে রহিলাম। মশারির ভিতর থাকিয়া আমরা দশজন আবাদের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অধিক দূর যাইতে হয় নাই। বৃহৎ মশকগণ বোধ হয় অনেক দিন উপবাসী ছিল। মানুষের গন্ধ পাইয়া পালে পালে তাহারা মশারির গায়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু মশারির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সাঁওতাল পাঁচজন ক্রমাগত তাহাদিগকে তীর দিয়া বধ করিতে লাগিল। সেদিন আমরা আড়াই হাজার মশা মারিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ বন্ধ করিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সাঁওতালগণ একঝুড়ি মৃত মশা সঙ্গে আনিয়াছিল। শুঁড়, ডানা ও পা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতালরা মশা পোড়াইয়া ভক্ষণ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহার মাংস অতি উপাদেয়, ঠিক বাদুড়ের মাংসের মত। আমাকে একটু চাকিয়া দেখিতে বলিল, কিন্তু আমার রুচি হইল না।

পরদিন আমরা দুই হাজার মশা বধ করিলাম, তাহার পরদিন ষোল শত, তাহার পরদিন বার শত, এইরূপ প্রতিদিন মশার সংখ্যা কম হইতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ দিনে মশা একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। হয় আমরা সমুদয় মশা মারিয়া ফেলিলাম, আর না হয় অবশিষ্ট মশা নিবিড় বনে পলায়ন করিল। সেই অবধি আমার আবাদে এ বৃহৎ জাতীয় মশার উপদ্রব হয় নাই। মশার হাত হইতে অর্থাৎ শুঁড় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমি আবাদের চারিদিকে পুনরায় ভেড়ি বাঁধাইলাম। বন কাটাইয়া ও পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া কয়েক ঘর প্রজা বসাইলাম। এই সমুদয় কাজ করিতে আমার আটশত টাকা খরচ হইয়া গেল। তখন দেখিলাম যে, আরও হাজার টাকা খরচ না করিলে কিছুই হইবে না। সে হাজার টাকা কোথায় পাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ · শূন্যপথে লোহার সিন্দুক

আমাদের গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে কচপুরের স্বরূপ সরকেলের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। কাপড়ের দোকানে যখন কাজ করিতাম, তখন তিনি আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। কাপড়ের দাম লইয়া তিনি বড় হেঁচড়া-হেঁচড়ি কচলা-কচলি করিতেন না। তিন সত্য করিয়া ধর্মের দোহাই দিয়া আমি তাঁহাকে বলিতাম যে, 'আপনার নিকট হইতে কখনও আমি এক আনার অধিক লাভ করিব না।' কিন্তু ফলে তাঁহাকে বিলক্ষণ ঠকাইতাম। আমি ব্যবসাদারের চাকর ছিলাম। দোকানদারের রীতি এই। আলাপী লোকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে, আলাপী লোককে ঠকাইতে দোকানদারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। বড়বাজারে বসিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যাকথা বলিতাম; শত শত লোককে আমরা ঠকাইতাম। না ঠকাইলে আমাদের কাজ চলে না। এই সূত্রে সরকেলমহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সরকেলমহাশয়ের একটু জমিদারী আছে, তাহা ব্যতীত তিনি তেজারতি করেন। আমি ভাবিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া আমি আমার আবাদের পতিত ভূমি উঠিত করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি সরকেলমহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। আবাদ বাঁধা রাখিয়া তাঁহার নিকট এক হাজার টাকা ঋণ চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, 'আবাদ না দেখিয়া টাকা দিতে পারি না।' একজন গোমস্তাকে আমাব আবাদ দেখিতে পাঠাইলেন। সাতদিন পরে পুনরায় আমাকে যাইতে বলিলেন। এই সময় আমি দেখিলাম যে, সেই গ্রামে দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সরকেলমহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে তাঁহারা আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাহাদের সহিত

তিনটি ঘোড়া ও বৃহৎ এক কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত কালীর প্রতিমা আছে। দিনের মধ্যে তিনবার শঙ্খ ও শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহারা দেবীর পূজা করেন। সমস্ত দিন অনেক লোক আসিয়া প্রতিমা দর্শন করে। খুব ধূম। যে পর্যন্ত সন্ন্যাসী মহাশয়েরা এই গ্রামে আসিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত সরকেলমহাশয় তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। ইহার অনেক বৎসর পরে আমি নিজে সন্ন্যাসী-সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম তখনও এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সন্ন্যাসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তখন যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সরকেলমহাশয়কে সাবধান করিতাম।

সাতদিন পরে পুনরায় আমি সরকেলমহাশয়ের বাটী গমন করিলাম। সন্ধ্যাবেলা পৌঁছিলাম। সেজন্য টাকা-কড়ি সম্বন্ধে সে রাত্রি কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। সরকেলমহাশয়ের দুই মহল কোটাবাড়ী। পূর্বদিকে অন্তঃপুর, পশ্চিমদিকে সদরবাটী। সদরবাটীর উত্তর দিকে পূজার দালান। আহারাদি করিয়া আমি পূজার দালানে শয়ন করিলাম, পথশ্রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি বোধ হয় তখন একটা, এমন সময় ভিতরবাড়ীতে দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু লোকের সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলাম না। শব্দটাও ডাকাতপড়া শব্দের ন্যায় নহে। আমার বোধ হইল, যেন একটা ভারী বস্তু এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়িতে সবলে লাফাইয়া উপরতালা হইতে নীচের তালায় নামিতেছে। প্রথম মনে করিলাম যে, সরকেলমহাশয় বুঝি কোনও বস্তু এই প্রকারে উপর হইতে নীচে আনিতেছেন। রথের সময় পুরুষোত্তমে জগন্নাথের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া উড়ে পাণ্ডারা যেরূপ মন্দিরের এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামায়, সরকেলমহাশয় বুঝি সেইরূপ কোনও ভারী বস্তু নামাইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর কোলাহল পড়িয়া গেল। সরকেলমহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, টাকাকড়িপূর্ণ তাঁহার লোহার সিন্দুক কে লইয়া যাইতেছে। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া বলিল যে, ভূতে লোহার সিন্দুক লইয়া যাইতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু পরে শুনিলাম যে, সিন্দুক আপনা আপনি উপর ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। আপনা আপনি সিঁড়ির এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামিতেছিল। লোহার সিন্দুক যখন উপর হইতে নীচে নামিতেছিল, তখন সরকেলমহাশয় একবার তাহার আংটা ধরিয়াছিলেন। পরমুহূর্তে পায়ের উপর লোহার সিন্দুক পড়িয়া তাঁহার পা ছেঁচিয়া গিয়াছিল। তখন সরকেলমহাশয় অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া রহিলেন। সিন্দুক নীচে নামিয়া ভিতরবাড়ীর দরজায় সবলে দুম দুম শব্দে আঘাত করিল। ভিতরবাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। সিন্দুক সদরবাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে সিন্দুক আপনা আপনি সদরদ্বার অভিমুখে গমন করিতেছে। তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া আমি একটি আংটা ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সরকেলমহাশয়ের দারোয়ান রামগোপাল সিংও আসিয়া সিন্দুকের অপর পার্শ্বের আংটা ধরিয়া ফেলিল। সিন্দুক তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া দ্বারবানের পা ছেঁচিয়া দিল। সে মাটীতে পড়িয়া, 'জান গিয়া জান গিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভাগ্যে আমার পায়ে পড়ে নাই। আমার পায়ে পড়িলে আমি মারা যাইতাম। এ নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার, এইরূপ বুঝিয়া আমি আর সিন্দুক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম না।

সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া সিন্দুক গুরুভাবে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল। তিন ঘায়ে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সদরদ্বার ভাঙ্গিয়া সিন্দুক শূন্যপথে গ্রাম পার হইয়া মাঠের দিকে যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে ভয়ানক শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোক মনে করিল যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। লাঠি-সোটা লইয়া প্রতিবেশিগণ দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তখন সিন্দুক গ্রামের প্রান্তভাগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সরকেলমহাশয়ের গৃহে ও নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগের গৃহে হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি যাহা কিছু লোহার দ্রব্য ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া সন্ সন্ শব্দে শূন্যপথে সিন্দুকের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বলিলে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করিবে না, অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল।

লম্বোদর বলিলেন,—'বিশ্বাস করি না করি বলই না ছাই।'

ডমরুধর বলিলেন,—'বাঘের ছালের ভিতর প্রবেশ করিয়া যখন তোমাদের সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিয়াছিলাম, তখন তো বিশ্বাস করিয়াছিলে। তখন পুকুরে গিয়া কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়াছিলে!'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'বাঘ দেখি নাই। বাঘ বাঘ বলিয়া একটা গোল পড়িয়াছিল, তাহা শুনিয়াই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'না না,—বিশ্বাস করিব না কেন? তাহার পর কি হইল বল।'

উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণও অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। তখন ডমরুধর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমার কোমরে তখন বড় একথোলো চাবি থাকিত। কিন্তু তখন কেবল আমার দুইটি বাক্স ছিল। লোকে মনে করিবে যে, ইহার অনেক টাকা আছে, টাকা রাখিতে স্থান হয় না, তাই অনেক বাক্স করিতে হইয়াছে, ঐ চাবিগুলি সেই সব বাক্সের। দেখ লম্বোদর! সত্য সত্য লোকের টাকা না থাকুক, একটা জনরব উঠিলেই হইল যে, অমুকের অনেক টাকা আছে। কাহাকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। মুখবন্ধ গুড়ের কলসীর নিকট কত মাছি থাকে। তাহারা একফোঁটাও গুড় খাইতে পায় না, তথাপি আশেপাশে ভ্যান্ ভ্যান্ করে। সেইরূপ যদি লোকে শুনিতে পায় যে, অমুকের অনেক টাকা আছে, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোক তাহার আশেপাশে আসিয়া ভ্যান্ ভ্যান্ করে, সে হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বিশেষতঃ আমার হাই। আমার হাই তোলা দেখিলে মানুষের প্রাণ শীতল হয়। হাই তুলিয়া একবার সকলকে দেখাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সন্ন্যাসীর কালীঠাকুর

সকলে মনে করিবে যে, আমার অনেক টাকা আছে, সেইজন্য বৃহৎ চাবির থোলো সর্বদা আমি কোমরে পরিতাম। চারি-পাঁচটা ঘুনসি একত্র পাকইয়া মোটা দড়ির ন্যায় করিয়া, চাবির থোলো তাহাতে বাঁধিয়া আমি কোমরে পড়িয়াছিলাম।

যখন লোকের হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল সন্ সন্ শব্দে আইরণচেষ্টের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, তখন আমার চাবির থোলেতে টান ধরিল। সহজ অবস্থায় চাবির থোলো ঝুলিয়া থাকে, এখন সোজা সটান হইয়া লোহার সিন্দুকের পশ্চাতে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার পশ্চাৎ দিকের কোমরের মাংসে ঘুনসি বসিয়া গেল, আমার ঘোর যাতনা হইল, আমি ভাবিলাম যে, কোমর পর্য্যন্ত কাটিয়া আমার শরীর বা দুইখানা হইয়া যায়। একটু আলগা করিবার নিমিত্ত আমি চাবির থোলোটী ধরিতে যাইলাম। যেই ছুঁইয়াছি, আর আমার হাতে যেন হাজার সূচ ফুটিয়া গেল। চাবি হইতে আমি হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চাবি আমাকে মাঠের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। 'আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও' বলিয়া আমি গ্রামের লোককে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু এ 'ভূতের কাণ্ড' এইরূপ মনে করিয়া সকলে পলায়ন করিল, আপন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চাবির থোলো আমাকে মাঠের দিকে লইয়া চলিল। মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আগে অনেক দূরে তিনটী ঘোড়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, সেজন্য অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দুঠা ঘোড়ার উপর দুইজন সন্ন্যাসী চড়িয়াছে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর সেই প্রস্তরের কালীমূর্তি ও পূজার আসবাব বোঝাই আছে। তাহার পশ্চাতে প্রায় পাঁচশত হাত দূরে মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে লোহার সিন্দুক যাইতেছে। সিন্দুক হইতে প্রায় দুইশত হাত পশ্চাতে হাতা, বেড়ি, কড়া, খন্তা, দা, কুড়ুল, লৌহনির্মিত দ্রব্যসমূহ সেইরূপ শূন্যপথে যাইতেছে। তাহার প্রায় দুইশত হাত দূরে চাবির থোলো আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কাণ্ডখানা কি, তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তখন আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি, কোমর কাটিয়া শরীরটি দুইখানা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাবিবার চিন্তিবার তখন সময় ছিল না।

মাঠের উপর দিয়া প্রায় একক্রোশ পথ এই ভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর সহসা দুম করিয়া শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম যে দূরে সিন্দুকটি মাটীতে পড়িয়াছে, তাহার শব্দ। আরও নিরীক্ষণ করিলাম যে, সিন্দুকের অগ্রে গোড়া তিনটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সন্ন্যাসী দুইজন ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছে, আর তৃতীয় ঘোড়া হইতে কালীর প্রতিমাটিও নামাইয়া নীচে মাটীর উপর সিংহাসনে রাখিয়াছে।

সিন্দুকটি যেই মাটীতে পড়িল, আর তাহার পরক্ষণেই হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল প্রভৃতি ঝুপঝাপ ঠনঠান করিয়া

মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই আমার চাবি পূর্বের ন্যায় কোমরে ঝুলিয়া পড়িল। কোমরে ঘুনসির টান আর রহিল না। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল, তখন যথানিয়মে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি সুস্থির হইলাম। সেই স্থানে আমি প্রায় একঘণ্টা পড়িয়া রহিলাম। একঘণ্টা পরে যখন আমি পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম, তখন দেখিলাম যে, দূরে সে ঘোড়াও নাই, সে সন্ন্যাসীও নাই; অনেকক্ষণ পরে অতি সাবধানে, অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যে, সন্ন্যাসী দুইজন লোহার সিন্দুকটি কোনরূপে ভাঙ্গিয়াছে অথবা খুলিয়াছে। তাহার ভিতর টাকাকড়ি, গহনা-পত্র যাহা কিছু ছিল সে সমুদয় লইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়াছড়ি হইয়া আছে। দুই চারিখানি কাগজে ষ্ট্যাম্প দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে সব দলিলপত্র। তাহাতে আমি হাত দিলাম না। অন্য একতাড়া কাগজ তুলিয়া দেখিলাম যে, সে কোম্পানীর কাগজ, তাহা আমি ফেলিয়া দিলাম। আর একতাড়া কাগজ পাইলাম, তাহা কি? লম্বোদর! সেদিন তোমাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ভাগাবান্ পুরুষ। আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। কাগজ তাড়াটি একটু খুলিয়া দেখিলাম যে, সে সব নোট! তাহার পর দৌড়! বেলা নয়টার সময় বাড়ীতে পৌঁছিয়া, তবে হাঁপ ছাড়িলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—'এ সমুদয় তোমার আজগুবি গল্প। এ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আমার সেই সময় শুনিয়াছিলাম যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ী যথার্থই চুরি হইয়াছিল এবং সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সমুদয় মিথ্যাকথা, হিংসায় লোকে কি না বলে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চুম্বকের সার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'বাড়ীতে আসিয়া নোটগুলি গণিয়া দেখিলাম যে, দুইশত দশ টাকার নোট, মোট দুই হাজার টাকা। আর ঋণের প্রয়োজন কি? সরকেলমহাশয়কে আমি এক পত্র লিখিলাম যে,—'সেদিন আপনার বাড়ীতে গিয়া ভূতের হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম। আপনার টাকায় আমার প্রয়োজন নাই।'

তাহার পর সেই টাকা দিয়া আমি সমুদয় আবাদটি উঠিত করিলাম। এখন সেই স্থানে সোনা ফলিতেছে। তাহার লাভ হইতে ক্রমে ক্রমে আমি আরও অনেক আবাদ ক্রয় করিলাম। আমি ছাই-মুঠা ধরিলে সোণা-মুঠা হইয়া যায়। সে অঞ্চলে এখন অনেক লোকের আবাদ হইয়াছে। বহুদূর পর্য্যন্ত এখন লোকের বাস হইয়াছে। নদীতে খেয়া বসিয়াছে, মাঝে মাঝে হাট বসিয়াছে। গ্রীষ্মকালে কোনও কোনও স্থানে বরফের কুলফি বিক্রয় হয়। শীতকালে হিন্দুস্থানীরা ফুলুরি ফেরি করিয়া বেড়ায়। যে সাঁওতালগণ মশা মারিতে আমার সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি জমি দিয়াছি, তাহারা আমার প্রজা হইয়াছে। তাহাদিগের দেখাদেখি আরও অনেক সাঁওতাল নিকটস্থ আবাদসমূহে বাস করিয়াছে।

এখন আমার কিরূপ সম্পত্তি হইয়াছে, কিরূপ জনসাধারণের নিকট আমি গণ্যমান্য হইয়াছি, তাহা তোমরা অবগত আছ। শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু সম্বন্ধে আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। মালতীকে আপনা হইতে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিজে, তাঁহার পুত্রগণ, তাঁহার ভগিনী কতবার যে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। এখন মালতী জীবিত নাই। এখন অবশ্য তাঁহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। শুনিয়াছি যে, এখন সংসারে তাঁহাদের আর কেহ নাই। দেশে গিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে সে সংসার মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে।'

লম্বোদর বলিলেন,—'অনেক কথা তো শুনিলাম। তুমি বলিলে যে, সরকেলমহাশয়ের বাড়ী চুরি হয় নাই, আর সে চোরগণকে তুমি দ্বার খুলিয়া দাও নাই। তবে সন্ন্যাসী দুইজন কি করিয়াছিল যে, লোহার সিন্দুক ও অন্যান্য লোহা-লক্কড়ে টান ধরিয়াছিল?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন যে,—'আমি যখন কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম, তখন কোনও কোনও দিন সন্ধ্যার পর সে স্থানে পুঁথি পড়া হইত। মহাভারত রামায়ণের পর একজন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন।

তাহাতে এক রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছিলাম। জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে তিনি দেশ-বিদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে ঝড়ে তাড়িত হইয়া তাঁহার জাহাজ এক কৃষ্ণবর্ণের পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। জাহাজের যত পেরেক ছিল, সব খুলিয়া সেই পর্বতে গিয়া লাগিল। জাহাজ জলমগ্ন হইল। আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসীদের যে বৃহৎ কালীমূর্তি ছিল, তাহা চুম্বক পাথরে গঠিত। কিন্তু সে সামান্য চুম্বক পাথর নহে; চোলাই করা চুম্বক পাথরের সার। সিংহাসনটি এরূপ পদার্থে গঠিত, যাহা ভেদ করিয়া চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণশক্তি দূরে যাইতে পারে না। প্রথম কয়দিন সন্ন্যাসী দুইজন দেবীকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিল। সে নিমিত্ত সে কয়দিন লৌহদ্রব্যে টান ধরে নাই। শেষদিন গভীর রাত্রিতে তাহারা দেবীকে সিংহাসন হইতে নিম্নে রাখিয়াছিল, আর সেই সময় নিকটস্থ লৌহনির্মিত দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে রাত্রিতে প্রথম আমি দেখিয়াছিলাম যে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর বলদের ছালার ন্যায় তাহারা দুইদিকে দুই প্রকার বোঝা রাখিয়াছিল। বোধ হয়, একদিকে প্রতিমা, অপর দিকে সিংহাসন ও পূজার সামগ্রী রাখিয়াছিল। সিংহাসন হইতে মূর্তি পৃথক ছিল, সেজন্য তখনও লোহার দ্রব্যে টান ছিল; তাহার পর মাঠে প্রতিমা নামাইয়া সেই সিংহাসনে বসাইয়াছিল, আর প্রতিমার আকর্ষণশক্তি লোপ হইয়াছিল। তাহার পর সিংহাসনের উপর মূর্তি রাখিয়া ঘোড়ার উপর সেইভাবে বোঝাই দিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। আমার বোধ হয় লৌহদ্রব্যসমূহ এই কারণে শূন্যপথে ভ্রমণ করিয়াছিল।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'তুমি যে গল্পটি করিলে, উহার কোনও প্রমাণ আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'প্রমাণ নাই? নিশ্চয় আছে। সে চাবির থোলা এখনও আমার ঘরে আছে। বল তো এখনি আনিয়া দেখাই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ : কুম্ভীর-বিভ্রাট

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে নদীনালায় অনেক কুমীর আছে। তোমার আবাদে কুমীর কিরূপ?'

ডমরুধর বলিলেন,— 'কুমীর! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমীরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মত নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা, বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ সব কুমীরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্বতে কালনিমের পুকুরে যে কুমীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পীঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে ঐ কুমীর একগালে খাইতে পারে। পর্বতপ্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সে গজ-কচ্ছপকে এ কুমীর নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত, অন্যান্য কুমীর জীব-জন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমীরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল, তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে, কুমীরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক পায় না। কুমীর যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল, —চিরকাল আমি কপালে পুরুষ; যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া এই গহনাগুলি বাহির করিব,

অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে, সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুণ মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুণের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নঙ্গরটিকে আমি বঁড়শী করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসূতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হাতসূতার ন্যায় হইল। নঙ্গরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্যদিক্ এক গাছে পাক দিয়া রাখিলাম, তাহার পর পঞ্চাশ জন সবল লোককে নিকটে লুক্কায়িত রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

বঁড়শীতে মহিষের বাছুর বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই, নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে, নঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমীর গিলিয়াছে, বঁড়শীর ন্যায় নঙ্গর কুমীরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমীরের বলে এই পঞ্চাশ জন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমীরকে বঁড়শীতে গাঁথিয়াছি, এ কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমীর সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখনও আমাদের ভয় হইল যে, তাহার বিপুল বলে নঙ্গর বা ভাঙ্গিয়া যায়, কখনও ভয় হইল যে, সে জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়। কখনও ভয় হইল, গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া বা পড়ে। নিশ্চয় একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিত, যদি না সাঁওতালগণ কুমীরের মস্তকে ক্রমাগত তীরবর্ষণ করিত, যদি না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমীরের মাথায় গুলী মারিত। তীর ও গুলী খাইয়া কুমীর মাঝে মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিঃশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোক তীর ও গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কুমীরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্যান্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমীরের সহিত আমাদের এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতি কষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমীরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে করাত আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

ডমরুধর বলিলেন,—'বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতাল মাগী, চারদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুণের ঝুড়িটি সে উপুর করিয়াছে, সেই বেগুণগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুণ বেচিতেছে।'

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুণ বেচিতেছিল?'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ ভাই! কুমীরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুণ বেচিতেছিল।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাহাকে সে বেগুণ বেচিতেছিল? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা?'

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—"তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুণ বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—'মাগী! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমীর ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।' কেঁউ মেউ করিয়া মাগী আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জ্ঞাতি-ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠিসোটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ সে মাগীকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।"

লম্বোদর বলিলেন,—'এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি?'

ডমরুধর বলিলেন,—'এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে, আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ কুমীরের গল্প যে সত্য, তাহার কোনও প্রমাণ আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কুমীর যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন? ঠিক অন্য কুমীরের দাঁতের মত কেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।'

তৃতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : নন্দীর ক্রোধ

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে ডমরুধর, তাঁহার পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন।

ডমরুধর বলিলেন,—'কলিকাতায় একবার এক খোলার ঘরের আগড়ের উপর একখানি কাগজ দেখিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—ভাগ্যগণনা ⁄ এক আনা।'

গণৎকারের নিকট আমি গমন করিলাম। অনেক কচলা-কচলি করিয়া শেষে এক পয়সায় রফা হইল। দৈবজ্ঞ হাত দেখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমার একবার হাই উঠিল। তোমরা আমার হাই অনেকবার দেখিয়াছ।

প্রথম হইতেই আমার রূপ দেখিয়া গণৎকার মোহিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত যখন দর কসাকসি করি, তখন তাঁহার মন আরও প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখন আমার হাই দেখিয়া তিনি একেবারে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অধিক আর গণিতে-গাঁথিতে হইল না। হাতটি ধরিয়াই তিনি বলিলেন,—'মহাশয় মনুষ্য নহেন। মহাশয় কার্ত্তিকেয়, যাঁহাকে ষড়ানন বলে, মা দুর্গার কনিষ্ঠ পুত্র। অবতার হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমার প্রতি কি কোনরূপ অভিশাপ হইয়াছিল?'

দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন,—'না, তাহা নহে। বিবাহ করিবার নিমিত্ত একদিন আপনি মায়ের নিকট আব্দার করিয়াছিলেন। ভগবতী বলিলেন,—বাছা, এ দেবলোকে তোমাকে কেহ কন্যা প্রদান করিবে না। যদি বিবাহ করিতে সাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীতে গিয়া অবতীর্ণ হও।'

দৈবজ্ঞ আরও বলিলেন,—'পৃথিবীতে আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু একটু সাবধানে থাকিবেন। মা দশভূজা আপনাকে ভালবাসেন, সেজন্য আপনার প্রতি নন্দীর একটু ঈর্ষা আছে। ছল পাইলে সে আপনাকে দুঃখ দিবে।'

দেখ লম্বোদর, ঐ যে ময়ূরের উপর যিনি বসিয়া আছেন, উনি আর কেহ নহেন, উনি আমি স্বয়ং। অবতার হইলে দেবতারা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন, আমিও সেই জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া আছি। আর তোমরাও আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছ না।

লম্বোদর বলিলেন,—'হাঁ, কার্ত্তিকের মত তোমার রূপ বটে!'

ডমরুধর বলিলেন,—'ঠাট্টা কর, আর যাই কর। গণৎকার যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক। নন্দীর কোপে পড়িয়া কয়মাস যে আমি ঘোরতর কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা তো আর মিথ্যা নহে?'

লম্বোদর বলিলেন,—'আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্প হইবে?'

ডমরুধর রাগিয়া বলিলেন,—'তোমার যদি শুনতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কানে আঙ্গুল দিয়া থাক।'

তাহার পর পাঁচজনের অনুরোধে ডমরুধর এইরূপে গল্পটি বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর নবমী পূজার দিন। রাত্রি শেষ হইয়াছে। বাহির বাড়ীতে কিরূপ একটা খুটখাট শব্দ হইতে লাগিল। দু'পয়সা আমার সঙ্গতি আছে। কাজেই আমাকে সর্বদা সতর্ক ও শঙ্কিত থাকিতে হয়। আমি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখি যে দালানের প্রতিমার সম্মুখে একটা বিকটাকার মর্দ পূজার সমুদয় দ্রব্যাদি লইয়া গাঠরি বাঁধিতেছে। পূজার সমুদয় উপকরণ যাহা তখন দালানে ছিল, মায় বেশ্যাবাড়ীর মৃত্তিকাটুকু পর্য্যন্ত, সমস্ত দ্রব্য সে বাঁধিয়া লইতেছে। তাহার নিকটে একটা ত্রিশূল পড়িয়া ছিল। বুঁচকি বাঁধিয়া ত্রিশূলের আগায় আটকাইয়া সে কাঁধে তুলিবার উপক্রম করিল।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অবতার হইলে দেবতাদের আত্মবিস্মৃতি হয়। আমি যে ভগবতীর পুত্র কার্ত্তিক, রাগের ধমকে সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাইলাম। সেই লোকটাকে গালি দিয়া আমি বলিলাম,—'বদমায়েস চোর! পূজার দ্রব্য চুরি করিতেছিস।'

সে লোকটা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। পোঁটলার একদিক ধরিয়া আমি টানিতে লাগিলাম। ঈষৎ হাসিয়া পোঁটলার অপর দিক ধরিয়া সে টানিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—'পোঁটলা ছাড়িয়া দে।' সে উত্তর করিল,—'দিয়া নিলে কি হয় তা জান? কালীঘাটের কুকুর হয়।' আমি বলিলাম,—' কবে তোকে এ সব জিনিষ আমি দিয়াছি?'

দুইজনে বিষম টানাটানি চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বল অধিক, তাহার সহিত আমি পারিলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাহার হাতে এক কামড় মারিলাম।

সে লোকটি বলিল,—'ছি! তোমার এখনও দুষ্টুমি যায় নাই। দেবতারা পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন না। ইন্দ্র শূকর হইয়া ছানা-পোনা লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রকে অনেক কৌশল করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রদিগের পদভরে মেদিনী টলটলায়মানা হইয়াছিল। আমার বাবাঠাকুরও অতি কষ্টে কোঁচিনীদিগের ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়াছিলেন। সেজন্য কোঁচিনী ছুঁড়িরা টিটকারি দিয়া বলিয়াছিল,—

দুই শরা জল ছেঁচিয়া কোমরে দিলে হাত।
এমনি করিয়া খাবে তুমি কোঁচিনী পাড়ার ভাত?

কৈলাসে মা আমার কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে বাবাকে আমরা পুনরায় স্বস্থানে লইয়া গিয়াছিলাম। দাদাঠাকুর, তোমাকেও একটু কষ্ট দিতে হইবে, তবে তোমার বিবাহের সাধ মিটিবে। সেজন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি,—ছয় মাস কাল তুমি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবে। ছয় মাস কাল তুমি নানা বিপদে পতিত হইবে। তুমি যেমন ফোকলা মুখে আমার হাতে কামড় মারিলে, সেইরূপ আর একজনের হাতে কামড় মারিয়া তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : টাকে ঠোকর

এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। যে বুদ্ধির দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলাম, সেই দেববুদ্ধি আমার লোপ হইয়া গেল। আমি ঠিক মনুষ্যের মত নিমেষপূর্ণ নয়নে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া পড়িলাম।

লম্বোদর প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'বলিব কি ভাই আর আশ্চর্য্য কথা! আমি দেখিলাম যে, স্বয়ং মহাদেব গণেশের হাত ধরিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার স্কন্ধে কিন্তু কার্ত্তিক নাই। কি করিয়া শিব কার্ত্তিককে লইবেন? ডমরুরূপে এইমাত্র কার্ত্তিক নন্দীর সহিত পোঁটলা কাড়াকাড়ি করিতেছিলেন। পশ্চাতে দেবী ছলছল নয়নে দণ্ডায়মানা আছেন। উঠানে সজ্জিত দোলা রহিয়াছে। উড়ে ভূতগণ দোলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—নন্দী কৌঠি গলা, দেব হউচি ঠিকে জলদি কর। ইত্যাদি।

দেবী মহাদেবের কানে চুপি চুপি কি বলিলেন। কি বলিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে আরও অনেক দিন রাখিয়া শিক্ষা দিতে তাঁহারা পরামর্শ করিলেন। দুরন্ত বালককে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা-পিতাকে কঠিন হইতে হয়।

আমি এখন সকল কথা বুঝিলাম, গত বৎসর নবমী পূজার দিন ৫৮ দণ্ড নবমী ছিল। দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে দশমী পড়িয়াছিল; সেই শুভক্ষণে মা কৈলাস পর্বতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। গত বৎসর মা দোলায় গমন করিয়াছিলেন। সেজন্য মহামারী হইয়াছিল। উঠানে দোলা রাখিয়া উড়ে বেহারা ভূতগণ সেই জন্য কিচিব-মিচির করিতেছিল।

প্রথম আমি নন্দীদাদার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তখন অবশ্য নন্দীদাদা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করি নাই। তিনি বলিলেন,—'একথাবা থুতু তুমি আমার হাতে দিয়াছ, তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না।'

তাহার পর শিবের পায়ে পড়িয়া আমি স্তব করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন,—'নন্দীর শাপ আমি মোচন করিতে পারি না। অন্য বর প্রার্থনা কর।'

কি বর প্রার্থনা করিব, তখন আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি বলিলাম,—'ভগবান! যদি বর দিবেন, তাহা হইলে আপনার একটি ভূত আমাকে প্রদান করুন।'

হাসিয়া শিব বলিলেন,—'ছোটখাটো ভাল মানুষ একটি ভূত তোমার নিকট আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহাকে তুমি অধিক দিন রাখিতে পারিবে না।'

তাহার পর দেবীর পাদপদ্মে পড়িয়া আমি স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—'ডমরুধর! তুমি আমার পরম ভক্ত। সেজন্য সশরীরে তোমার পূজা গ্রহণ করিতে আমরা আসিয়াছিলাম। এ বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র লোক আমার পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অনেকে মুর্গি ভক্ষণ করে। সেজন্য তাহাদের পূজা আমি গ্রহণ করি না।

তোমার মাথার মাঝখানে যদি টাক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি টিকি রাখিতে। দেখ, আগামী বৎসরে তুমি অতি সংক্ষেপে আমার পূজা করিবে। এত দ্রব্যাদি দিলে নন্দী বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।

পুনরায় আমি ফাঁপরে পড়িলাম। কি চাহিব, তাহা খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি বলিলাম,—'মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি, ভেড়ার পালের ন্যায় বাঙ্গালার লোক যেন টাকা প্রদান করে, আমি এই বর প্রার্থনা করি।'

দেবী বলিলেন,—'কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারবৃত হিমাচলে কস্তুরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?'

আমি বলিলাম,—'যে কাজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙ্গালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙ্গালী টাকা প্রদান করে।'

দেবীর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নন্দী তাহার দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলের উল্টা পিঠের গাঁট দিয়া আমার মাথায় টাকের উপর তিনটী ঠোকর মারিল। সেই ঠোকরের আগাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

ডমরুধরের দালানে চতুর্ভুজ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন। লম্বোদর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, চতুর্ভুজ! তুমি তো বি-এ পাস করিয়াছ, অনেক লেখা পড়া শিখিয়াছ। ডমরুধর শিব ও দুর্গার স্তবের কথা বলিলেন। তুমি একটা স্তোত্র বল দেখি, শুনি।'

চতুর্ভুজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—'শিব-দুর্গার স্তোত্র এই, ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপনায় স্বাহা। ওঁ অপনায় স্বাহা।'

পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন,—'ও স্তোত্র নহে।'

তাহার পর তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন,—'প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরাভরণম। রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণামামি শিবং শিব কল্পতরুম।। ইত্যাদি। পুনরায়

'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে। নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।' ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—' কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্য হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, মহাদেব নাই, দুর্গা নাই, নন্দী নাই, দোলা নাই, সে স্থানে কেহই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! আছে কেবল আর একটি 'আমি।' সেই টাক, সেই পাকা চুল, সেই কৃষ্ণ বর্ণ, সেই নাক, সেই মুখ, ফলকথা—হুবহু সেই আমি। প্রতিমার একপার্শ্বে একটি আমি বসিয়া আছি, প্রতিমার অপরপার্শ্বে আর একটি আমি বসিয়া আছে, কোন আমিটি প্রকৃত আমি, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। একদিকের আমি অন্য দিকের আমিকে জিজ্ঞাসা করিল,— 'মহাশয়ের নাম?' সে উত্তর করিল,—'ডমরুধর।' পুনরায় অপর আমি এ দিকের আমিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সে-ও সেইরূপ উত্তর করিল, ফলকথা, এ আমিও যা করে ও যা বলে, ও আমিও তাই করে ও তাই বলে।

তখন আমার সকল কথা হৃদয়ঙ্গম হইল। সেবার সন্ন্যাসী-সঙ্কটে আমার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়া যমালয়ে গিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, আমার শরীর অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ প্রভৃতি কয়েকটি কোষ দ্বারা গঠিত। একবার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়াছিল বলিয়া কোষগুলির বাঁধন কিছু আলগা হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য দুই একটী কোষ বাহির হইয়া আর একটি ডমরুধরের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন উপায় কি? লোকে একটা আমির ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না। তা যোগাইবার যেন আমার সঙ্গতি আছে, কিন্তু একটা আমির পেট কামড়াইলে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, একসঙ্গে দুইটা আমির পেট যদি কামড়ায়, তখন আমি কি করিব?

একটা আমি অপরটাকে বলিল,—'তুই চলিয়া যা, আমি প্রকৃত ডমরুধর, তুই জাল ডমরুধর।' অপরটাও সেই

সেই কথা বলিল। দুই আমিতে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় প্রভাত হইল! প্রভাত হইবামাত্র আমি একটা হইয়া যাইলাম। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল।

পাছে পুনরায় দুইটা হইয়া যাই, সেই দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন আমি মগ্ন রহিলাম। বিজয়া দশমীর পূজার পর পুরোহিতঠাকুর যখন আমাকে মন্ত্র পড়াইলেন,—আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভবতি দেহি মে,—তখন আমার সুবল ঘোষের কথা মনে পড়িল। দুর্গোৎসব করিয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া সুবল নিজেই ঠাকুরের সম্মুখে প্রাণপণ যতনে শঙ্খ বাজাইলেন। শঙ্খ বাজাইতে গিয়া সুবলের গোগগোল বাহির হইয়া পড়িল। সেজন্য দশমীর দিন সুবল অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া, হাতযোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না মা, যশ চাই না মা,
চাই না পুত্তুর বর।
শঙ্খ বাজাতে গিয়া বেরিয়েছে গোগগোল,
তাই রক্ষা কর।।

প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আমি এক সহস্র দুর্গানাম লিখিলাম। পাড়ার ছেলেরা আমাকে নমস্কার করিয়া গেল। আহারাদি করিয়া যথাসময়ে দোতালায় আমার ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। সিদ্ধি খাইয়া শরীর একটু গরম হইয়াছিল। সেজন্য আমার নিদ্রা হইল না। বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর বাহিরে বাগানে আমার জানালার নীচে ও কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? সেই আর একটা আমি! হাত নাড়িয়া তাহাকে আমি বলিলাম,— 'যা, চলিয়া যা।' নীচের আমিও উপরের আমিকে সেই কথা বলিল। উপরের আমি নীচে নামিলাম। খিড়কিদ্বার খুলিয়া আমি বাগানে যাইলাম। ও মা! দেখি না নীচের আমিটা উপরে গিয়া ঠিক আমার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। এ আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, ও আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, কতবার যে এইরূপ হইল, তাহা বলিতে পারি না। তৃতীয় পক্ষে এলোকেশীর সহিত আমার কি প্রকারে বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর সে কথা তোমাদের নিকট বলিয়াছি। আমি এলোকেশীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,— 'এইমাত্র যখন আমি নীচে গিয়াছিলাম, তখন তোমার ঘরে আর একটা কে আসিয়াছিল।' এলোকেশী বলিল,— 'মুখপোড়া, বুড়ো ডেকরা! এখনি ঝাঁটাপেটা করিব।' এলোকেশীর স্বভাবটা কিছু উগ্র। তাহাতে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

জানলা বন্ধ করিয়া আমি পুনরায় শয়ন করিলাম। পরদিন রাত্রিতেও সেইরূপ হইল। প্রতি রাত্রিতে সেইরূপ উপরে একটা, নীচে একটা, দুইটা আমির উপদ্রব হইল। আমি ভাবিলাম যে, প্রতি রাত্রিতে আমার 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম' হইতে লাগিল, এ তো ভাল কথা নহে!

চতুর্ভুজ বলিলেন,—'এবার আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমি জানি—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।।'

পুরোহিত বলিলেন,—'সকল প্রাণীর সৌন্দর্য্য লইয়া ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কার্ত্তিকের কাঁধে বাঘ

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—দুইটা আমির উপদ্রবে আমি জ্বালাতন হইলাম। দিনকতক সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়া বাস করি, এইরূপ মনন করিয়া আমি সুন্দরবনে আবাদে গমন করিলাম। এই সময় সেই স্থানে এক বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল। গরু বাছুর মানুষ খাইয়া সকলকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিল। মন্ত্রবলে বাঘের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত একদিন বৈকাল বেলা আমি এক ফকিরের নিকট গমন করিতেছিলাম। পথে নানাস্থানে শুষ্ক ঘাস ও বৃক্ষপত্র

পড়িয়াছিল। একস্থানে শুষ্কপত্রের ভিতর ছিদ্রের ন্যায় কি একটা দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইবামাত্র হুস করিয়া আমি এক গভীর গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া যাইলাম। সর্বনাশ! দেখি না, সেই গর্ত্তের ভিতর প্রকাণ্ড এক কেঁদো বাঘ রহিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথা আমি বুঝিতে পারিলাম। বাঘ ধরিবার নিমিত্ত ধাঙ্গড় রেওতাগণ গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর পাতানাতা চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। বাঘ সেই গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল। আর উঠিতে পারিতেছিল না। আমিও সেই গর্ত্তে পড়িয়া যাইলাম।

গর্ত্তে পড়িয়া ব্যাঘ্রের বিকট বদন দর্শন করিয়া আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম যে, ক্ষুধার্ত্ত বাঘ এইবার আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। প্রাণ ভরিয়া আমি মাকে ডাকিতে লাগিলাম। করাতি কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ ছটফট করে, প্রাণভয়ে গর্ত্তের ভিতর আমি সেইরূপ ছটফট করিতে লাগিলাম। বলিব কি ভাই, আমার উপর মা দুর্গার কৃপা! এক আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাকে রক্ষা করিলেন। আমি যেরূপ ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, ব্যাঘ্রও সেইরূপ ফাঁদে পড়িয়াছিল। ফাঁদে পড়িয়া আমার যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ ভয় হইয়াছিল। আমাকে ভক্ষণ না করিয়া, এক লম্ফ দিয়া সে আমার কাঁধের উপর উঠিল। আমার কাঁধে চড়িয়া যখন সে কতকটা উচ্চ হইল, তখন আর এক লাফে সে গর্ত্তের উপর দিয়া উঠিল। তাহার পর বনে পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার পর ধাঙ্গড়েরা আসিয়া গর্ত্তের ভিতর হইতে আমাকে উঠাইল। তাহাদের সঙ্গে আমি বাসায় গমন করিলাম। আমি তখনও বাহিরে, কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, আর একটা 'আমি' বাসার ভিতর গট হইয়া বসিয়া আছি। আবার বাহিরে একটা আমি, ভিতরে একটা আমি। আবার 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।'

বনবাসী হইয়াও আমি সে উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না। তবে আর এ স্থানে থাকিয়া কি হইবে? তাহা ছাড়া আর একটা 'আমি' সহসা যদি এই বনে আসিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার গৃহেও থাকিতে পারে। সে স্থানে সে 'আমিটা' কি করিতেছি না করিতেছি, তাহার ঠিক কি? সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমি মানস করিলাম।

সুন্দরবন হইতে আমাদের বাড়ী আসিতে হইলে অনেক দূর নৌকায় আসিতে হয়, তাহার পর সালতি। গ্রীষ্মকালে যে স্থানে সালতি লাগে, সে স্থান হইতে আমাদের গ্রাম পাঁচ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় সেই স্থানে আসিয়া আমার সালতি লাগিল। বাকী পাঁচ ক্রোশ পথ আমি হাঁটিয়া চলিলাম। ভেড়িতে একজনেরা মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের নিকট হইতে একটি ভেটকি মাছ চাহিয়া লইলাম.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত

ভেটকি মাছটা হাতে লইয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। সকলেই জানে যে, মাছ দেখিলে ভূতের লোভ হয়। দুই ক্রোশ পথ গিয়াছি, রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। এমন সময় একটি ভূত আমার সঙ্গ লইল। 'দেঁনা, দেঁনা,' 'মাছ দেঁনা' বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, আমার বিলক্ষণ ভয় হইল। কিন্তু ভূতকে মাছ দিলে আর রক্ষা নাই। তৎক্ষণাৎ সে মানুষের প্রাণবধ করে। সেজন্য তাহার কথা আমি শুনিলাম না, তাহাকে আমি মাছ দিলাম না। কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় আর একটা ভূত আসিয়া জুটিল। একটা আমার ডানদিকে, আর একটা আমার বামদিকে, আমার দুইপাশে দুইটা ভূত, হাত পাতিয়া 'দেঁনা, দেঁনা' বলিতে বলিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে আমি মাছ দিলাম না। অবশেষে তাহারা আর লোভ সামলাইতে পারিল না। মাছের মাথার দিক কানকোতে হাত দিয়া আমি ধরিয়াছিলাম, মাছের উপর দিক তাহারা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। অপর দিক ধরিয়া তাহারা মাছটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। আমি মাছের কানকো ধরিয়া, তাহারা মাছের লেজার দিক ধরিয়া; সেই মাঠের মাঝখানে ঘোরতর টানাটানি হইতে লাগিল। কিন্তু আমি একা, ভূত হইল দুইজন। দুইজনের সঙ্গে আমি কতক্ষণ টানাটানি করিতে পারি? ক্রমে আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন নিরুপায় হইয়া একটা ভূতের হাতে আমি কামড় মারিলাম। বলিব কি হে, ভূতের হাতের কথা। ঠিক যেন কাঠের উপর কামড় মারিলাম। তাহার পর দুর্গন্ধ। সেইরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ মানুষের নাকে কখনও প্রবেশ করে নাই।

আমার দাঁত নাই সত্য, কিন্তু সেই ফোকলা মুখের এক কামড়েই ভূত দুইটি পলায়ন করিল। তখন আমার মুখে দুর্গন্ধ! দুর্গন্ধে আমি ক্রমাগত উদ্গার করিতে লাগিলাম। সেইখানে বসিয়া ন্যাকার ন্যাকার ন্যাকার: মনে হইল পেটের নাড়িভুঁড়ি বুঝি বাহির হইয়া গেল। নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি সেই স্থানে চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম ও নন্দীর অভিশাপের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কে যেন আমার মাথায় ও মুখে জল দিতেছে এইরূপ বোধ হইল। তাহাতে শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম,—'কি আশ্চর্য্য, এ আবার কি? দেখিলাম যে, ছোটখাটো একটি নূতন ভূত আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ ভূতটি কিছুদূরে পলায়ন করিল। আমার মাছটি সে চুরি করে নাই। মাছটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল। মাছটি লইয়া ধীরে ধীরে আমি আমাদের গ্রাম অভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

নূতন ভূতটি দূরে দূরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। সে আমার নিকট হইতে মাছ চাহিল না। কোনও কথাই বলিল না। দেখিলাম, সে অতি ভালমানুষ ভূত। আরও দেখিলাম যে, অতি ভীত স্বভাবের ভূত: একবার আমি কাসিলাম, আর অমনি সে ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। একবার আমি হাঁচিলাম, আর অমনি সে পলায়ন করিল। একবার একখানি গ্রামে কুকুর ডাকিয়া উঠিল, অমনি সে গ্রাম হইতে অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে একবারে আমাকে ছাড়িয়া গেল না। ভয় পাইয়া একবার পলায়ন করে, তাহার পর পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ভীরু স্বভাবের ভূত কখনও দেখি নাই। তখন আমি বুঝিলাম, মহাদেব যে আমাকে একটি ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত দিবেন বলিয়াছিলেন, এটী সেই ভূত।

অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম,—'দেখ ভালমানুষ ভূত! তুমি আমার উপকার করিয়াছ, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। আমার সহিত তুমি চল দুইখানা ভাজামাছ তোমাকে আমি প্রদান করিব।

ঘরে গিয়া এলোকেশীকে আমি মাছটি দিলাম: রান্নাঘরে এলোকেশী মাছ ভাজিতে লাগিল। কতকগুলি মাছ যেই ভাজা হইয়াছে, আর রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ভূতটি হাত বাড়াইল। তাহার হাতে চারিখানি মাছ দিলাম, আর তাহাকে আমি বলিলাম,—'পুনরায় কাল এস, তোমাকে ভাল মাছ দিব।'

পরদিন বৈকালবেলা খুদিরাম মণ্ডলের পুষ্করিণীতে চুপি চুপি হাতসূতা ফেলিয়া একটি রুইমাছ ধরিলাম। সন্ধ্যার সময় মাছটি আনিয়া এলোকেশীকে দিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমি নিজের পুকুরের মাছ খরচ করি না, তাহা আমি বিক্রয় করি। সন্ধ্যাব পর এলোকেশী যখন মাছ ভাজিতেছিল, তখন আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। আমার সাড়া পাইয়া ভূতটি ঘুলঘুলি দিয়া হাত বাড়াইল। তাহার হাতে আমি মাছ দিলাম। এইরূপ প্রতিদিন খুদিরামের পুকুর হইতে গোপনে মাছ ধরিয়া ভূতটিকে আমি খাইতে দিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : এলোকেশীর রূপমাধুরী

একদিন এলোকেশী সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মাছ ভাজিবার সময়, পতিদিন তুমি বান্নাঘরে এস কেন? দিনেব বেলা না আনিযা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পুকুর হইতে তুমি মাছ লইয়া এস কেন? ঘুলঘুলির নিকট গিয়া কাহার সহিত তুমি চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কর? দুর্লভীকে মাছ দাও বুঝি?'

দুর্লভী বাগ্‌দিনীকে তোমরা সকলেই জান। হাসিতে হাসিতে একদিন তাহাকে দুই একটা তামাসা করিযাছিলাম। আমি এমন কার্ত্তিক পুরুষ: সেজন্য আমার স্ত্রীর মনে সর্বদা সন্দেহ।

আমি বলিলাম,—'এলোকেশী! ও দুর্লভী নয়। আবাদ হইতে এবার আমি একটি ভূত আনিয়াছি। আমি মনে করিয়াছি যে, ভূতটি ভালরূপে পোয মানিলে উহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব। যাহারা ঘোড়ার নাচ করে, তাহাদিগেব নিকট ভূতটি বিক্রয় করিব। অনেক টাকা পাইব। কিন্তু এ ভূতটি বড় ভীরু ভূত। তুমি ঘুলঘুলির নিকট যাইও না। তোমার চেহারা দেখিলে সে ভয়ে পলাইবে।' গত বৎসর সন্ন্যাসীসঙ্কটের গল্প বলিবার সময় আমি এলোকেশীব রূপের পরিচয় দিয়াছিলাম। আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই, তা না হ'লে এলোকেশীকে দেখিলে ভীমসেনও বোধহয় আতঙ্কে পলায়ন করেন।

এলোকেশীর মুখ হাঁড়ি হইল। মাছ ভাজিতে লাগিল, আর গজর গজর করিয়া বলিতে লাগিল,—'আমার রূপ দেখিলে ভূত ভয়ে পলাইবে! আমার রূপ দেখিলে ভূত পলাইবে! বটে!'

পরদিন সন্ধ্যার সময় নবাই ঘোষের পুষ্করিণী হইতে বড় একটা মিরগেল মাছ ধরিয়া আমি এলোকেশীকে দিলাম। এলোকেশী সেই মাছ যখন ভাজিতেছিল, সেই সময় যথারীতি আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। ভূতটি যথারীতি ঘুলঘুলি-পথে হাত বাড়াইল। মাছ লইয়া যেমন তাহাকে আমি দিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে গিয়া এলোকেশী বলিয়া উঠিল,—'দুর্লভি! হারামজাদি! তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।'

ভূতটি একবার মাত্র এলোকেশীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। এলোকেশীর সেই অদ্ভুত মুখশ্রী দেখিয়া আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে সে পলায়ন করিল।

'করিলে কি! করিলে কি।' এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইলাম, তৎক্ষণাৎ বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ভূতটিকে ফিরাইয়া আনিব। বাগানে গিয়া দেখিলাম যে, ভূতটি অতি দ্রুতবেগে আমার বাগানের ঈশান কোণের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। সেই স্থানে খেজুর গাছের ন্যায় এক অপূর্ব গাছ ছিল। সে গাছটিতে আমি রস কাটিতে দিতাম না, সে গাছটিকে স্বতন্ত্র ভাবে আমি ঘিরিয়া রাখিতাম। প্রাণভয়ে ভূতটি সেই গাছটির উপর উঠিল। আমি ভাবিলাম,—যাঃ! এইবার ভূতটির প্রাণ বিনষ্ট হইল। এমন আমার সখের ভূত, এইবার মারা গেল। মহাদেব হয় তো আমার উপর রাগ করিবেন।

বিস্ময়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূতের প্রাণ বিনষ্ট হইবে? খেজুর গাছের উপর উঠিয়া ভূত মারা পড়িবে। ভূত কি কখনও মারা যায়?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পুরোহিতমহাশয়! আপনি সাদাসিধে লোক, আপনি এ সব কথা বুঝিতে পারিবেন না। এ সামান্য খেজুর গাছ নহে। একস্থানে এক গাছের নিম্নে স্তূপীকৃত হাড় পড়িয়াছিল। প্রথম মনে করিলাম, মানুষের অস্থি, ব্যাঘ্রগণ বোধ হয় মানুষ ধরিয়া এই স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরও নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে সব বানরের হাড়। গাছটি দেখিলাম যে, হেঁতালও নহে, খেজুরও নহে, খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর গাছের পাতাগুলি যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুখে হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়াছিল। গাছের মাথায় কাঁদি কাঁদি সোনার বর্ণের অতি চমৎকার ফল ফলিয়াছিল। সেই ফল পাড়িতে ধাঙ্গড়কে আমি গাছের উপর উঠিতে বলিলাম। ধাঙ্গড় গাছে উঠিল; পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উঠিয়াছে, আর পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় ধাঙ্গড়ও 'প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পর ধাঙ্গড়ের চর্মাবৃত ভগ্ন হাড়গুলি নীচে পড়িতে লাগিল। তাহার পাতাগুলি পুনরায় নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে আসিয়া লাগিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ বৃক্ষ ধাঙ্গড়ের রক্ত-মাংস মায় হাড়ের রস পর্য্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।'

চতুর্ভুজ বলিলেন,—'পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাহারা পোকা-মাকড় ধরিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জীব-জন্তু ধরিয়া খায়, বানর ধরিয়া খায়, মানুষ ধরিয়া খায়, এরূপ বৃক্ষের কথা কখন শুনি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তলায় অনেকগুলি সে গাছের বীজ পড়িয়াছিল। আমি গুটিকতক বীজ আনিয়া আমার বাগানের এককোণে পুতিয়াছিলাম। তাহা হইতে একটি গাছ হইয়াছিল। সে গাছ আমি সর্বদা ঘিরিয়া রাখিতাম। কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দিতাম না। ভূত যখন সেই গাছের উপর গিয়া উঠিল, তখন আমি তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম।'

ক্রমে যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। যেই ভূত গাছের মাথার নিকট গিয়া উঠিল, আর সেই সময় পাতাগুলি সোজা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল, ভূতের সর্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিল, ভূতের কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গাছের গা দিয়া দরদর ধারায় বহিয়া পড়িল। অবশেষে ভূতের খোসাটি নিম্নে পতিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : মা তুমি কে?

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূতের খোসা। সে কিরূপ?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—ভূতের অস্থি-মাংস-রক্ত সমুদয় এই ভয়ঙ্কর গাছ চুষিয়া খাইয়াছিল। আরশোলার খোসা দেখিয়াছ? মটর-মুসুরির খোসা দেখিয়াছ? ভূতের খোসাও সেইরূপ। তবে অনেক বড়। যাহা হউক, পরদিন এই দুরন্ত গাছটিকে আমি কাটিয়া ফেলিলাম, তা না হইলে তোমাদিগকে আমি দেখাইতে পারিতাম।

সে রাত্রে এলোকেশীর সহিত আমার তুমুল ঝগড়া হইল। আমি বলিলাম যে,—'দুর্লভী দুর্লভী করিয়া করিয়া তুমি পাগল হইযাছিলে। এমন সুন্দর ভূতটিকে তুমি তাড়াইলে, ভূতঘ্ন পাপে তুমি কলুষিত হইলে, আমার অনেক টাকা তুমি লোকসান করিলে।'

এইরূপ ঝগড়া হইতেছে, এমন সময় আমি একবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম যে, দ্বিতীয় আমি যথারীতি বাগানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাকে দেখাইয়া আমি এলোকেশীকে গঞ্জনা দিবার নিমিত্ত বলিলাম,—'তুমি দুর্লভী দুর্লভী বল, দেখ দেখি ঐ নীচেতে কে? তোমারও যে—ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।'

এই কথা বলিবামাত্র এলোকেশীর সর্ব শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। নিকটে একটা মুড়া ঝাড়ু পড়িয়াছিল। তাহা লইয়া এলোকেশী আমাকে সবলে প্রহার করিতে লাগিল। আমার সর্বশরীরে যেন বিষের জ্বালা ধরিল। গায়ে খেঙ্গরা কাটি ফুটিয়া যাইতে লাগিল। 'আর নয়, আর নয়' বলিয়া আমি যত চীৎকার করি, এলোকেশী ততই আমাকে প্রহার করে। মাথার টাক হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত প্রহারের চোটে ক্ষতবিক্ষত হইল। জানালা দিয়া একবার নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সেই বাগানের আমিও ঝাঁটার আঘাতে ব্যথিত হইয়া গায়ে হাত বুলাইতেছি। তাহার পর দেখি না যে, দুই আমি একসঙ্গে ঘরের ভিতর রহিয়াছি। তাহার পর দেখি না যে, একটি আমি আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় ধোঁয়ার মত হইযা গেল। তাহার পর সেই ধূমটি সোঁৎ করিয়া আমার নাকের ভিতর প্রবেশ করিল। এতদিন আমি দুইখানা হইয়াছিলাম। আজ এলোকেশীর ঝাঁটার আঘাতে পুনরায় আমি একখানা হইলাম।

এলোকেশীর এই অমানুষিক কাজ দেখিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। প্রহারের জ্বালা আমি ভুলিয়া যাইলাম। গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে এলোকেশীর পায়ে পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মা, তুমি কে বল?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অজা-যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

আমার এইরূপ বিনয়বাক্যে এলোকেশী কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না। দ্বিগুণভাবে পুনরায় প্রহার আরম্ভ করিল। এই প্রহারে আর একটি আমার উপকার হইল। নন্দীর অভিশাপ মোচন হইয়া গেল। আমার আত্মবিস্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে ঘুচিয়া গেল। আমি কে, তখন বুঝিতে পারিলাম। যোড়হাতে তখন আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম—'মা! আমি অপরাধ করিয়াছি। বিবাহের সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে। আর ঝাঁটা-পেটা হইতে পারি না। আমাকে কৈলাস পর্বতে লইয়া চল। সেস্থানে চিরকাল আমি আইবুড়ো হইয়া থাকিব। চামুণ্ডারূপিণী এলোকেশীর সহিত আর আমি সংসারধর্ম করিতে চাই না।'

মা কোন উত্তর দিলেন না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, শৈশবকালে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্র আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন আমি তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'জননীগণ! যখন নিঃসহায় অবস্থায় শরবনে আমি পড়িয়াছিলাম, তখন তোমরা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে। দুর্দান্ত এলোকেশীর খেঙরার প্রহার আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার শরীব জরজর হইয়া গেল। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।'

আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই, তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল,—'পৃথিবীতে তোমার আরও একশত বৎসর পরমায়ু আছে। বৎস! সুখে এই স্থানে এখন থাক। আরও একশত বৎসর এলোকেশীকে লইয়া ঘরকন্না কর। তাহার পর কৈলাসে গমন করিও।'

এলোকেশী এই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার হাত চলিল না। সেজন্য সে যাত্রা আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

দেখ লম্বোদর ভায়া! মা দুর্গা কি বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে তো? অতি সংক্ষেপে তিনি আমাকে পূজা করিতে বলিলেন। এ বৎসর পূজার কোনও উপকরণ আমি ক্রয় করিব না। গণেশের ইন্দুরের কাপড়টুকু পর্যান্ত দিব না। সমুদয় গঙ্গাজল দিয়া সারিব। মায়ের আজ্ঞা! তাহা ব্যতীত আমাদের এই ঘোষেদের কাটিগঙ্গার জল অতি পবিত্র। তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে?

পুরোহিত বলিলেন,—'তোমার পূজা তাহা হইলে এ বৎসর ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঋষিশ্রাদ্ধ কিরূপ?'

পুরোহিত উত্তর করিলেন,—'অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।।' দুইটা ছাগলে বিবাদ হইলে যখন তারা আরম্ভ নয়নে শৃঙ্গ তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন বোধ হয়, এবার বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে। কিন্তু শেষে কেবলমাত্র একটি ঠুস্। ঋষিদিগের শ্রাদ্ধে বিশ জন ব্রাহ্মণে ক্রমাগত কলার খোলা কাটিতে থাকেন। মনে হয়, কত ধুমধাম না হইবে। কিন্তু ঐ খোলা কাটাই সার। এ দুর্গোৎসবেও দেখিতেছি, কেবল প্রতিমা, ঢোল ও গঙ্গাজল।'

ডমরুধর বলিলেন,—'মায়ের আজ্ঞা! ভাল মনে করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার আবাদের দুইজন ধাঙ্গড়কে তাহাদের সেই চেপটা মাদল আনিয়া পূজার সময় বাজাইতে বলিয়াছি। তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে না। দুইবেলা দুই মুঠা ভাত দিলেই হইবে। পূজার কয়দিন আমার বাড়ীতে রান্না হইবে না। পূজার কয়দিন লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমরা চালাইব। লম্বোদর ভায়া! তুমি সেই কয়দিন আমার ধাঙ্গড় দুইজনকে দুইটি করিয়া ভাত দিও। বুঝিয়াছ তো?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, কিন্তু এ পূজা তোমার না করিলে কি নয়?'

মুখ কুঞ্চিত করিয়া নাকিসুরে ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'তুমি তো বলিলে! কিন্তু পূজা যদি না করি, তাহা হইলে লোকের কাছ হইতে প্রণামীটি কি করিয়া আদায় করি?' পুরোহিত অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

কার্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্,
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্।।

চতুর্থ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের শব-সাধনা

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত। পঞ্চমীর দিন। পূর্বের মতই প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া ডমরুধর বন্ধুবর্গের সহিত গল্পগাছা করিতেছেন।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার প্রতিমায় এ বৎসর ব্যাঘ্র কেন? কার্তিকের ওরূপ বেশ কেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'ও কথা আর কেন বল ভাই! যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তা আমিই জানি।'

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছিল?'

লম্বোদর বলিলেন,—'আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্পের সূচনা হইতেছে!'

ডমরুধর বলিলেন—'তোমাদের শুনিয়া কাজ কি। আমি বলিতে চাই না।'

সকলের কৌতূহল জন্মিল। বলিবার নিমিত্ত সকলে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ডমরুধর বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসী-হাঙ্গামায় পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর আকাশে ভ্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে যমালয়ে গিয়া প্রথমে মান্য তাহার পর অমান্য হইয়াছিল। সে গল্প পূর্বে আমি বলিয়াছি। সেই অবধি সশরীরে আকাশ-ভ্রমণ করিতে আমার বড় সাধ হইয়াছিল।

যতদূর চলে, মায়ের পূজা আমি গঙ্গাজল দিয়া সারি। গঙ্গাজলে মা যত পরিতোষ লাভ করেন, এমন আর কিছুতেই নয়। বিশেষতঃ আমাদের কাটিগঙ্গার জল। কিন্তু পূজার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে আমি ঘৃত, মধু, পাঁঠা প্রভৃতি আদায় করি। তাহা আনিবার নিমিত্ত এই আশ্বিন মাসে আমি সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়াছিলাম।

একদিন বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় দুই জন ফকির পীর গোরাচাঁদের গান করিতে আসিল। গান গাহিয়া বার্ষিক পায়। এবার সে বার্ষিক আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রথম তাহারা অনেক মিনতি করিল। শেষে যখন দেখিল যে, তাহাদের বচনে আমি ভিজিবার ছেলে নই, তখন আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল—'পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র তোমাকে গ্রাস করুক।'

শুনিলাম যে, পীর গোরাচাঁদ এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র চড়িয়া সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অনেক ধন ছিল। যাহাকে তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত।

আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, সিদ্ধ হওয়া ব্যবসাটি তবে মন্দ নহে। আমিও সিদ্ধ হইব। আমি ডমরুধর; আমার অসাধ্য কি আছে?

সিদ্ধ হইবার সহজ উপায় সকলের নিকট জানিয়া লইলাম। তাহারা বলিল, গভীর রাত্রিতে শ্মশানে গিয়া মড়ার পিঠে বসিয়া জপ করিতে হয়; বাঘ ভাল্লুক ভূত প্রেত আসিয়া ভয় প্রদর্শন করে। ভয় করিলেই বিপদ্‌, না ভয় করিলে দেবী স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন। ভূত প্রেতদিগের নিমিত্ত সঙ্গে মদ ও মুড়ি-কড়াই ভাজা লইয়া যাইতে হয়।

আমি ভাবিলাম, এ তো সহজ কথা। মড়াকে আবার ভয় কি? মড়া আমি গুলিয়া খাইতে পারি! বাঘকেও আমার ভয় নাই। মন্ত্রবলে আমি বাঘের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। ভূতকেও আমার ভূত নাই। মাছ লইয়া ভূতের সঙ্গে একবার কাড়াকাড়ি করিয়াছিলাম। শেষে ভূতের হাতে কামড় মারিয়াছিলাম। আমার দাঁত নাই, তাই, দাঁত থাকিলে ভূতের হাতে এখনও ঘা থাকিত। তাহার পর একটি ভূত পুষিয়াছিলাম। এলোকেশী যদি সব পণ্ড না করিত, তাহা হইলে পোষা ভূতটি এখনও আমার কাছে থাকিত।

দুই চারি দিন পরে সে স্থানে একটি লোক মরিয়া গেল। সে মজুরি করিতে আসিয়াছিল। আপনার লোক কেহ ছিল না। তাহার মৃতদেহ লোকে গাঙে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরে খাইতে না খাইতে আমি মড়াটিকে টানিয়া উপরে তুলিলাম; তাহার পর যে স্থানে লোকে মড়া পোড়ায়, সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। এক বোতল মদ ও কিছু মুড়ি-কড়াইভাজা সংগ্রহ করিলাম।

গভীর রাত্রিতে একাকী শ্মশানে গমন করিলাম। মড়াটির মুখে মদ ও মুড়ি-কড়াইভাজা দিলাম। কুড় কুড় করিয়া খাইতে লাগিল। তাহাকে উপুড় করিয়া পিঠে বসিয়া আমি কঠোর তপ আরম্ভ করিলাম। তোমাদের ও সব জপের মন্ত্র আমি জানি না। হিড়িং বিড়িং আমি মানি না। কেবল দেবীর পাদপদ্ম আমি ধ্যান করিতে লাগিলাম।

প্রথম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। অবিরত বিদ্যুতের ঝলকে পৃথিবী ঝলসিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন বজ্রনিনাদে পৃথিবী কম্পিত হইল। আমি ভীত হইলাম না। চক্ষু বুজিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

তাহার পর বন্য মহিষ আসিল। আমার সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। আমি ভয় করিলাম না। চক্ষু মুদিত করিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ব্যাঘ্র আসিল। তাহার গভীর গর্জনে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি চক্ষু চাহিলাম না। এক মনে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ভূত প্রেত দানা দৈত্য আসিল। আমার সম্মুখে নাচিতে লাগিল। খিল্‌ খিল্‌ হাসিতে চারিদিক পূর্ণ করিল। আমি ভয় পাইলাম না, চক্ষু চাহিলাম না, কেবল বলিলাম,—'ঐ মদ মুড়ি-কড়াইভাজা আছে। খাও, খাইয়া ঘরে যাও।' তাহার পর পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের সিদ্ধিলাভ

এইরূপ কত যে বিভীষিকা হইল, সে কথা তোমাদিগকে কি আর বলিব! অবশেষে আমার পরলোকগতা মাতা

আসিলেন। তিনি বলিলেন,—'বাছা, ডমরুধর! অনেক তপ করিয়াছ, আর কাজ নাই, এখন ঘরে চল, এখানে বসিয়া থাকিলে অসুখ করিবে।' আমি কোনও উত্তর করিলাম না।

তাহার পর আমার স্ত্রী এলোকেশী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—'ঘরে চল্‌' না গেলে এখনি কান ধরিয়া লইয়া যাইব।' তোমরা সকলেই জান যে, এলোকেশীকে আমি যমের মত ভয় করি। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথম আমার হৃৎকম্প হইয়াছিল। কিন্তু আমার স্মরণ হইল যে, এ সব মিথ্যা। তখন আমি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার সে কঠোর তপ যখন কেহ কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিল না, তখন মা দুর্গা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন,—'ডমরুধর! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।'

আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, ঠিক যেমন এই প্রতিমা, দেবী সেই বেশে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন : মা দশভূজা, দক্ষিণে গণেশ ও লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী ও কার্তিক, নিম্নে সিংহ ও অসুর।

মায়ের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম। মনের উপরও যেন ছানি পড়িয়া গেল। কি বর চাহিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার দুরদৃষ্ট! তা না হইলে কাছে লক্ষ্মী ছিলেন। যদি ধন চাহিতাম, এত ধন তিনি দিতেন যে, রাখিতে ঘরে স্থান হইত না। কাছে সরস্বতী ছিলেন, যদি বিদ্যা চাহিতাম, তাহা হইলে আমিও একটা বি-এ, এম-এ পাস করা ফোচকে ছোঁড়া হইতে পারিতাম।

কিন্তু সে জ্ঞান আমার হইল না। কার্তিকের ময়ূরটি দেখিয়া আকাশ ভ্রমণের সাধ আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম,—'যদি বর দিবেই, তবে কার্তিকের ময়ূরটি আমাকে প্রদান কর! উহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশ-ভ্রমণ করিব।'

দেবী বলিলেন,—'ছি বাছা, ও কথা বলিও না। কার্তিক ছেলেমানুষ। তাহার ময়ূরটি দিলে সে কাঁদিবে।'

আমি উত্তর করিলাম,—'অন্য বর চাই না মা! নিদেন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিনের জন্য ময়ূরটিকে দাও, মা! তাহার পিঠে চড়িয়া সমস্ত দিন আকাশ-ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ময়ূর তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। যদি না দাও, তবে পুনরায় আমি এই তপে বসিলাম।'

দেবীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন,—'না বাছা! আর তপস্যা করিও না। তোমার তপে পৃথিবী তাপিত হইয়াছে। আর তপ করিলে মহাপ্রলয়ের অনল উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ভস্ম হইয়া যাইবে।'

এই কথা বলিয়া কার্ত্তিকের সহিত দেবী চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা বাছা, একদিনের জন্য কার্ত্তিক তোমাকে ময়ূরটি প্রদান করিবে। আমার সিংহের একটি বাচ্চা দিয়া কার্ত্তিককে আমি ভুলাইয়া রাখিব। কিন্তু ডমরুধর! সন্ধ্যা হইলেই ময়ূরকে তুমি ছাড়িয়া দিবে। না ছাড়িয়া দিলে, সে তোমাকে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর, দধিসমুদ্র পারে স্বাদুসমুদ্রে লইয়া ফেলিবে। সে সমুদ্রে তুমি হাবুডুবু খাইয়া মরিবে।'

এইরূপ সাবধান করিয়া দেবী আমাকে ময়ূরটি প্রদান করিলেন। কার্ত্তিককে সিংহশাবক দিলেন। সিংহের বাচ্চাটি কোলে লইয়া কার্ত্তিক কৈলাসে গমন করিলেন। প্রতিমায় যেরূপ গঠিত হয়, কার্ত্তিকের ময়ূর প্রকৃত সেরূপ নহে। সে ময়ূর কিরূপ, খড়ি দিয়া এই শানের উপর আমি তোমাদিগকে আঁকিয়া দেখাই।

ময়ূরের ছবি দেখিতে সকলে তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ছবি দেখিয়া লম্বোদর একটু হাসিলেন,—কুপিত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—'হাসিও না। এ তোমাদের পৃথিবীর ক্যাঁক-কেঁকে প্যাকম- ধরা ময়ূর নহে। এ আসল কার্ত্তিকের কৈলাসি ময়ূর।'

তাহার পর ডমরুধর পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন,—গণেশ, লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া আমি ময়ূরের পিঠে চড়িয়া বসিলাম। তাহাকে আকাশের দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলাম। ময়ূর উপরে উঠিল না। তখন দেবী হাসিয়া বলিলেন,—'মন্ত্র না পড়িলে নরলোককে লইয়া ময়ূর উপরে উঠিবে না। শূন্যে আরোহণ করিবার সময় তুমি এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে,—

জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।

তাহার পর সন্ধ্যাবেলা তোমার বাসার উপরে আসিয়া এই মন্ত্রটি বলিবে,—

জয় কৈলাসবাসিনী ত্র্যম্বকগৃহিণী ষড়াননজননী।

দ্বিতীয় মন্ত্রটি অতি সাবধানে স্মরণ করিয়া রাখিবে। বাসার উপর আসিয়া এই মন্ত্রপাঠ না করিলে ময়ূর তোমাকে সপ্তদ্বীপ সাত সমুদ্র তের নদী পারে লোকালোক পর্বতের ওধারে সূর্য্যের অগম্য তিমিরপূর্ণ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।'

আমি বলিলাম,—'মন্ত্রটি অতি সহজ। কেন মনে করিয়া রাখিতে পারিব না? তবে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গম্বুজগৃহিণী কথাটা কিছু কঠিন।'

দেবী হাসিয়া বলিলেন,—'গম্বুজগৃহিণী নহে, ত্র্যম্বকগৃহিণী।'

আমি বলিলাম,—'এইবার আমি ভাল করিয়া স্মরণ রাখিব, গম্বুজ নহে ত্র্যম্বক।'

দেখ লম্বোদর, এই স্থানে তোমাদের একটা কথা আমি বলিয়া রাখি। প্রতিমায় এই যে কার্ত্তিক সকলে করে, এ-কেলে কার্ত্তিক নহে, এ সে-কেলে কার্ত্তিক। লম্বা কোঁচা গুঁফো ধেড়ে কার্ত্তিক কি বাপু! এই কি তোমাদের ভক্তি! ছি! এখনকার কার্ত্তিক ছেলেমানুষ। মোজা ইজের কোট টুপি পরা। সিংহশাবক কোলে কার্ত্তিককে আমি এইরূপ দেখিয়াছিলাম। প্রতিমায়ও তাই করিয়াছি।

প্রতিমা সহিত দেবী অন্তর্ধান হইলেন। আমি প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিলাম,—

জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পিং মহাশয়

ময়ূর তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিল; অনেক অনেক উপরে উঠিল। রেলগাড়ী বা কি? তড়িদগতি বা কি? তাহা অপেক্ষা দ্রুতবেগে শূন্যপথে চলিতে লাগিল। চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক ধ্রুবলোক পার হইয়া গেল। কোটি কোটি যোজন পরে শেষে আমি পিঙের আকাশে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পিং! সে কি?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পিং কি? পিং এইরূপ—বলিয়া তিনি পিং-এর চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন।'

লম্বোদর বলিলেন,—'তা যেন দেখিলাম। কিন্তু পিং কে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—কি গেরো! পিং কে, তা আমি কি করিয়া জানিব? পিং আমার জাতি নয়, জ্ঞাতি নয় যে, তাহার পরিচয় আমি তোমাকে দিব। প্রাণ গেলেও আমি মিথ্যা কথা বলিব না। আমার সে স্বভাব নয়।

ছোট একখণ্ড কালো মেঘের উপর পিং বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। দেখ লম্বোদর। তোমরা আমাকে কালো কুৎসিত কদাকার বলিয়া উপহাস কর। কিন্তু পিং আমার রূপের মর্য্যাদা জানেন। আমাকে দেখিবামাত্র পিং কি বলিলেন শুন।

পিং বলিলেন,—'আহা, মহাশয়ের কি রূপ! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর হইতে খড়ি মাটীর আভা বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার উস্কোখুস্কো পালক-আবৃত কাক ভূষণ্ডীকে মনে হইল। বহুকালের প্রাচীন ছেৎলাপড়া বাঁশের ঝোড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থি-পিঞ্জর দেখা যাইতেছে। দধিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত-গহ্বরের ন্যায় আপনার দন্তশূন্য মুখগহ্বর। তাহার দুই ধারে কি দুইটি কাক বসিয়াছিল? ঐ যে ঠোঁটের দুই কোণে শুভ্রবর্ণের কি বহিয়াছে? আপনার টোল-পড়া গাল দুইটি দেখিয়া হনুমানের চড়-প্রহারিত রাবণ-মাতুল কালনেমির গণ্ডদেশ আমার স্মরণ হইল। পক্কচুল-পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত টাক দেখিয়া আমার মনে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাঁথিয়া দিয়াছেন। ফলকথা, মহাশয়কে যখন দূরে দেখিলাম, তখন মনে করিলাম যে, ময়ূরে চড়িয়া টাক-চূড়ামণি কেলে-কার্ত্তিক জগৎ আঁধার করিয়া আসিতেছেন।'

পিঙের সুমিষ্ট স্তবে প্রীতিলাভ করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমি আকাশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি। ইহার পর দেখিবার আর কি আছে?'

পিং উত্তর করিলেন,—'সমুদ্রকূলে বালুকারেণুর ন্যায় ইহার পর আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। কিন্তু ব্রহ্মার কোনও অণ্ডই আপনার দেখিবার উপযুক্ত নহে। যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে আপনি গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'অশ্বাণ্ড! সে কিরূপ? সে কোথায়?'

পিং উত্তর করিলে,—'অল্পদিন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া যম আবেদন করিলেন যে,—'বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারিব না। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্ন যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হবে। তাহাদিগকে আমি স্থান দিব না। আমার ছেলেগুলি তাহা হইলে গোল্লায় যাইবে। স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের প্রেতকেও আমি স্থান দিতে পারিব না। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়তো কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তাহার মহাপ্রভুরা এককড়া কাণাকড়িও উপুড়হস্ত করিবেন না। ইহাদের জন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে স্থান হইবে না। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন।' ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাকে এক ডিম্ব প্রসব করিতে বলিলেন। বিশ্বসংসারের ওপারে এই অণ্ড আছে। ইহাতে বিটলে স্বদেশভক্ত, ছেলে-খেকো বক্তা ও স্বদেশী প্রবঞ্চকগণের প্রেত বাস করে। মহাশয় গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।'

পিং আরও বলিলেন যে, অশ্বাণ্ডের দ্বারে এক প্রহরী আছে। প্রহরী আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার উত্তরে কি বলিতে হইবে, পিং আমাকে শিখাইয়া দিলেন।

পিঙের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রকূলে বালুকারেণুর ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পার হইয়া যাইলাম। অবশেষে বিশ্ব-সংসারের ওপারে দূর হইতে অশ্বাণ্ড দেখিতে পাইলাম। পরে নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, দ্বারে ভীষণ মূর্ত্তি প্রহরী বসিয়া আছে।

চীৎকার করিয়া প্রহরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'হু কামস দার?' (Who comes there?)

আমি উত্তর করিলাম,—'ফ্রেণ্ড।' (frient) প্রহরী বলিল,—'পাস ফ্রেণ্ড, অল ওয়েল।' (Pass friend all well)

এই বলিয়া প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিল। অশ্বাণ্ডের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। আমি দেখিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অশ্বাণ্ড ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম দিয়া গঠিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ অন্ধকার দিয়া নির্ম্মিত।

দূর দূর বহু দূর গিয়া বিটলে স্বদেশ ভক্তদিগের দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই প্রেতদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এক প্রহরী নিযুক্ত আছে। প্রহরী তাহাদিগকে বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর বন্ধ করিয়া রাখে। আমাকে দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সে বাহির করিল।

পৃথিবীতে ইহাদের শরীর নুদুর-নাদুর থাকে। এখানে ইহাদের এইরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহারা সর্বনাশ করিয়াছে। শত শত বাঙ্গালী যুবকের অন্নলাভের পথ রোধ করিয়াছে। সাধারণের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রহরী আমাকে বলিল,—''সত্বর এ স্থান হইতে আপনি প্রস্থান করুন। আপনার যে এমন অপূর্ব রূপ, ইহাদের বাতাস লাগিলে সে সব মাটী হইয়া যাইবে। আপনাকে আরও এক বিষয়ে সাবধান করি। কিছুদূরে আপনি ছেলেখেকো বক্তাদিগের প্রেতগণকে দেখিতে পাইবেন। তাহাদের বক্তৃতা যেন আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। গো অশ্ব মেষ মহিষ খর শূকর বিড়াল কুকুর ইন্দুর বাঁদরের মৃত পচিত দেহ উদ্ভূত চর্বি-সম্ভূত, অবিকৃত বিশুদ্ধ, পবিত্র, পূযরূপে বিভূষিত গলিত মড়াগন্ধে আমোদিত, ময়রা মহলে সমাদৃত সর্বত্র প্রচলিত ঘৃত সদৃশ আপনার হৃদয় কোমল। তাহাদের বক্তৃতা-উত্তাপে আপনার হৃদয় গলিয়া যাইবে। তখন আপনি যা নয়—তাই করিয়া বসিবেন।

সভয়ে এ স্থান হইতে আমি পলায়ন করিলাম। দূরে কোটি কোটি যোজন দূরে আমি এক ছেলেখেকো বক্তা দেখিতে পাইলাম। একাকী দাঁড়াইয়া ইনি বক্তৃতা করিতেছিলেন।

বক্তৃতাবলে ইনি অনেক অপোগণ্ড শিশুর ইহকাল-পরকাল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনেক সংসার ছারেখারে দিয়াছিলেন। কানে আঙ্গুল দিয়া ইহাঁর নিকট আমি গমন করিলাম। ইহাঁর অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু একখণ্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম যে পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাহারা ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট কাল ইহাঁর বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ

করিলেই কানের পোকা ধড়-ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।

এ স্থান হইতে বিদায় হইয়া আরও কোটি কোটি যোজন দূরে স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের দেশে উপস্থিত হইলাম। অনেকগুলি এই জাতীয় প্রেত দর্শন করিলাম। তাহাদের একজন পৃথিবীতে থাকিতে অনেক ব্যবসা করিয়াছিলেন, অনেক কোম্পানী খুলিয়া ছিলেন, অনেক লোকের টাকা ফাঁকি দিয়াছিলেন। অবশেষে এক বীমা-অফিস খুলিয়া মুটে-মজুরের টাকাও উদরস্থ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি হাত ও পা বাহির করিয়া এই মহাপ্রভু এক্ষণে আমাকে ধরিতে আসিলেন।

ইঁহার বীমা-অফিসে আমি অর্থ প্রদান করি,—সেই ইচ্ছায় তিনি আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব কার্য্যে আমিও একজন ঘুণ। আমি ধরা দিলাম না। সত্বর সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে আমাকে বাসায় পৌঁছিতে হইবে। তা না হইলে ময়ূর আমাকে সপ্তদ্বীপের ওপারে স্বাদুসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। সেজন্য পৃথিবীর দিকে ময়ূরকে পরিচালিত করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জিলেট জিলেকি সিলেমেল

নিম্নদিকে নামিতে নামিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমিও দুই তিনবার স্বদেশভক্ত হইয়া সভা করিয়াছিলাম, বক্তৃতা করিয়াছিলাম, স্বদেশের হিতের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর চাঁদার টাকাগুলি নিজে হাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসি-বিভ্রাটের পর আমিও এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া অনেক রাঁড়ী বালতি গরীব কেরাণীর মস্তকে হস্ত বুলাইয়াছিলাম। তবে প্রেত হইয়া আমাকেও কি ঐ অশ্বাণ্ডে গমন করিতে হইবে? কিন্তু তাহাব পর আমার স্মরণ হইল যে, যম অবগত আছেন, আমি মুরগী খাই না, একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি না। সুতরাং সেই পুণ্যবলে অনায়াসে আমি সত্য-লোক, ব্রহ্ম-লোক--যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গিয়া বাস করিতে পারিব। যদি ধর্ম্ম শিখিতে চায় তো টিকিদারেরা আমার কাছে আসুক।

হু হু শব্দে ময়ূর পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া আমি ক্রমাগত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। অবশেষে সূর্য্যমণ্ডল পার হইলাম। সে স্থান হইতে পৃথিবী দেখিলাম,—অতি ক্ষুদ্র এক নক্ষত্রের ন্যায় ঝিকমিক করিতেছে। ময়ূরের দুই পার্শ্বে আমার দুইটি পা ঝুলিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি একটা আসিয়া আমার বাম পায়ে কামড় মারিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। চকিত হইয়া আমি সেই দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যে, অতি বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গিমা করিয়া চাকার ন্যায় কি একটা গড়াইয়া গেল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, চাকার ন্যায় ওটা কি? আমার পায়ে কামড় মারিল কেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে বুঝিতে পারিলাম। আমার রূপে জগৎ আলো করিয়া শূন্যপথে আমি আসিতেছিলাম। চাকার ন্যায় ওটা রাহু। আমাকে পূর্ণিমাব চন্দ্র মনে করিয়া সে গ্রহণ লাগাইতে আসিয়াছিল। পূর্ণিমার পর প্রতিপদে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। তারপর আমি যে পূর্ণচন্দ্র তার আর প্রতিপদ হয় না। যাহা হউক, হতজ্ঞান হইযা সে আগে থাকিতে আমাকে গিলিতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে আমার গায়ে মাংস নাই, কেবল হাড়, তাই সে কামড় বসাইতে পারিল না। মুখ সিঁটকে চলিয়া গেল। রাহুর দুই চারিটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কি না তা বলিতে পারি না। আমার শরীর যদি সুস্বাদু হইত, তাহা হইলে আমার গ্রহণটী সর্বগ্রাস হইত। সাপ যেরূপ আস্তে আস্তে ভেককে ভক্ষণ করে, রাহুও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আমাকে পেটস্থ করিত। চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় আমার আর মুক্তি হইত না। চিরকাল আমাকে রাহুর—সর্বনাশ! রাহুর পেট নাই। আমাকে সর্বগ্রাস করিয়া সে গালের ভিতর এক কশে রাখিত কি কোথায় রাখিত, জানি না। কিন্তু লম্বোদর! তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতে না।

লম্বোদর বলিলেন,—'ইশ, তাই তো।'

সকলে বলিলেন,—'ইশ, তাই তো।'

ময়ূর এই ঘটনার পর নক্ষত্রবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি সমুদ্রের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দরবনের উপর আসিলাম। ময়ূর আমার বাসার দিকে ধাবিত হইল।

তখনও ভূমি হইতে প্রায় একক্রোশ উচ্চে শূন্যপথে ময়ূর উড়িতেছিল। আমি ভাবিলাম, এ স্থান হইতে আমার বাসা প্রায় আর দুই ক্রোশ আছে, বাসার ঠিক উপরে যাইলেই সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়িব। তখন ময়ূর আমাকে ধীরে ধীরে আমার বাসায় নামাইয়া দিবে।

কিন্তু সে দ্বিতীয় মন্ত্রটি কি? সর্বনাশ! আমি সে মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। মন্ত্রটি মনে করিতে না পারিলে ময়ূর আমাকে সাত সমুদ্র তের নদী পারে লইয়া লোকালোক পর্বতের ওপারে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইবে। তাহা ভাবিয়া প্রাণ আমার আকুল হইল। মন্ত্রটি কি? গম্বুজ? না, তা নয়! জলটুঙ্গী? না, তা নয়, ঝাপড়দা-মাকড়দা? না, তাও নয়। তবে কি? এ কথা নয় সে কথা, সেকথা নয় এ কথা—ক্রমাগত ভাবিয়া মন্ত্রটি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একটি বর্ণও আমার মনে উদয় হইল না। এমন কি, হতভম্ব হইয়া আমি দুর্গা নামটি পর্য্যন্ত মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, যাঃ ডমরুধর! এইবার তোমার সব লীলা-খেলা ফুরাইল। যাহা হউক, অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে আমার মনে হইল যে, মন্ত্রটিতে জ আছে, ল আছে আর ক আছে। তাহার পর সেই অক্ষর কয়টি যোড়তাড় করিয়া স্থির কবিলাম যে, মন্ত্রটি বোধ হয় এইরূপ হইবে,—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি?'

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর বলিলেন.—'এতও তুমি জান। এ কোন ভাষা?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন.—'তা জানি না ভাই, এ ভিন্ন আমার আর কিছু তখন মনে হইল না।'

মন্ত্রটি এইরূপে ঠিক করিয়া আমি ভাবিলাম, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি: উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিলাম,—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

সেই কিচ-মিচ শব্দ শুনিয়া ময়ূর ভাবিল,—'কৈলাস পর্বতে ভূত-প্রেত-দানা দৈত্যের সহিত আমার বাস। অনেক তন্ত্র-মন্ত্র শুনিয়াছি। এরূপ বিদঘুটে কখনও শুনি নাই। এ লোকটার ভাবগতিক ভাল নহে। বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে হয় তো এইরূপ ভীষণ পালকহর্ষণ মন্ত্রবলে খাঁচায় পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। আগে থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।' এইরূপ ভাবিয়া গাঝাড়া দিয়া ময়ূর আমাকে শূন্য দেশে ফেলিয়া দিল। তাহার পর শোঁ শোঁ করিয়া কৈলাস পর্বতের দিকে উড়িয়া গেল। আমি তখন ভূমি হইতে প্রায় একক্রোশ উচ্চে আজকাল উড়োকল হইতে মানুষ যেমন পড়ে, আমিও সেইরূপ হু হু শব্দে শিশার ন্যায় নীচে পড়িতে লাগিলাম। হু হু, হু হু, হু হু, কানে আমার বাতাস লাগিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার আমার দফা রফা হইল। হুহু হুহু শব্দে পড়িতে লাগিলাম, অবশেষে থপ করিয়া কাদার ন্যায় কি একটা কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম।

কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম, সেজন্য আমার অস্থি মাংস চূর্ণ হইয়া গেল না, সেজন্য আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। যখন আমার হৃদয়ের ধড়ফড়ানি কিছু স্থির হইল, তখন আমি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু-স্থির হইল। আমি দেখিলাম যে, পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে আমি পতিত হইয়াছি। ব্যাঘ্রটি বৃদ্ধ হইয়াছিল। সেজন্য তাহার দন্ত ছিল না। দাঁত থাকিলে শূলসদৃশ দন্তে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। আমার সকল কথা মনে হইল। পীর গোরাচাঁদের ফকীরদিগের অভিশাপে আমি পড়িয়াছি। এ সেই পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র। যে বাঘ চড়িয়া তিনি দেশভ্রমণ করিতেন। তোমার যে-সে ব্যাঘ্র নহে। এ রয়েল টাইগারের বাবা! এ মহারাজ ব্যাঘ্র।

লোকে বলে যে, ঘুমন্ত সিংহ হা করিয়া থাকিলে, তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না। সে ঠিক কথা নহে। রাজসাপ নামে এক প্রকার সর্প আছে। সে সাপ হা করিয়া থাকিলে তাহার মুখে অন্যান্য সাপ প্রবেশ করে। এ বৃদ্ধ ব্যাঘ্র তাহাই করে। আকাশ-পাতাল জুড়িয়া হা করিয়া থাকে। আর ইহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে। আমি বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা বন্য মহিষ, চারিটা হরিণ ও দুইটা বরাহ ইহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন ব্যাঘ্র একেবারে কোঁৎ করিয়া আমাদের সকলকে গিলিয়া ফেলিল।

ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আমি বিরস বদনে তাহার এক-কোণে গিয়া বসিলাম। বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম — 'এখন করি কি? আর রক্ষা নাই। এখনি হজম হইয়া যাইব। আমার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দুই চারিদিন পরে একছটাক মল হইয়া বাহির হইব।'

নিতান্ত সঙ্কটে পড়িলে মানুষের অনেক বুদ্ধি জোগায়। একবার কোন ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, জীবের উদর হইতে এক প্রকার অম্লরস বাহির হয়; তাহাতেই খাদ্য গলিয়া পরিপাক পায়। তোমরা জান যে, আমার অম্বলের রোগ আছে, আর সেজন্য আমি সর্বদা কাঁচা সোডা ব্যবহার করি। ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে কাগজে মোড়া খানিকটা কাঁচা সোডা ছিল, সেই সোডা উত্তমরূপে আমি গায়ে মাখিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রের পেট হইতে অম্লরস বাহির হইয়া মহিষ, হরিণ, শূকর সব গলিয়া পরিপাক হইয়া গেল, কিন্তু সোডার প্রভাবে আমার শরীর গলিয়া গেল না, আপাততঃ আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

তা যেন হইল। কিন্তু সে আর কয়দিন? ব্যাঘ্রের উদর হইতে বাহির না হইতে পারিলে মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু কি করিয়া বাহির হইব? মা দুর্গার নাম এখন আমার মনে হইল। একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পীর গোরাচাঁদকে অনেক সিন্নি মানিলাম। মা ভগবতীর ও পীর সাহেবের আমার প্রতি কৃপা হইল। বাঘের পেটের ভিতর এককোণে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলিয়া দিল,—তোমার পকেটে কাগজ ও পেনসিল রহিয়াছে, আবাদের কর্মচারীকে পত্র লেখ না কেন?

আমার তখন ভরসা হইল। পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া আমি আমার কর্মচারীকে এইরূপ এক চিঠি লিখিলাম,—'পীর গোরাচাঁদের কোপে আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ব্যাঘ্র আমায় গ্রাস করিয়াছে। সেই ব্যাঘ্রের উদরে আমি আছি। যদি কোনরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।'

আমার কর্মচারী বুদ্ধিমান লোক। আমার চিঠি পাইবামাত্র সে দুই জোয়ারের পথে যে স্থানে ডাক্তারখানা আছে, সে স্থানে চলিয়া গেল। ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে বমন হয়, এরূপ ঔষধ একসের ক্রয় করিল। ইংরেজীতে ইহাকে টারটার এমিটিক বলে। আবাদে ফিরিয়া সেই ঔষধ কাপড়ে রাখিয়া এক ছাগলের গলায় বাঁধিয়া দিল। তাহার পর যে স্থানে পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র বাস করে, সেই স্থানে ছাগল ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে ছাগল আপনা আপনি ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধাঙ্গড়ের ঘরে কন্দর্প পুরুষ

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথম ব্যাঘ্রের পেট কামড়াইতে লাগিল। পেটের কামড়ে ব্যাঘ্র অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ হইলে কি হয়, পেটের কামড়ে সহস্র যুবা ব্যাঘ্রের বলে সে এখন লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। ব্যথা যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, তখন যে দিকে তাহার দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে ঘোড়-দৌড়ের অশ্ববেগে সে ছুটিয়া চলিল। ছোট ছোট গাং লাফ দিয়া ও বড় বড় গাং সাঁতার দিয়া পার হইতে লাগিল। ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিল। হাঁ করিয়া দৌড়িতেছিল, সেজন্য পেটের ভিতর বসিয়া আমি কতক কতক দেখিতে পাইতেছিলাম। বন পার হইল, নদী নালা খাল বিল অনেক পার হইয়া গেল। পেটের কামড়ে সমস্ত রাত্রি দৌড়িল, সমস্ত দিন দৌড়িল, পুনরায় আর এক রাত্রি দৌড়িল। সুন্দরবনের এলাকা পার হইয়া গ্রামসমূহের নিকট মাঠ দিয়া ধাবিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় দিনের বেলা তিনটার সময় বমন করিতে আরম্ভ করিল। শৈশবকালে মাংসপ্রাশনের সময় হইতে যত মহিষ হরিণ শূকর প্রভৃতি খাইয়াছিল, তাহাদের হাড়গোড় সমুদয় বমন করিয়া ফেলিল। উদ্গারের সহিত আমাকে সে বাহির করিয়া ফেলিল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমার দিকে সে দুই একবার কটমট করিয়া চাহিল। মনে মনে ভাবিল,—'এ লোকটাকে গিলিয়া ভাল কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম। যেমন রূপ—তেমনি গুণ, না আছে রস না আছে কষ! কালো চামড়া মোড়া কেবল খানকতক হাড়। এর চেয়ে যদি দশ মণ পাথুরে কয়লা গিলিতাম, তাহা হইলে কাজ হইত।'

এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশু! সে আমার রূপের মহিমা কি বুঝিবে?

লম্বোদর বলিলেন,—'তা সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্ম্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে?'

কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব থাকিয়া ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'দেখ লম্বোদর! সকল কথার খোঁচ ধরিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, বাঘের পেটের ভিতর ডাকঘর নাই, সে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না, সে স্থানে মনিঅর্ডার হয় না। তিরিক্ষি মেজাজ ডাকবাবু সেখানে বসিয়া নাই।' পত্র প্রেরণের সমস্যা এইরূপে হেলায় মীমাংসা করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বাঘের পেটে কয়দিন আমার উদরে অন্নজল যায় নাই। আমি অতিশয় দুর্বল হইয়াছিলাম। ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের নিমিত্ত সেই স্থানে নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম। নিকটে একখানি গ্রাম দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি ছোট, কেবল ইতরলোকের বাস। গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সে স্থান হইতে আমার আবাদ অনেক দূর, কেহ তাহার নামও জানে না। বরং আমার গ্রাম নিকট, সাত-আট ক্রোশ মাত্র। তপস্যা করিতে যখন আমি বনে গমন করি, তখন টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া যাই নাই। সে নিমিত্ত নৌকা অথবা শাল্‌তি ভাড়া করিতে পারিলাম না। পদব্রজেই আমার গ্রাম অভিমুখে আমি চলিলাম।

আকাশভ্রমণে, অনাহারে, নানারূপ ভাবনা-চিন্তায় আমার পা আর উঠে না। তাহার পর বর্ষার শেষ। নদী-নালী জলে ও মাঠ-ঘাট কাদা-কিচায় পরিপূর্ণ। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখন কোথায় যাই। আর একটু আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে নারিকেলপাতায় আচ্ছাদিত সামান্য একখানি চালা দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জনমানবকে সে চালায় দেখিতে পাইলাম না। প্রাঙ্গণে শসা গাছের এক মাচা ছিল। অনেকগুলি দুধে-শসা তাহা হইতে ঝুলিতেছিল। পেট ভরিয়া আমি সেই শসা আঁতি খাইলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমি চালার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গোটাকতক মেটে হাঁড়ী ভিন্ন তাহার ভিতর আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। চালার একপার্শ্বে ছেঁচা বাঁশ দিয়া গঠিত একটি তক্তপোষের মত ছিল। তাহার উপরে একটা ছেঁড়া মাদুর ও একটা ময়লা চিরকুট বালিশ ছিল। ঘোর ক্লান্তিতে কাতর হইয়া আমি তাহার উপর শুইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার হইল। সেই সময় কে একজন চালার ভিতর প্রবেশ করিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটা কেরোসিনের ডিবে প্রজ্জ্বলিত করিল। তখন আমি দেখিলাম যে, সে একটা কালো স্ত্রীলোক। তাহার হাতে শাঁখা আছে, পায়ে প্রায় পাঁচসের ওজনের কাঁসার বাঁকমল আছে। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে অনেক ধাঙ্গড় মজুরি করিতে আসে। আমি বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটা ধাঙ্গড়ানী। প্রথম আমি একটু গলার সাড়া দিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহাকে বলিলাম যে,—বাঘের মুখ হইতে আমি অতি কষ্টে বাঁচিয়া সে স্থানে আসিয়াছি। আর পথ চলিতে পারি না। রাত্রিযাপনের নিমিত্ত তাহারা যদি একটু স্থান প্রদান করে, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।

সাধে কি এলোকেশীর মনে সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ! আমার গায়ের বর্ণটি কৃষ্ণঠাকুরের চেয়ে কালো। বাঘ মিথ্যাকথা বলে নাই—শরীরের ভিতর কেবল খানকতক হাড়। মাথার মাঝখানে কিন্তু এমন চকচকে টাক কার আছে? প্রকাণ্ড টাক। টাকের চারিদিকে পাকা চুল, মুখের দুই পাশে সাদা ফেকো। দাঁত একটিও নাই। তথাপি আমার কিরূপ একটা শ্রী-ছাঁদ আছে, কিরূপ একটা লাবণ্য আছে যে, তাতে বাঘেরও ভুল হয়। আর মাগীগুলোও আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে। অবাক হইয়া ধাঙ্গড় মাগী আমার টাক পানে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে। শেষে সে কেবল দুইটি কথা বলিল,—'মাঝি আসুক।' তোমাদের যেমন 'বাবু', ইহাদের সেইরূপ সম্মানসূচক উপাধি 'মাঝি।'

কিছুক্ষণ পরে একটা হোঁৎকা মিনসে চালার ভিতর প্রবেশ করিল। তোমরা আমাকে কালো বল, কিন্তু তার রঙ্গের তুলনায় আমি তো ফিট্ গৌরবর্ণ। সে আসিয়া যেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আর বামহাতে আমার মাথা

নোওয়াইয়া দক্ষিণ হাতে আমার পিঠে বজ্রসম দুইটা কিল বসাইয়া দিল। গন্ধ পাইয়া আমি বুঝিলাম যে, ধাঙ্গড় মদ খাইয়াছিল।

তাহার পর বলিল,—'এতদিন পরে বেটাকে আজ ধরিয়াছি। ফাঁক পাইলেই আসে-যায়, ধরিতে আর পারি না। আজ বেটাকে ধরিয়াছি ইয়ারকি দিতে জায়গা পাও না, আমার ঘরে ইয়ারকি! হাড় গুঁড়া করিয়া ঐখানে আজ পুঁতিব!'

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আর দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—'আমি বিদেশী লোক। তোমার ঘরে আমি কখনও আসি নাই; আজ বিপদে পড়িয়া এ স্থানে আসিয়াছি।'

ধাঙ্গড় বলিল,—'বিদেশী লোক! গ্রীষ্মকালে মোড়লদের পুকুরে ফেটিজালে কে মাছ ধরিতেছিল? মাঝিনীকে কে একরাশি চুনোমাছ দিয়াছিল? কেন দিয়াছিলি, তা কি আমি বুঝিতে পারি নাই?'

এই কথা বলিয়া আবার দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—আমি কখনও ফেটিজালে মাছ ধরি নাই। আমি ভদ্রলোক। মিছামিছি বিনা দোষে আমাকে মার কেন?

ধাঙ্গড় বলিল,—'ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের ঐ রকম টাক হয়! ভদ্রলোকের ঐ রকম কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা হয়! আর মাঝিনীর পসন্দ; আমাকে পসন্দ হয় না, তোকে পসন্দ!'

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আরও দুইটা কিল মারিল।

আমি দেখিলাম যে, কথা কহিলেই দুইটা করিয়া কিল খাইতে হয়। তাহার পর, দারুণ প্রহার বরং সহ্য হয়, কিন্তু সে যে আমাকে কুৎসিত বলিল, সে কথা আমার প্রাণে সহ্য হইল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু নীরব থাকিয়াও নিস্তার পাইলাম না। সে আমাকে উত্তম মধ্যম অধম বিলক্ষণ প্রহার করিল; তাহার পর আমার কাপড়-চোপড় কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ করিয়া গলা টিপিয়া সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিল। কেবলমাত্র প্রাণে সে আমাকে মারিল না। আমি উঠিতে পড়িতে উঠিতে পড়িতে মাঠের আল দিয়া চলিলাম। অতি ক্লেশে বহুদূর একখানি গ্রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। এক তো রাত্রি হইয়াছে, তাহার পর উলঙ্গ, এ অবস্থায় সে গ্রামের ভিতর প্রবেশ কবিলাম না। মনে করিলাম যে, প্রাতঃকালে কাহারও নিকট হইতে একখানি ছেঁড়া-খোঁড়া গামছা চাহিয়া লইব। সেইখানি পরিয়া আপনার গ্রামে যাইব।

নিকটে একটি বাগান দেখিতে পাইলাম। নারিকেল গাছ-বেষ্টিত শান-বাঁধা ঘাটবিশিষ্ট তাহার ভিতর একটি পুষ্করিণী ছিল। দারুণ প্রহারে শরীরে আমার বিষম বেদনা হইয়াছিল। ঘাটের চাতালে আমি শয়ন করিলাম। ঘোর ক্লেশে নিদারুণ প্রহারে শরীরে আর আমার কিছু ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কখন রাত্রি অবসান হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সহসা 'ভূত! ভূত!' চীৎকার শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, প্রাতঃকাল হইয়াছে; সূর্য্য উদয় হইয়াছে। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, জনকয়েক স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিয়াছিল। সেই উলঙ্গ অবস্থায় আমাকে দেখিয়া 'ভূত! ভূত!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের কোমর হইতে কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিছুদূরে মাঠ হইতে কয়েক জন পুরুষমানুষ 'কি হইয়াছে, কি হইয়াছে' বলিয়া দৌড়িয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের মেমের পোষাক

আমি ভাবিলাম, আবার বা প্রহার খাইতে হয়। সেই ভয়ে আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। 'ঐ যাইতেছে, ঐ যাইতেছে', বলিয়া কেহ কেহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিছুদূরে গিয়া আমি আর দৌড়িতে পারিলাম না। এক স্থানে নিবিড় ভেরাণ্ডার বেড়া ছিল। তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি লুক্কাইত রহিলাম। আমায় আর দেখিতে না পাইয়া

তাহারা ফিরিয়া গেল। যাইতে যাইতে একজন বলিল,—'ভূত কি কখন ধরা যায়? ভূত হাওয়া। এতক্ষণ কোন কালে বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।'

বেড়ার পার্শ্বে আমি বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম; কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যে, বেড়ার বাহিরে ছোট একটি তাঁবু রহিয়াছে। তাহার ভিতরে ও বাহিরে জন দুই পুরুষ ও ঘাগরা-পরা তিনজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে। নিকটে চারি-পাঁচটি বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। একটু দূরে সম্মুখের পা-বাঁধা একটা টাট্টু ঘোড়া চরিতেছে। যাহাদিগকে বেদিয়া বা হা-ঘোরে কঞ্জর বলে, আমি বুঝিলাম যে, ইহারা সেই জাতি। ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। আজ এখানে, কাল সেখানে গিয়া ইহারা জীবনযাপন করে। ভিক্ষা করিয়া অথবা চুরি করিয়া অথবা জড়ী-বুটি বেচিয়া ইহারা দিনপাত করে। ইহারা খোট্টা কথা বলে। বাজারে তুমি একশত টাকায়ও রামচন্দ্রি অথবা আকবরি মোহর কিনিতে পাইবে না। কিন্তু ইহাদের নিকট দুই তিন টাকায় পাওয়া যায়। সে মোহর পূজা করিলে ঘরে মা লক্ষ্মী অচলা অটলা বিরাজ করেন। স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিতেছিল। বেলা দশটার সময়ে সকলে আহার করিয়া গ্রাম অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে কেবল এক বুড়ি রহিল। বাহিরে বসিয়া বুড়ি আপনার মনে চুবড়ী বুনিতে লাগিল। যাইবার পূর্বে এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যার ছোট একটি সালুর ঘাঘরা শুষ্ক হইবার নিমিত্ত আমার নিকট ভেরেণ্ডা গাছে ঝুলাইয়া দিল।

সকলে চলিয়া গেলে সেই ঘাগরার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। খুপ করিয়া ঘাগরাটি বেড়ার ভিতর টানিয়া লইলাম। ঘাগরাটি চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমার হাঁটু পর্য্যন্ত হইল। তাহার পর অন্যদিক দিয়া চুপে চুপে বেড়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমি পলায়ন করিলাম। আমার গ্রাম কোন দিকে, দিনের বেলা এখন অনেকটা বুঝিয়াছিলাম। হন হন করিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীর দুর্বল, তাহার উপর প্রহারের বেদনা; অধিক দ্রুতবেগে যাইতে পারিলাম না। লাল ঘাগরা পরিয়া আমাকে মন্দ দেখায় নাই। যাহার শ্রী আছে, সে যা পরিধান করুক না কেন, তাহাতেই তাকে ভাল দেখায়। যাহারা বাঁদর খেলায়, তাহাদের সহিত যেরূপ লাল ঘাগরা পরা একটা বাঁদরের মেম থাকে, আমাকেও সেইরূপ মেমের মত দেখাইল। আমার গায়ের রং একটু কালো, কেবল এই প্রভেদ! আমাকে ভাল দেখাইলে কি হয়, এরূপ মেম সাজিয়া পাঁচজনের সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা করে। সে জন্য আমি কোন গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। সেজন্য লোক দেখিলে তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। এই কারণে গ্রামে পৌঁছিতে আমার অনেক বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমাদের গ্রামের নিকট মাঠে আসিয়া আমি উপস্থিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম, এ বেশে দিনের বেলা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিব না। পাঁচজনে দেখিলে হাসিবে। দুর্লভী বাগ্দিনীকে তোমরা সকলেই জান। মন্দ নয়—না? যাহার জন্য ও-বৎসর গৃহিণী আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? তাহার মেটে ঘরটি গ্রামের শেষে এককোণে। আমি মনে করিলাম, কিছুক্ষণ তাহার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকি। তাহার পর সন্ধ্যার সময় গা-ঢাকা অন্ধকার হইলে আস্তে আস্তে বাটী যাইব, এইরূপ মনে করিয়া চুপে চুপে তাহার ঘরে আমি প্রবেশ করিলাম, প্রথমে সে আঁউমাউ করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—'ভয় নাই! চুপ কর, বড় বিপদে পড়িয়া তোর ঘরে আসিয়াছি। গোল করিসনে। পূজার সময় তোকে একখানা কাপড় দিব।'

আমি ভাবিয়াছিলাম, কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তা নয়। পরীক্ষিৎ ঘোষের কেষ্টা নামে সেই দুষ্ট এঁচোড়ে পাকা ছেলেটা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। পরীক্ষিৎ ঘোষ আমার নিকট হইতে দশ টাকা ধার লইয়াছিল। দেড়শত টাকা সুদ দিয়াছিল। তাহার পর যখন সে আসল পরিশোধ করিল, তখন তাহাকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত খতখানি ফিরিয়া দিলাম না। তাহার বিপক্ষে আদালতে একবার মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়াছিলাম। মোকদ্দমায় মিথ্যা বলিতে দোষ নাই। সেই অবধি আমার উপর তাহার আক্রোশ। তাহার ছেলেটাও পথে-ঘাটে আমাকে দেখিতে পাইলে দূর হইতে ক্ষেপায়, সে বলে,—'টাকচাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর—ডুরু ডুরু ডুরু।' ডুরু ডুরু মানে ডমরু। আমার নামটা ছোঁড়া সংক্ষেপ করিয়াছে।

পরীক্ষিৎ ঘোষের কাছে তাহার ছেলের দৌরাত্ম্যের বিষয় একবার আমি নালিশ করিয়াছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেষ্টা কি আপনার দিকে চাহিয়া ও সব কথা বলে?'

ছোঁড়া কি করে, মনে মনে চিন্তা করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—'না। সে আমার দিকে চাহিয়া বলে না। কখনও উপর দিকে চাহিয়া এ সব কথা বলে, কখনও বা গাছপালার দিকে চাহিয়া বলে, কখন বা আকাশপানে দুইটা পা করিয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া, দুই হাতের উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে ঐ সব কথা বলে।'

পরীক্ষিৎ ঘোষ বলিল,—'তবে?'

সে 'তবে'র আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না।

কেষ্টা তাড়াতাড়ি গিয়া আপনার বাপকে সংবাদ দিল। আমি তা জানিতাম না। পরীক্ষিৎ ঘোষ আসিয়া দুর্লভীর ঘরের দ্বারে শিকল দিয়া দিল। দুর্লভীকে আর আমাকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার পর পাড়ার লোককে সংবাদ দিল। দুর্লভীর ঘরে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো পাড়াসুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল'

জাহ্নবী সাঁই বলিলেন,—'আমিও দেখিতে গিয়াছিলাম।'

গণপতি ভড় বলিলেন,—'আমিও গিয়াছিলাম।'

পুঁটারাম চাকী বলিলেন,—'আমিও গিয়াছিলাম।'

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—'আমিও গিয়াছিলাম।'

লম্বোদর বলিলেন,—'আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী থাকিলে আমিও যাইতাম।'

ক্রুদ্ধ হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—'যাইতে বই কি। তুমি না গেলে কি চলে?'

দুর্লভীর ঘরের সম্মুখ দিকে দুইপার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট জানালা আছে। ঘরের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীরেও সেইরূপ ছোট জানালা আছে। সম্মুখ দিকের দুইটি জানালা দিয়া লোক সব উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। সে দুইটি জানালায় ভিড় করিয়া লোকে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কেষ্টার বন্ধু জন পাঁচ ছয় ছোঁড়া চালে উঠিয়া খড় ফাঁক করিয়া উপর হইতে উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। পশ্চাৎ দিকের জানালাটা কিছু উচ্চ ছিল। মাটীতে দাঁড়াইয়া তাহা দিয়া দেখিতে পারা যায় না। কেষ্টা ছোঁড়ার একবার বদমায়েসি শুন। কোথা হইতে একটা টুল চাহিয়া আনিল। লোককে সেই টুলের উপর দাঁড় করাইয়া ঘরের ভিতর আমাকে ও দুর্লভীকে দেখাইতে লাগিল।

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—'অমনি দেখায় নি। এক পয়সা করিয়া টুলের ভাড়া লইয়াছিল। দেখিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট হইতে সে চারি পয়সা লইয়াছিল।'

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—'চারি পয়সা! আমাকে সাত পয়সা দিতে হইয়াছিল।'

ডমরুধর মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—'কি দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়াছিলে? আমাকে কি তোমরা কখনও দেখ নাই? আমি কি আলিপুরের বাগানের সিঙ্গি না বাঘ না কি, যে, আমাকে দেখিবার জন্য তোমাদের এত হুড়াহুড়ি?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : এলোকেশীর মুড়ো খেঙরা

দেখিতে দেখিতে কে একজন বলিয়া বসিল,—'এলোকেশী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দাও। তিনি আসিয়া কর্তাটিকে একবার দেখুন।'

তখন আমার হৃৎকম্প হইল। একে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাহার উগ্রচণ্ডা—সর্বদাই রণমূর্তি। আবার তাহার উপর আমি এক কন্দর্প পুরুষ। সর্বদাই এলোকেশীর সন্দেহ। এ অবস্থায় আমাকে দেখিলে এলোকেশী যে আমার কি হাল করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল হইলাম।

সেই হতভাগা ছোঁড়া কেষ্টা, বলিতে না-বলিতে আমার বাড়ীতে সংবাদ দিল। এলোকেশীর গায়ের রং আমা অপেক্ষা কাল। রাগে এখন তাঁহার মুখটী অনেক দিনের ভূষোপড়া ধানসিদ্ধ হাঁড়ীর ন্যায় হইল। ভীম যেরূপ ঘণ্টাওয়ালা

লোহার গদা লইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, এলোকেশীও সেইরূপ মুড়ো খেঙরা লইয়া দুর্লভীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এলোকেশীকে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। দ্বারের শিকল খুলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর—বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা। 'পোড়ার মুখো বুড়ো ডেক্‌রা! রঃ! আজি তোর ভূত ছাড়াইব'—এই কথা বলিয়া আমার মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সেই মুড়ো খেঙরা দিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এলোকেশীর নব্য বয়স; ধাঙ্গড়ের কিল বা কি! এলোকেশীর এক এক ঘা খেঙরা ভীমের গদার ন্যায় আমার গায়ে পড়িতে লাগিল। আমি যত বলি—আর নয়! আর নয়! যথেষ্ট হইয়াছে,—ততই খেঙরার প্রহারে আমার পিঠ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাথার টাকে ও পিঠে সেই মুড়ো খেঙরার অনেক কাঠি ফুটিয়া গেল।

কেষ্টাকে মন্দ বলি, কিন্তু এই দুঃসময়ে সে আমার বন্ধু হইল। আমার নাকাল দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া সে ও তাহার সঙ্গিগণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল,—'টাক-চাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর, ডুরু ডুরু ডুরু।'

তখন এলোকেশী আমাকে ছাড়িয়া—'তবে রে আঁটকুড়ীর বেটারা!' বলিয়া তাহাদের মারিতে দৌড়িলেন। আমি অব্যাহতি পাইলাম, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। দুর্লভী তখন আপনার খেঙরা লইয়া আমাকে বলিল,—'তুই যেমন, ঠাকুর তোর তেমনি খ'র করিয়াছেন। আমার মন ভুলাইতে রাঙা ঘাঘরা পরিয়া সাজ-গোজ করিয়া আসা হইয়াছে, এখন আমি একবার ঝাড়াই।' এই কথা বলিয়া সেও ঘা-কত আমার পিঠে বসাইয়া দিল।

কত কিল কত খেঙরা আর সহ্য করিব! আমার পিঠ তো আরপাথরের নয়। আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। দুর্লভীর ঘর হইতে যখন বাহির হই, তখন এলোকেশী বলিলেন,—'এখনও হইয়াছে কি! চল ঘরে চল। আজ তোর আমি হাড়ীর হাল করিব। খেঙরার চোটে তোর ভূত ছাড়াইব।'

সেই ভয়ে আমি বাড়ী যাইলাম না। আমার খিড়কির বাগানে এক গাছ ঠেস দিয়া বিরস বদনে বসিয়া রহিলাম। বসিযা বসিয়া মা ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা! আমি তোমার ভক্ত, দুর্গোৎসব আসিতেছে, মা! আমি তোমার পূজা করিব। তুমি দেখিয়াছ, আমার দালানে তোমার প্রতিমা গড়া হইতেছে। তবে কেন মা আমার উপর রাগ করিয়াছ?'

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। বাড়ী যাইতে আমার সাহস হইল না, গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে একটু একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন দেখি যে, এলোকেশী বুঝি শূর্পণখার বেশ ধরিয়া আমার নাক কাটিতে আসিতেছে। অথবা তাড়কা রাক্ষসী হইয়া আমাকে চর্বণ করিতেছেন। প্রহারে শরীর জ্বর জ্বর হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভিজা মাটীর উপরেই শুইয়া পড়িলাম। একটু নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময় কে যেন আমাকে ডাকিল, 'ডমরুধর! বাছা ডমরুধর!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ : অমৃত কুণ্ডের জল

চমকিত হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিলাম যে, স্বয়ং মা দুর্গা একখানি চৌকীর উপর আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। এ তোমার দশ-হেতে হরিতাল রঙে গর্জন তেলে ব্যাড়বেড়ে রাঙতা-পরা দুর্গা নয়। এ কৈলাস পর্বতের আসল মা দুর্গা; সুন্দর পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য রত্ন-আভরণে ভূষিত করিয়া কুবের ইঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

যোড়হাতে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন,—'ডমরুধর! তুমি বড় অপরাধ করিয়াছ। যে মন্ত্র তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া ও কি উদ্ভট কথাত সব বলিয়াছিলে? 'জিলেট জিলেকি সিলেমেল্ কিলেকিট কিলেকিশ' কি বাছা? এরূপ মন্ত্র বেদে কোরাণে বাইবেলে কোন স্থানে আমি দেখি নাই। পিড়িং ফিড়িং দুম বলিলেও একদিন কথা থাকিত। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমার এত দুর্গতি

হইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে হাঁ কর।'

আমি হাঁ করিলাম! দেবী আমার মুখে একটু অমৃত কুণ্ডের জল ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে আমার সর্বশরীরের ব্যথা দূর হইল। যেন নূতন জীবন নূতন শরীর আমি প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর মা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—'যাও বাছা। এখন ঘরে যাও। এলোকেশী আর তোমাকে কিছু বলিবে না।'

এই কথা বলিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। আমি বাড়ী আসিলাম। মায়ের বরে এলোকেশীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

ডমরুধরের গল্প শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। পুরোহিত বলিলেন,—'ধন্য ডমরুধর! তুমি ধন্য!'

গণপতি ভড় বলিলেন,—'কেবল পুণ্যবলে ডমরুধর রক্ষা পাইয়াছেন।'

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—'ডমরু কি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন।'

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—'চমৎকার গল্প।'

লম্বোদর বলিলেন,—'অতি চমৎকার! বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোনও কোনও লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়া রসে ভিজিয়া ভাবে গেঁজিয়া বলেন,—মরি মরি! আহা মরি! এও সেই আহা মরি!'

রুক্ষ কটাক্ষে ডমরুধর একবার লম্বোদরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না।

অবশেষে ডমরুধর বলিলেন,—'পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্রের উদরে যখন ছিলাম, তখন মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম যে, এ বিপদ হইতে মা যদি আমাকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলে মাকে আমি ব্যাঘ্রবাহিনীরূপে পূজা করিব। আমার আদেশে সেইজন্য কারিগর সিংহ স্থানে ব্যাঘ্র গড়িয়াছে।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি যে গল্পটি করিলে, কি করিয়া জানিব যে, তাহা সত্য?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'এই আমার পায়ে এখনও রাহুর কামড়ের দাগ রহিয়াছে।' সত্য সত্যই ডমরুধরের পায়ে একটা দাগ আছে, তা দেখিয়া সকলে অবাক।

তখন লম্বোদর বলিলেন,—'জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।'

পঞ্চম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্বদেশী-কোম্পানী

ডমরুধরের প্রথম উপাখ্যানে চিত্রগুপ্ত, যম, যমনী, পুঁইশাক, এলোকেশী, এলোকেশীর মাতা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। এলোকেশী ডমরুধরের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। সেই উপাখ্যান পাঠের ফল এইরূপ,—

> ডমরুচরিত পড় রে ভাই ক'রে একান্ত ভক্তি।
> ইহকালে পাবে সুখ পরকালে মুক্তি।।
> চিত্রগুপ্তর গলায় দড়ি যমনী বাজায় শাঁক।
> পুঁইশাকের নামে যমের সিঁটকে উঠলো নাক।।
> ঝক মক করে সোণার গহনা এলোকেশীর গায়।
> আড়নয়নে শাশুড়ী ঠাকরুণ পিটির পিটির চায়।।
> পয়সা দিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখ ঘরে।
> ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে ইহার বরে।।

বর্তমান ডমরু উপাখ্যানের ফলও সেইরূপ, বরং অধিক।

প্রতি বৎসর পূজার সময় ডমরুধর বন্ধুবান্ধবের সহিত নানারূপ গল্প করেন। পঞ্চমীর দিন বৈকালে তাঁহার পূজার দালানে লম্বোদর, গজানন, হলধর প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রতিমার নিকট তিনি বসিয়া আছেন। ডমরুধরের মুখের দিকে চাহিয়া লম্বোদর বলিলেন,—'এবার পুনরায় স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেকগুলি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ!'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! স্বদেশী কোম্পানী বৃথা যায় না কিছু না কিছু দিয়া যায়। কিন্তু ভাই, সম্প্রতি আমি এক ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। সে বিপদ হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রতি মায়ের অসীম কৃপা। বলিতে গেলে আমি মা দুর্গার বরপুত্র।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সে-বার স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেক রাড়ী ভুঁড়ী গরীব দুঃখীর টাকা হাম করিয়াছিলেন। এবার মোকদ্দমা হইযাছিল জানি। কি হইযাছিল বল দেখি।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'মোকদ্দমা স্বদেশী কোম্পানীর প্রধান অঙ্গ। স্বদেশী কোম্পানী খুলিলে সকলকেই মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। যাহা হউক, এখন সব চুকিয়া গিয়াছে। এই নূতন স্বদেশী কোম্পানীর বৃত্তান্ত এখন আমি তোমাদিগাকে বলিতে পারি, শুন।'

ডমরুধর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর পূজার পর একদিন বেলা দশটার সময় আমি বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময় ব্যাগ হাতে করিয়া এক ছোকরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। রং অল্প গৌরবর্ণ। কালো কালো গোঁপ আছে। দেখিতে সুশ্রী। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া বোধ হইল।

ব্যাগ হইতে চারিটি শিশি সে বাহির করিয়া বলিল,—'এইটি ম্যালেরিয়া জ্বরের আরক, এইটি অজীর্ণ রোগের ঔষধ, এইটি বহুমূত্র রোগের ব্রহ্মাস্ত্র; আর এইটি মুখে মাখিলে রং ফরসা হয়। প্রতি শিশির মূল্য একটাকা, চারিটি টাকা আমাকে প্রদান করুন।'

আমি বলিলাম,—'ঔষধে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি বোকা লোকদিগের নিকট গমন কর। তোমার একটাও ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।'

আমার কথা শুনিয়া সে চলিয়া গেল না। অতি সুমিষ্ট স্বরে সে ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সে বলিল,—'আমি তিনটা পাস দিয়াছি। যে বিদ্যা শিখিলে নানা পদার্থ মিশাইয়া উত্তম উত্তম নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারা যায়, আমি সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। সেই বিদ্যাবলে আমি এইসব ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাদের গুণ অলৌকিক। দিন কয়েক ব্যবহার করিলেই আপনার শরীরে কান্তি ফুটিয়া পড়িবে। আপনি নব-যৌবন প্রাপ্ত হইবেন।'

উত্তর করিলাম,—'আমার ম্যালেরিয়া জ্বর নাই, অজীর্ণ ও বহুমূত্র রোগ নাই। বৃদ্ধ হইয়াছি, রং ফরসা হইবার সাধ নাই। তাহা ব্যতীত আমি বৃথা একটি পয়সাও খরচ করি না। তোমার ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।'

আমাদের দুইজনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সে ছোকরা নাছোড়বান্দা। এমনি সুমিষ্ট ভাষায় সে বক্তৃতা করিতে লাগিল যে, ক্রমে আমার মন ভিজিয়া আসিল। অবশেষে সে বলিল,—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটী আপনার নবযৌবনে ঢল ঢল করিতেছে। আর কোনও ঔষধ লউন ও আর নাই লউন, আপনাকে এই রং ফরসা হইবার ঔষধটি লইতে হইবে। দিনকতক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট গৌরবর্ণ হইয়া পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।'

ছেলেবেলা হইতে ফরসা হইবার আমার সাধ ছিল। অনেক সাবাং মাখিয়ছিলাম। কিছুতে কিছু হয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম,—'এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা হইলে দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।'

শিশির মূল্য একটাকা, কিন্তু সে আমাকে আট আনায় দিল। মূল্য লইয়া সে কিছুদূর গিয়াছে, এমন সময় আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। —'আমি ডমরুধর! সুমিষ্ট বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোকরা নয়। ইহা দ্বারা কি কোনরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?'

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। অনেক আদর করিয়া আমার নিকট বসাইলাম। আমি বলিলাম,—'বাপু! তোমার নাম কি?'

সে উত্তর করিল,—'আমার নাম শঙ্কর ঘোষ।'

তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কাজ করে, প্রভৃতি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তুমি তিনটা পাস দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?'

কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল,—'কল্য আসিয়া আপনার এ কথার উত্তর দিব।'

পরদিন সে একরাশি এঁটেল মাটী ও চারি পাঁচখানি ধবধবে চিক্কন কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল,—'এঁটেল মাটী হইতে আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটী হইতে দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিব। লাভ অর্দ্ধেক আপনার অর্দ্ধেক আমার।'

এঁটেল মাটী ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। স্বদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে, এ কাজ হালাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে। তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালরূপ একটা স্বদেশী কোম্পানী খুলিতে হইলে দুই-চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার যোগাড় করিলাম। একটি মিটিং হইল। এঁটেল মাটী ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—'এঁটেল মাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।'

শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন,—'খড়িমাটী দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।'

কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই যাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল কালেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তার যোগাড় করিয়াছিলাম। তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন—

আমাদের কোম্পানীর নাম হইল,—'গ্রাণ্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড।' কয়েকজন বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে হূনহর। ইঁহারা না জানেন, এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কোম্পানীর বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটী হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোনও দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতার বাঙ্গালিরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।

কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটী দিয়া শঙ্কর ঘোষ একখানিও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে যে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। আসল টাকাব মুখও কেহ দেখিতে পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শঙ্কর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারীতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোম্পানী "লিমিটেড" ছিল। মোকদ্দমা

ফাঁস হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যান্ত লাগিল না।

অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে টাকাগুলি সমুদয় আমি লইলাম। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—'হিসাবের বহি তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।'

আমার কথা শুনিয়া শঙ্কর ঘোষ ঘোরতর বাগান্বিত হইল। 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে; তোমাকে আমি দেখিয়া লইব,'—আমাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে চলিয়া গেল। আমার দ্বিতীয় স্বদেশী কোম্পানীর বৃত্তান্ত এই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি বলিলে যে সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছিলে। আমরা পাড়ায় থাকি কোনও বিপদের কথা আমরা তো শুনি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সে বিপদের কথা আজ পর্যান্ত আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভিকু ডাক্তার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"ফাঁকতালে অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়া মন আমার প্রফুল্ল হইল। শরীরটি নাদুর-নুদুর নধর হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি। সেবার এই বাগদিনী সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সুন্দরবনের আবাদ হইতে আমি বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলাম। পথে এক বেটা সাঁওতাল আমার কাপড় কাড়িয়া লইয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কোনও স্থানে একদল বেদিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিল। তাহাদের ছোট একটি লাল ঘাঘরা বেড়ার গায়ে শুকাইতেছিল। সেই ঘাঘরা চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমি মনে করিলাম যে, এরূপ বেশে দিনের বেলা গ্রামে প্রবেশ করিব না, সন্ধ্যা পর্যান্ত দুর্লভীর ঘরে লুকাইয়া থাকিব। তাহার ঘরে যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর কেষ্টা ছোঁড়ার বাপ আসিয়া দ্বারে শিকল দিয়া দিল। কেষ্টা গ্রামের লোককে ডাকিয়া আনিয়া, আমাকে দেখাইল। 'রাঙা ঘাঘরা পরিয়া পোড়ার মুখো ডেকরা বুড়ো আমার মন ভুলাইতে আসিয়াছে,"—এইরূপ গালি দিয়া দুর্লভী আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তাহার পর এলোকেশী আসিয়া আমাকে ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করিলেন। এ সব কথা তোমাদিগকে আমি পূর্বে বলিয়াছি।

সেই অবধি দুর্লভী আমার সহিত কথা কয় না। পথে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। যখন কন্দর্প পুরুষের ন্যায় আমার নাদুর-নুদুর নধর শরীর হইল, তখন আমি মনে করিলাম যে, চুপি চুপি দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি,—যেন এলোকেশী জানিতে না পারেন।

দুর্লভীর ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, সে কয়দিন জ্বরে পড়িয়া আছে। তাহার বোন-ঝি সেবা করিতে আসিয়াছে। বোন-ঝির নাম চঞ্চলা। পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঝিরডাঙ্গা নামক গ্রামে তাদের বাস। সে বিধবা। বয়স প্রায় ত্রিশ। রং কালো বটে, কিন্তু দেখিতে মন্দ নহে। আমি মনে করিলাম,—ইহার সহিত ভাব করিতে হইবে। তাহা করিলে দুর্লভীর হিংসা হইবে। আমার উপর আর তাহার রাগ থাকিবে না।

রং ফরসা হইবার জন্য শঙ্কর ঘোষ আমাকে যে ঔষধ বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা আমি ব্যবহার করি নাই। সেই ঔষধ দুর্লভীকে আমি খাইতে দিলাম। তাহা খাইয়া দুর্লভীর পেট ছাড়িয়া দিল, দুর্লভী মৃতপ্রায় হইল। গ্রামের সকলে আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। পুলীশে সংবাদ দিবে বলিয়া কেষ্টার বাপ আমাকে ভয় দেখাইল।

চঞ্চলা বলিল যে, তাহাদের গ্রামে ভিকু ডাক্তার নামক এক ভাল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে আনিলে তাহার মাসী ভাল হইবে। আমার ঔষধ খাইয়া দুর্লভীর প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সেজন্য ভয়ে আমি খরচ দিতে সম্মত হইলাম। ব্যাগ হাতে করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঝিরডাঙ্গা হইতে ভিকু ডাক্তার পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রদান করেন।

শুনিলাম যে, ভিকু কলিকাতায় কোনও ডাক্তারখানায় ছয় মাস কম্পাউণ্ডারি করিয়াছিলেন। একবার কোনও রোগীকে কৃমির ঔষধের পরিবর্তে কুচিলা বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। রোগীর তাহাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সেজন্য ভিকুর ছয় মাস কারাবাস হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভিকু এখন স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

ভিকুর বয়স চল্লিশের অধিক। শরীর কাহিল। রং ময়লা, তবে কালো নহে। সচরাচর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের বিশেষতঃ হাতুড়েদের যেরূপ হয়, ভিকুর মুখ দিয়াও সেইরূপ চড়বড় করিয়া কথার যেন খৈ ফুটিতে থাকে। দুর্লভীকে দেখিয়া ভিকু বলিলেন,—'কোনও ভয় নাই, সরিষাপ্রমাণ এক বড়িতে ইহাকে আমি ভাল করিব। এ বা কি রোগ! আমি কত অসাধ্য রোগ ভাল করিয়াছি। কত মরা মানুষকে জীবন প্রদান করিয়াছি।'

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ভিকু নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ভিকু বলিলেন,—'নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরকেলের পেট ক্রমে ক্রমে ফুলিতে লাগিল; পেট ফুলিয়া ক্রমে জালার মত হইল। কত ডাক্তার কত বৈদ্য আসিল। কেহ বলিল উদরী, কেহ বলিল টিউমার। কত ঔষধ তিনি খাইলেন। কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার লোকেরা আমাকে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পেটটি দেখিলাম। অবশেষে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের ঘরে মাছ ধরিবার সূতা বঁড়শী আছে? তাহারা সূতা বঁড়শী আনিয়া দিল। বঁড়শীতে হোমিওপ্যাথিক গুলির টোপ করিয়া সূতা সহিত রোগীকে গিলিতে বলিলাম। মুখের বাহিরে সূতাটির অপর দিক ধরিয়া আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সূতা যেই একটু নড়িয়া উঠিল, আর সেই সময় আমি টান মারিলাম। বলিব কি মহাশয়! ধামার মত প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ তাঁহার পেট হইতে আমি বাহির করিলাম। জলের সহিত সামান্য শিশুকচ্ছপ সরকেলমহাশয় ভক্ষণ করিয়াছিলেন। উদরে সেই কচ্ছপ ক্রমে বড় হইয়া তাঁহার জীবন সংশয় করিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলেন।

'আর একবার রাত্রি দুপ্রহরের সময় আমি ঝিল গ্রামের শ্মশানঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে কয়েকটি ভূত, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া কমিটী করিতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া ব্যাগ হইতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বাহির করিলাম; দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহার আলোকে ভূতের ঔষধ দেখিলাম। তাহার পর যেই ঔষধের শিশি বাহির করিয়াছি, আর তাহার গন্ধ পাইয়াই ভূতেরা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একটু বিলম্ব করিলে আমার ঔষধের গুণে তাহারা ভস্ম হইয়া যাইত। ভূতের ছাই দিয়া হিষ্টিরিয়া রোগের চমৎকার ঔষধ আমি প্রস্তুত করিতে পারিতাম।'

ভিকু ডাক্তার আরও বলিলেন যে,— 'ভূতগণ যখন পলায়ন করিল, তখন আমি সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, তাহারা এক মড়া ভক্ষণ করিতেছিল। মড়ার হাত-পা সর্ব শরীর তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবল মুখটি অবশিষ্ট ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে দিলাম। মুখে গুলি দিবামাত্র সে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আশ্চর্য্য কথা কি বলিব মহাশয়! আমার ঔষধের গুণে তাহার শরীর গজাইতে লাগিল। প্রথম গলা হইল, তাহার পর বক্ষঃস্থল হইল, তাহার পর উদর হইল, তাহার পর হাত-পা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, সে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নহে। সে রাত্রি আমি তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইলাম। পরদিন সে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এখানে থাকিলে আপনাদিগকে দেখাইতাম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ আছে বটে, কিন্তু ঠিক ঔষধটি ধরা বড় কঠিন। অনেক দেখিয়া-শুনিয়া আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইয়াছে। রোগীর চেহারা দেখিলেই আমি ঠিক ঔষধ ধরিতে পারি। আমার হাতে একটিও রোগী মারা পড়ে না। সেজন্য কলিকাতার হোমরা-চোমরা ডাক্তারগণ, যাঁহারা যোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট গ্রহণ করেন তাঁহাদের যখন হালে পানি পায় না, তখন তাঁহারা বলেন, ঝিঝিরডাঙ্গার ভিকু ডাক্তারকে লইয়া এস, তিনি না হইলে এ রোগের ঔষধ কেহ ঠিক করিতে পারিবে না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়।'

ভিকু পুনরায় বলিলেন,—'আমি আর একটি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছি। যে ঔষধে প্রজাপতি দক্ষের গলায় ছাগলের মুণ্ড জোড়া লাগিয়াছিল, ইহা সেই ঔষধ। হাত-পা এমন কি মানুষের মাথা কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেলেও, আমি এক বড়িতে পুনরায় জুড়িয়া দিতে পারি।'

ভিকু নানারূপ গল্প করিলেন। অবাক হইয়া সকলে তাঁহার গল্প শুনিতে লাগিল। সকলে মনে করিল যে, ইঁহার তুল্য বিচক্ষণ ডাক্তার জগতে নাই।

দুর্লভীর চিকিৎসার জন্য আমি তাঁহাকে এক টাকা দিতে চাহিলাম। কিন্তু প্রথমে তিনি কিছুতেই তাহা লইলেন না। তিনি বলিলেন,—'আমি পাঁচ ক্রোশ পথ হইতে আসিয়াছি। চারি টাকা লইব।'

অনেক কচলাকচলির পর আমি বলিলাম যে,—'আপাততঃ আপনি এক টাকা লউন, রোগী ভাল হইলে পরে আর তিন টাকা দিব।'

এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি এক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম! রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার-বৈদ্যকে কলা দেখায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চঞ্চলার গাই গরু

দুর্লভী ভাল হইলে চঞ্চলা আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। কিন্তু চঞ্চলার সহিত সদ্ভাব করিতে আমার বাসনা হইয়াছিল। তাহাদের গ্রাম অনেক দূর : সর্বদা আমি যাইতে পারিতাম না। কেবল মাঝে মাঝে যাইতাম। সেই গ্রামের পাশ দিয়া বড় রাস্তা গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী সর্বদা যায়। দুই-চারিটা পয়সা দিয়া তাহার উপর বসিয়া কখন কখন কতক দূর যাইতাম। ফিরতি ঘোড়ার গাড়ীতেও দুই একবার গিয়াছিলাম। এ পথে দুই তিনবার মোটর গাড়ী দেখিয়াছিলাম। স্বদেশী কোম্পানী স্থাপনের সময় বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর ঘোষ মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি মোটর গাড়ী চড়িয়াছিলাম। কিন্তু অতি বেগে গমন করে। আমার ভয় হইয়াছিল। মোটর গাড়ী টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনওরূপ বিলাতি জন্তু-জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।

মাঝে মাঝে চঞ্চলাদের গ্রামে গিয়া তাহাদের দাওয়াতে আমি বসিতাম। চঞ্চলার মা নাই, কেবল বাপ আছে। তাহার নাম সহদেব বাগ্দী। সহদেব মজুরি করে। চঞ্চলার একটি গাই গরু আছে। তাহার দুধ সে বিক্রয় করে।

চঞ্চলার দাওয়াতে বসিয়া আমি গল্প-গাছা করিতাম। কখন কখন দুই-একটা রসের কথাও বলিতাম। তখন হাসিয়া সে নুটিপুটি হইত। পাড়ার মাগীদের সে ডাকিয়া আনিত। আমার দিকে চক্ষু ঠারিয়া সকলে হাসিয়া নুটিপুটি হইত। আমাকে দেখিলে লোকের আনন্দ হয়। মাগীদের তো কথাই নাই। আমার রূপ দেখিয়া তাহাদের মন ভুলিয়া যায়। মাগীগুলো আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে।

চঞ্চলাকে দশ পয়সা দিয়া একখানি গামছা কিনিয়া দিয়াছিলাম। গামছা পাইয়া তাহার আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি মনে ভাবিলাম,—দুর্লভী একবার এই কথা শুনিলে হয়। তাহা হইলে সে আর মুখ হাঁড়ী করিয়া থাকিবে না।

লম্বোদর! এইবার ভাই সেই ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এইবার সেই গ্রামে আমাকে প্রায় একমাস কয়েদ থাকিতে হইয়াছিল।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কবে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আজ পঞ্চমী, ইহার তিনটা পঞ্চমী আগে, প্রায় দুই মাসের কথা।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সে কি করিয়া হইবে। তুমি বলিতেছ যে দুই মাস পূর্বে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পর এক মাস তুমি সেই গ্রমে কয়েদ হইয়াছিলে। কিন্তু গত ছয় মাস ধরিয়া তুমি গ্রাম হইতে কোনও স্থানে গমন কর নাই। এই ছয় মাস প্রতিদিন তোমাকে আমরা দেখিয়াছি।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সকলই জগদম্বার মায়া! তাঁহার মায়াতে তোমরা আচ্ছন্ন হইয়াছিলে।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দুর্ঘটনাটা কি?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'তাহা বলিতেছি শুন।'

প্রায় দুই মাসের কথা হইল। একদিন রাত্রিতে আমি ঘরে শুইয়াছিলাম। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আর

নিদ্রা হইল না, এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলাম। চঞ্চলার জন্য একখানি নয়হাতি কাপড় কিনিয়াছিলাম। মনে করিলাম, বিছানায় আর বৃথা পড়িয়া থাকিব না। কাপড়খানি তাহাকে দিয়া আসি। এলোকেশীর ভয়ে কাপড়খানি এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কাপড়খানি লইয়া চঞ্চলাদের গ্রাম অভিমুখে আমি হাঁটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে সকাল হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পরে বড় রাস্তায় গিয়া উঠিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় চঞ্চলাদের গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। চঞ্চলার পিতা সহদেবের সহিত বড় রাস্তায় সাক্ষাৎ হইল। চঞ্চলার গাই গরুর দড়ি ধরিয়া বড় রাস্তার উপর দিয়া সে তাহাকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি কিছুদুর চলিলাম, অন্যমনস্ক হইয়া আমরা দুইজনে যাইতেছি, পশ্চাতে যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইয়াছিল, তাহার কিছুই শুনিতে পাই নাই। সহসা পশ্চাৎ হইতে এক মোটর গাড়ী আমার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়ীর চাকায় আমার কোমর পর্য্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেল। আমার দুইটা কাটা পা গাড়ীর চাকায় কিরূপে আটকাইয়া গেল। কোমর হইতে আমার পা দুইটি লইয়া মোটর গাড়ী অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

লম্বোদর প্রভৃতি সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। সকলে বলিয়া উঠিলেন—'বল কি হে? সত্য?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই, সত্য।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর?'

ডমরুধর বলিলেন,—'রাস্তায় ধূলায় আমার ধড়টি পড়িয়া কাটা ছাগলের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তখনও আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। তখনও সম্পূর্ণ আমি জ্ঞানহারা হই নাই। আমি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সহদেব বাগ্দী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় যে, তাহাকে আঘাত লাগে নাই। সে চঞ্চলার গরুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গরুটিও পথে পড়িয়া ছিল। গাড়ীর আর একটি চাকায় তাহারও কোমর পর্য্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছিল। তাহার কোমর ও পা কিন্তু গাড়ীর চাকায় লাগিয়া যায় নাই। একদিকে গরুর ধড় ও অপরদিকে তাহার কোমর ও পা রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। বিষণ্ণ বদনে সহদেব তাহাই দেখিতেছিল।

সেই পথ দিয়া ভিকু ডাক্তার ব্যাগ হাতে লইয়া চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া আমার কোমর ও পা দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে তিনি জুড়িয়া দিলেন। তাহার পর ব্যাগ খুলিয়া দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি আমার মুখে দিলেন। ঔষধের গুণে সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে জুড়িয়া গেল। তাহার পর আর দুইটি বড়ি তিনি আমার মুখে দিলেন। তাহা খাইয়া আমি শরীরে বল পাইলাম। কিন্তু মানুষের মত গরুর দুই পায়ে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গরুর দুই পা আর আমার দুই হাত মাটীতে পাতিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আমাকে দাঁড়াইতে হইল।

ইতিমধ্যে সে স্থানে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। এই অবস্থায় সকলে আমাকে গ্রামের ভিতর লইয়া গেল। সে স্থানে গিয়া ভিকু ডাক্তার বলিলেন,—'ডমরুবাবু! তুমি আমার পাওনা টাকা দাও নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে। কিন্তু এখন তোমার এই শরীরটি আমার হইল। গরুর কোমর তোমার শরীরে যদি আমি না জুড়িয়া দিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন কালে তুমি মরিয়া যাইতে। দুইদিন পরে তোমার ধড়টি পচিয়া যাইত, অথবা পুড়িয়া ছাই হইত। অতএব তোমার এই শরীরটি এখন আমার। আমার চাষ আছে। যতদিন বাঁচিবে, ততদিন আমার ক্ষেত্রে তোমায় কাজ করিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া আমার গলায় গরুর দড়ি দিয়া তিনি টানিতে লাগিলেন।

চঞ্চলার পিতা সহদেব তাঁহার হাত হইতে দড়ি কাড়িয়া লইল। সে বলিল,—'ভাল রে ভাল! ইনি তোমার? সে কিরূপ কথা? ইঁহার আধখানা চঞ্চলার গাই। এখনও ইঁহার দুধ হইবে। আমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দিব না।'

আমাকে লইয়া দুইজনে বিবাদ বাধিয়া গেল। এ বলে ইনি আমার প্রাপ্য, ও বলে আমার প্রাপ্য। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে গ্রামের লোক সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিল। দিনের বেলা আমাকে ভিকু ডাক্তারের নিকট থাকিতে হইবে। সমস্ত দিন তিনি আমাকে খাটাইয়া লইবেন। রাত্রিকালে আমি চঞ্চলার গোয়ালে বাঁধা থাকিব। প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দুহিয়া ভিকু ডাক্তারের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দিবে। একবেলা ভিকু

ডাক্তার আমাকে খাইতে দিবেন, অন্য বেলা সহদেব বাগদী আমাকে খাইতে দিবে।

প্রথম দিন আর আমাকে কোন কাজ করিতে হয় নাই। সেদিন চঞ্চলার গোয়ালে খোঁটায় আমি বাঁধা রহিলাম, পাছে হাত দিয়া দড়ি খুলিয়া আমি পলায়ন করি, সেজন্য হাত দুইটিও তাহারা বাঁধিয়া রাখিল। ইহার পর প্রতি রাত্রিতে তাহারা এইভাবে আমাকে বাঁধিয়া রাখিত, সন্ধ্যাবেলা চঞ্চলা আমাকে দুইটি মুড়ি খাইতে দিত। যতদিন ইহাদের নিকট ছিলাম, ততদিন দুই বেলা দুইটি মুড়ি আমার আহার ছিল। একবেলা ভিকু ডাক্তার দিত, অন্য বেলা চঞ্চলা দিত। আমার দাঁত নাই, মুড়ি চিবাইতে পারিতাম না। প্রাণধারণের নিমিত্ত কোনরূপে গিলিয়া ফেলিতাম।

'পরদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দোহন করিল। প্রায় দুই সের দুধ হইল। তাহার পর সে বাছুর ছাড়িয়া দিল, বাছুর আমার দুধ খাইতে লাগিল ও মাঝে মাঝে বাছুর আমার পেটে মাথার গুড়ো মারিতে লাগল। তাহার গুঁতোতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় ভিকু ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,— 'ডমরুবাবুর ঐ পেট এখন আমার। পেট আমার ভাগে পড়িয়াছে। পেটে আমি বাছুরকে মারিতে দিব না। তাহার গুঁতে যদি ডমরুবাবুর নাড়ীভূঁড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের নামে আমি নালিশ করিব।' সেইদিন হইতে চঞ্চলা বাছুরের দড়ি টানিয়া রাখিত। বাছুর আমার পেটে আর গুড়ো মারিতে পারিত না।

দুধ দোহন হইলে ভিকু ডাক্তার আমাকে তাঁহার ক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। কৃষককে বলিলেন যে,—'একটা গরুর সহিত ইহাকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দাও।'

কৃষক তাহাই করিল। মানুষের হাত কোমল তাহাতে ক্ষুর নাই। কিন্তু এখন আমাকে দুইটি হাত মাটিতে পাতিয়া গরুর ন্যায় চলিতে হইয়াছিল। আমার হাতে কাঁটা খোঁচা ফুটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোরতর কষ্টে আমার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, আমার নুদুর-নাদুর নধর শরীরটি এইবার মাটি হইয়া গেল। আমার সঙ্গী বলদের সহিত সমান ভাবে আমি ক্ষেত্রের উপর লাঙ্গল কাঁধে করিয়া চলিতে পারিতেছিলাম না, সেজন্য কৃষক আমার লাঙ্গুলে সবলে মোচড় দিতে লাগিল। এমন সময় সহদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহদেব বলিল,—'ও কি! তুমি উহার লেজ মলিতে পারিবে না। লেজ তোমাদের নহে, লেজ আমাদের ভাগে পড়িয়াছে।'

কৃষক আর আমার লাঙ্গুল মর্দ্দন করিল না বটে, কিন্তু আমার পিঠে ছড়ি মারিতে লাগিল। ফলকথা, আমার দুঃখের আর সীমা রহিল না। সন্ধ্যাবেলা ভিকু ডাক্তার আমাকে চঞ্চলার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। চঞ্চলা আমাকে তাহার গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমার দুধ দুহিয়া পুনরায় আমাকে ভিকু ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিল। পুনরায় আমাকে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া ক্ষেত চষিতে হইল।

প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। মনের দুঃখে রাত্রিদিন আমি কাঁদিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে, হায় হায়! স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া দেশের লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া যে এত টাকা উপার্জন করিলাম, সে সব বৃথা হইল। এলোকেশী অথবা তোমরা বন্ধু-বান্ধব কেহ আমার কোন সন্ধান লইলে না, সেজন্য আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লম্বোদর বলিলেন,—'আজ ছয়মাস প্রতিদিন দুইবেলা তোমাকে দেখিতেছি। তোমার আবার সন্ধান কি লইব? কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, সে সব জগদম্বার মায়া। তবে আমরা আর কি বলিব?'

ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—দিন দিন আমি দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার সে নুদুর-নাদুর নধর শরীর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাইলাম। ভালরূপ লাঙ্গলও টানিতে পারি না, দুধও দিতে পারি না। প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমাকে যথারীতি দুহিতে আসিল। কিছুমাত্র দুধ হইল না। পিতাকে গিয়া সে সেই কথা জানাইল। সহদেব বলিল যে,—'কাল প্রাতঃকালে আমি দুহিয়া দেখিব।' পরদিন প্রাতঃকালে সে নিজে আমাকে দুহিতে আসিল। একফোঁটাও দুধ বাহির হইল না। তখন সে বিড় বিড় করিয়া আপনা-আপনি বলিল,—'পুনরায় বাছুর না হইলে দুধ হইবে না, তাহার যোগাড় করিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। একে লাঙ্গল টানিয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার বাছুরের যোগাড়!

সে রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। ক্রমাগত আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা! চিরকাল তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। সন্ন্যাসীর হাত হইতে, বাঘের মুখ হইতে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। এখন কেন মা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?'

এইরূপ স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সহসা কে যেন আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—'ভয় নাই বাছা, ভয় নাই! শীঘ্রই তোমাকে আমি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। গত বৎসর তোমার পূজায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল। সেই পাপের জন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে।'

মা যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শঙ্কর ঘোষ আসিয়া বলিল,—'তুমি আমাকে টাকা ফাঁকি দিয়াছ। চল, তোমাকে আমি পুলিশে দিব।'

এই বলিয়া সে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে সংবাদ পাইয়া ভিকু ডাক্তার দৌড়িয়া আসিলেন,—তিনি বলিলেন,—'ধড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ধড় আমার সম্পত্তি।'

এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাম হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া চঞ্চলা সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। সে বলিল,—'ইহার নীচের দিকটা আমার। আমার গাইগরু।'

এই বলিয়া সে আমার পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল।

এমন সময় 'হু হু' পালকির শব্দ হইল। আমি ও অপর সকলে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। এলোকেশী ঠাকুরাণী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পালকি হইতে নামিলেন। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন,—'ইনি আমার স্বামী। তোমরা ছাড়িয়া দাও। ইঁহাকে আমি বাড়ী লইয়া যাইব। বাড়ী গিয়া ঝাঁটাপেটা করিয়া ইঁহার ভূত ছাড়াইব।'

এই কথা বলিয়া তিনি আমার পশ্চাৎ দিকের বাম পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। আপন আপন দিক কেহই ছাড়িয়া দিল না। একদিকে শঙ্কর ঘোষ ও ভিকু ডাক্তার আমার দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অপর দিকে চঞ্চলা ও এলোকেশী দুই খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহাদের টানাটানিতে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। 'ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও' বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই ছাড়িল না।

অবশেষে তাহাদের টানাটানিতে আমার শরীর হইতে ফস করিয়া চঞ্চলার গাই-গরুর কোমর ও পা খসিয়া পৃথক হইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহা জানি না; যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, আমি আমার ঘরে শয়ন করিযা আছি। আমি উঠিয়া বসিলাম। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মানুষের দুইটি পা, গরুর পা নহে। তাহাতে লোম নাই, খুর নাই, কেবল মানুষের পায়ের পাতা। ফলকথা, আমার পা। শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, আমার নদুর-নাদুর নধর শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে। শুষ্ক হইয়া যায় নাই। ঘরের ভিতর শঙ্কর ঘোষ অথবা ভিকু ডাক্তার অথবা চঞ্চলা, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এলোকেশী বাক্স খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছিলেন।

আমি জাগরিত হইয়াছি দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন,—'কাল রাত্রিতে ওরূপ বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?'

আমি কোনও উত্তর করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে,—সকলই জগদম্বার মায়া! সমুদয় মায়ের লীলা।

ষষ্ঠ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাহেবের সাজ

ডমরুধরের বাস কলিকাতার দক্ষিণ, যেস্থানে অনেক কাটিগঙ্গা আছে। প্রথম অবস্থায় ইনি দরিদ্র ছিলেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে ধনবান হইয়াছেন। এলোকেশী ইঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ডমরুধর বৃদ্ধ, সুপুরুষ নহেন।

তথাপি এলোকেশীর সর্বদাই সন্দেহ। গত বৎসর দুর্লভী বাগদিনী ডমরুধরকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে এলোকেশীও তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ডমরুধর সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি দুর্গোৎসব করেন। সুন্দরবনে ডমরুধরের আবাদ আছে। প্রজাদিগের নিকট হইতে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস্য প্রভৃতি আদায় করেন। প্রতিমাটি গড়া হয়, কিন্তু পূজার উপকরণ,—'প্রায় সমস্তই কাটিগঙ্গার জল। আজ পূজার পঞ্চমীর দিন, দালানে প্রতিমার পার্শ্বে বন্ধুগণের সহিত বসিয়া ডমরুধর গল্প-গাছা করিতেছেন।'

লম্বোদর বলিলেন,—'এবার তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ, যে ভয়ানক রোগ হইয়াছিল, তাহাতে পূজার সময় তোমার গল্প যে আবার শুনিব, সে আশা আমরা করি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! এবার আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। মা দুর্গার আমি বরপুত্র। সেবার সন্ন্যাসী-বিভ্রাট হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় গত বৎসর বাঘের মুখ হইতে আমি বাঁচিয়াছিলাম। এবার উৎকট রোগ হইতে তিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। সমুদয় দুর্ঘটনা নষ্টচন্দ্র দেখিয়া ঘটিয়াছিল।

আধকড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নষ্টচন্দ্র দেখিয়া কি হইয়াছিল?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সে কথা এতদিন আমি প্রকাশ করি নাই। কি হইয়াছিল তাহা শুন। এবার আমি নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলাম। নষ্টচন্দ্র দেখিলে চুরি করিতে হয়। মনে করিলাম যে, দুর্লভীর উঠানে যে শশা গাছের মাচা আছে তাহা হইতে শস্যা চুরি করিয়া আনি। বাহিরে যাহাই বলুক, কিন্তু দুর্লভীর মনটা আমার উপর আছে। শসা চুরি করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি, এলোকেশী যদি কিছু বলেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, নষ্টচন্দ্র দেখিয়া চুরি না করিলে কলঙ্ক হয়।

চুপে চুপে আমি শসা চুরি করিতে যাইলাম। কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, দুর্লভী কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া ঠেঙা হাতে করিয়া দাওয়াতে বসিয়া আছে। তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রসর হইতে আমি সাহস করিলাম না।

সে রাত্রি আমার চুরি করা হইল না। মনে করিলাম যে, আজ রাত্রিতে না হউক, তিন দিনের মধ্যে কিছু চুরি করিলেই নষ্টচন্দ্রের দোষ কাটিয়া যাইবে। কোথায় কি চুরি করি, রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুর্লভীর বাড়ীর পার্শ্বে গদাই ঘোষের পুষ্করিণী আছে। তাহাতে অনেক মাছ আছে। গদাই ঘোষ দুর্লভীর জিম্মায় পুষ্করিণীটি রাখিয়াছে। মনে করিলাম যে, কাল বৈকালবেলা ছিপ ফেলিয়া সেই পুষ্করিণী হইতে মাছ চুরি করিব।

সুন্দরবনে আমার আবাদের নিকট একবার জনকয়েক সাহেব শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি টুপি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। টুপিটি কুড়াইয়া আমি বাড়ী আনিয়াছিলাম। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই টুপিটি বগলে লইয়া ছিপ হাতে করিয়া আমি গদাই ঘোষের পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইলাম; যে ধার দিয়া লোক গতায়ত করে, তাহার বিপরীত দিকে এক কোণ বনে পূর্ণ ছিল। ঝোপের ভিতর গিয়া আমি সাহেবদের সেই কালো রঙের ধুচুনির মত লম্বা টুপিটি মাথায় দিলাম। আজকালের বাবুদের মত গায়ে আমি জামা পরি না। কোমরে কেবল ধুতি ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে যে, সাহেব মাছ ধরিতে আসিয়াছে। সাহেব দেখিলে কেহ কিছু বলিবে না।

নিকটের জল—নাল-ফুল ও কলমি শাকের গাছে পূর্ণ ছিল। কেবল এক স্থানে একটু ফাঁক ছিল। ময়দার টোপ গাঁথিয়া আমি সেই পরিষ্কার স্থানে ছিপ ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পর বোধ হইল যেন মাছে ঠোকরাইল। আমি টান মারিলাম। বঁড়সি জলের ভিতর নাল গাছে লাগিয়া গেল। অনেক টানাটানি করিলাম, অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। তখন বুঝিলাম যে, জলে নামিয়া না খুলিলে আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু কাপড় ভিজিয়া যাইবে, জলে কি করিয়া নামি! চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কেহ কোথাও নাই। কাপড় খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া জলে নামিলাম। একবুক জল হইল। অতি কষ্টে নাল গাছের ডাঁটা হইতে বঁড়শি খুলিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় পরিতে যাই—সর্বনাশ! যে স্থানে কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলাম সে স্থানে কাপড় নাই। বনের ভিতর চারিদিকে অনেক খুঁজিলাম, কাপড় দেখিতে পাইলাম না।

তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই। সে উলঙ্গ অবস্থায় আমি বাটী ফিরিয়া যাইতে পারি না। কি করিব। চার করিয়া

পুনরায় ছিপ ফেলিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এ সেই কেষ্টা ছোঁড়ার কর্ম্ম. সে আমার টাকের বর্ণনা করিয়া আমাকে ক্ষেপায়। সে দূর হইতে আমাকে বলে—টাক-চাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর।

কেষ্টা ছোঁড়াব অগম্য স্থান নাই। যখন জলে নামিয়া, পিছন ফিরিয়া এক মনে আমি বঁড়শি খুলিতেছিলাম, সেই সময় সে আমার কাপড় লইয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে। সে দুর্লভীকে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল। কারণ, অল্পক্ষণ পরেই দুর্লভী ও হিরী বাগদিনী আসিয়া পুষ্করিণীর অপর পাড়ে দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া দুর্লভী বলিল,—'একটা সাহেব!'

হিরী বাগদিনী বলিল,—'সাহেবটার গায়ের রং কালো মিশমিশে। যাহারা পাখী মারিতে আসে, সেই সাহেব।'

দুর্লভী বলিল.—'তা নয়। ওটা নেঙটা গোরা।'

হিরী বলিল,—'সর্বনাশ! নেঙটা গোরা! তবে আমি পলাই; যাকে বলে ব্রাণ্ডি, তাই উহারা খায়।'

দুর্লভী বলিল,—'চল, গদাই ঘোষকে গিয়া বলি।'

আমি ভাবিলাম,—'ঘোর বিপদ হইল। সমস্ত গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া গদাই ঘোষ হয় তো এখনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথায় কেবল এক সাহেবি টুপি। এ অবস্থায় সকলে হয় তো আমাকে এলোকেশীর নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবে। সাহেবের পোষাক পরিয়া দুর্লভীর ঘরের নিকট আমি গিয়াছিলাম. তাহা শুনিলে এলোকেশী আর রক্ষা রাখিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারিকেলের বোরা

ছিপগাছটা আমি ফেলিয়া দিলাম। প্রথম বনের ভিতর দিয়া, তাহার পর পুকুরপারের নীচে দিয়া দুর্লভীর ঘরের পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হইলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে, তাহার ঘরে কেহ নাই। দ্বারটি কেবল ভেজানো আছে। চুপ করিয়া আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার। চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। একখানি কাপড় কি একখানি গামছা দেখিতে পাইলাম না। কি করি টুপি মাথায় দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে একটু অন্ধকার হইলে পলায়ন করিব। আর যদি দুর্লভী দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সাহেবের পোষাক দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইবে।

ওদিকে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। গদাই ঘোষ গ্রামের চৌকিদার ও অন্যান্য লোক লইয়া পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইল। মহা গোল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইলাম। ভয়ে সর্বশরীর আমার কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের সেই কোণে বনের ভিতর তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিল। ছিপ দেখিতে পাইল। কিন্তু সাহেবকে তাহারা দেখিতে পাইল না। হতাশ হইয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন দুর্লভী আসিয়া আপনার দাওয়া বা পিঁড়িতে বসিল।

এমন সময় রসিকের মা আসিয়া বলিল,—'দুর্লভী! আমাকে শসা দিবি বলিয়াছিলি, কৈ দে।'

দুর্লভী বলিল,—'শসা তুলিয়া রাখিয়াছি। ঘরের বাম কোণে ডালায় আছে, গিয়া লও।'

আমি ঘরের বাম কোণে বসিয়াছিলাম। আমার ভয় হইল। কোণের দিকে আরও ঘেঁসিয়া বসিলাম। রসিকের মা ঘরের ভিতর আসিয়া কোণের কাছে অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। সহসা ঝনাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাম হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমার গায়ে তাহার হাত ঠেকিয়া গেল।

সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘরের ভিতর একটা ভূত বসিয়া আছে। সে আমার হাতে কামড় মারিয়াছে। আমার আঙ্গুলগুলা চিবাইতেছে। এখন আমার সর্বশরীর খাইয়া ফেলিবে।

পরে শুনিলাম, ঘরে যে দুর্লভী করাতে ইঁদুরকল পাতিয়া রাখিয়াছিল, রসিকের মায়ের হাত তাহাতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি হইয়াছে, কি হইয়াছে বলিয়া দুর্লভী দৌড়িয়া আসিল। দ্বারের নিকট তাহাকে ঠেলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন দুর্লভী আমাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—

'ভূত নহে, ভূত নহে, এ সেই নেঙটা গোরা; এতক্ষণ নেঙটা গোরা আমার ঘরের ভিতর বসিয়াছিল।'

তাহার চীৎকার শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি আর বাটী পলাইতে অবসর পাইলাম না। কিছু আগে পথের বামদিকে বিন্দু ব্রাহ্মণীর ঘর। বিন্দু ব্রাহ্মণী তখন গোয়ালে বসিয়া ঘুঁটে ধনাইয়া ধোঁয়া করিতেছিল; তাহার সেই একখানি মেটে ঘরের দ্বার খোলা ছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ঘরের ভিতর মিটমিট করিয়া এক কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল। বিন্দু ব্রাহ্মণীর কেহ নাই একলা সে সেই ঘরে বাস করে। তাহার অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল ও আতা গাছ আছে। তাহার ফল বেচিয়া সে দিনপাত করে।

আমি দেখিলাম যে, ঘরের এককোণে অনেকগুলি নারিকেল স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে পাঁচ বোরা বা গুণের থলি নারিকেল পূর্ণ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া বিন্দু সারি সারি উচ্চভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাহিরে গোল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, নেঙটা গোরা এইদিকে আসিয়াছে। এস, বিন্দুর ঘরের ভিতর দেখি; হয় তো এই ঘরের ভিতর সে বসিয়া আছে। আমি তখন মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম যে,—'মা! নষ্টচন্দ্র দেখিলে লোককে কি এত সাজা দিতে হয়? প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করি, এ বিপদ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

তোমাদিগকে আমি বার বার বলিয়াছি যে, আমার উপর মায়ের অপার কৃপা। মা তৎক্ষণাৎ আমার মনে বুদ্ধি দিলেন। নিকটে একটি খালি বোরা পড়িয়াছিল। সেই বোরার মুখে আমি আমার মাথা গলাইয়া দিলাম, তাহার পর টানিয়া আমার সর্ব শরীর পা পর্য্যন্ত তাহা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলাম। অবশেষে নারিকেলপূর্ণ থলির ন্যায় অপর পাঁচটি বোরার পার্শ্বে আমিও বসিয়া রহিলাম। তিন চারিজন গ্রামবাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিল যে, নেঙটা গোরা ঘরের ভিতর নাই। কেবল ছয়টি নারিকেলপূর্ণ থলি সারি সারি বসিয়া আছে।

ঘরের ভিতর নেঙটা গোরাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের ভয় হইল। একজন বলিল,—'তাহাকে এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। তবে এখন কোথায় গেল? এ নেঙটা গোরা নহে, এই বর্ষাকালে জল-কাদায় নেঙটা গোরা কোথা হইতে আসিবে? তাহার পর নেঙটা গোরা এত মিশমিশে কালো হয় না। এ নেঙটা গোরা নহে, এ নেঙটা ভূত।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বলাই চিত্তির বিবরণ

ভূতের কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল; বিন্দু আপনার দাওয়াতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল যে, কি কপাল করিয়া যে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রিতে ভূতে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী লইয়া বলাই চিত্তি বিন্দুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই জাতিতে সদ্গোপ। আমাদের গ্রাম হইতে আধক্রোশ মাঠ পারে আমডাঙ্গায় তাহার বাস। বিন্দুর ফল-পাকড় সে হাটে বিক্রয় করে।

বলাই বলিল,—'মা ঠাকুরাণি! গাড়ী লইয়া আমি নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি। নারিকেল দিবে বলিয়াছিলে, কই দাও। আজ আমার বাড়ীতে রাখিয়া দিব। কাল ভোরে ভোরে হাটে লইয়া যাইব।'

বিন্দু বলিল,—'ঘরের ভিতর বোরা করিয়া আমি একশত নারিকেল রাখিয়াছি। আজ তাহা লইয়া যাও। বাকী পরে দিব।'

আমি সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। আমার থলিটি সে প্রথম তুলিয়া লইল। পা দুইটি আমি থলির ভিতর গুটাইয়া লইলাম। 'সব ঝুনো', একবার বোঁটা দেখে, এই কথা বলিয়া সে আমাকে গাড়ীর সম্মুখভাগে বসাইয়া দিল। তাহার পর আর পাঁচটি নারিকেলের থলি আনিয়া আমার পশ্চাতে উচ্চভাবেই বসাইয়া দিল।

নারিকেল লইয়া বলাই গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বাড়ী যাইতেছে, সেজন্য গরু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। গ্রাম পার

হইয়া মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর বসিয়া থলির ভিতর যে স্থানে আমার চক্ষু দুইটি ছিল, সেই দুইটি স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমি অল্প ফাঁক করিয়া লইলাম। তাহার পর থলির ভিতর হইতে আমি আমার হাত দুইটি বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় আমার মাথা দিয়া বলাইয়ের পিঠে ঢু লাগিয়া গেল। বলাই আপনা-আপনি বলিল,—'সম্মুখের থলিটা নড়িতেছে। এখনি পড়িয়া যাইবে। ভাল করিয়া রাখি।'

এই কথা বলিয়া সে গাড়ী থামাইল ও বাম পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। সেই অবসরে আমিও দক্ষিণ পাশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলাই ভাবিল যে, থলিটা পড়িয়া গেল। গরুর সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া সে আমাকে তুলিতে আসিল। তাহার পর সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। নিশ্চয় সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে,—এতকাল নারিকেল বেচিতেছি, নারিকেলপূর্ণ বোরার ভিতর হইতে কালো কালো দুইটা পা বাহির হইতে কখনও দেখি নাই। সেই কালো কালো পা দুইটা দিয়া নারিকেলের বোরা যে ছুটিয়া পলায়, তাহাও কখনও দেখি নাই।

কিছুকাল সে সেই পা-ওয়ালা বোরার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর ' বাপ ' এইরূপ শব্দ করিয়া মাঠের মাঝখানে গাড়ী ফেলিয়া অ-পথ দিয়া ক্ষেত্রের আলি দিয়া পুনরায় আমাদের গ্রামের দিকে দৌড়িল। কিন্তু সে যে আমার ভয়ে সোজা পথ দিয়া আসিতে সাহস করে নাই, তখন তাহা আমি জানিতাম না। পাছে সে আসিয়া আমাকে ধরে, সেজন্য শরীর হইতে বোরা খুলিবার নিমিত্ত আমি আর দাঁড়াইলাম না। গুণে আবদ্ধ শরীরেই যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সোজাপথে আমি গ্রাম অভিমুখে দৌড়িলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে নেকো পালের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুণের ঈষৎ ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, তাহার দোকান খোলা রহিয়াছে, দোকানে আলো জ্বলিতেছে। অনেকগুলি লোকের কথাবার্ত্তা আমার কানে প্রবেশ করিল। দেখিলাম যে, দোকানের সম্মুখে একখানি খালি পাল্কি রহিয়াছে। এমন সময় একজন মানুষের সহিত আমার ধাক্কা লাগিয়া গেল। সেও পড়িয়া গেল, আমিও পড়িয়া যাইলাম। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও উঠিয়া পাছে চীৎকার করে, সেজন্য পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বনে গিয়া আমি প্রবেশ করিলাম। বন দিয়া আরও কিছুদুর গিয়া মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘরের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হই। শরীর হইতে গুণটা খুলিয়া কোমরে জড়াইলাম। গুণ হইতে একটু সূতা বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলাম। এখনও আমার মাথায় সেই সাহেবী টুপি ছিল। তাহার পর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক আমি দেখিতে লাগিলাম।

টুপিটি এখন আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম যে, নেকোর দোকানের সম্মুখে সে পাল্কি নাই। কিন্তু সে স্থানে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলাই চিন্তির বিবরণ শুনিতেছে। বলাই বলিতেছে,—'বিন্দু ঠাকুরাণীর নারিকেলের বোরার ভিতর ভূত ছিল। ভূত লইয়া আমি গাড়ীতে বোঝাই করিয়াছিলাম। মাঠের মাঝখানে সে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবার উপক্রম করিয়াছিল। অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।'

এমন সময় কেষ্টা ছোঁড়া সেই স্থানে আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমার ঠাকুরমা কোথায়? অনেকক্ষণ তেল লইতে আমার ঠাকুরমা দোকানে আসিয়াছিলেন। আমার ঠাকুরমা কোথায়?'

কিছুদিন পূর্বে কেষ্টা আমার বাগানে বাতাবি লেবু চুরি করিয়াছিল। সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম। অনেক মিনতি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বলিয়া দিয়াছিলাম যে, পুনরায় যদি সে আমার কোনও বস্তু চুরি করে, অথবা আমাকে ক্ষেপায়, তাহা হইলে তাহার নামে আমি নালিশ করিব। আজ আমার কাপড় লইয়া সে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে আমি নালিশ করি, সেই ভয়ে সে কাহারও নিকট আমার নাম করে নাই। ''ঐ পুকুরে কে মাছ ধরিতেছে'' দুর্লভীকে কেবল এই কথা বলিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এখন কেষ্টার ঠাকুরমা কোথায় গেল? কেষ্টার বাপ ও প্রতিবেশিগণ লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্রমে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলিল যে, নেঙটা ভূত কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। গোল শুনিয়া মেনী গোয়ালা-ছুড়ী ঘর হইতে বাহির হইল। মেনীর বয়স দশ বৎসর। ছয় বৎসর বয়স্ক একটি ভাই ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহ নাই। কয় বৎসর হইল, তাহাদের বাপ ও মা মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাসী কলিকাতায় এক বাবুর বাড়ীতে চাকরাণী ছিল। মাসী ইহাদিগকে টাকা দিত। মাসীও এখন মরিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মেনী ও ভিলে

মেনীর ছয় বৎসর বয়স্ক ভাইয়ের নাম ভিলে। ভিলের হাত ধরিয়া মেনী ঘর হইতে বাহির হইল। পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আমি যে বনের ভিতর বসিয়াছিলাম, কেষ্টার ঠাকুরমাকে অনুসন্ধান করিতে পাছে লোকে সেই স্থানে আসে, সেই ভয়ে মেনীর ঘর খালি পাইয়া আমি তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম . মনে করিলাম যে, গোলটা একটু মিটিলে মেনী ও তাহার ভাই নিদ্রিত হইলে আস্তে আস্তে আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব; গুণ পরিয়া বাহির হইলে লোকে আমাকে সন্দেহ করিবে।

ভিলের হাত ধরিয়া মেনী পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সুগন্ধী গোয়ালিনী ও অন্যান্য লোক পথ দিয়া যাইতেছিল। মেনী জিজ্ঞাসা করিল,—'গন্ধী মাসি! কি হইয়াছে? চারিদিকে এত গোল কেন?'

সুগন্ধী উত্তর করিল,—'আর বাছা, বলিব কি, সর্বনাশ হইয়াছে! কোথা হইতে একটা নেঙটা গোরা ভূত আসিয়াছে। বলাই চিন্তিকে সে খাইতে গিয়াছিল। তাহাকে খাইতে না পাইয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বলি যে, সে কেষ্টার ঠাকুরমাকে খাইবে না। সেটা গোরা ভূত. কেষ্টার ঠাকুরমাকে মেম করিবে, সেই জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছে।'

ভূতের নাম শুনিয়া মেনী তাড়াতাড়ি ভাইকে লইয়া ঘরে আসিল ও ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে শয়ন করিল। আমি ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম।

ভিলে বলিল,—'দিদি! রায়েদের বাড়ী হইতে আর ভাত আন না কেন? কাল কেবল একটা তাল খাইয়া আমরা ছিলাম। আমাকে সমস্ত দিয়াছিলে, তুমি কেবল একটুখানি খাইয়াছিলে। আজ আমরা কিছুই খাই নাই। রায়েদের বাড়ী হইতে কবে ভাত আনিবে?'

মেনী কেনারাম রায়ের শিশু-পুত্রকে লইতে, তাঁহারা দুইবেলা দুইটি ভাত দিতেন। বাড়ীতে আনিয়া সেই ভাত ভাই-ভগিনীতে ভাগ করিয়া খাইত। আজ দুইদিন হইল রায়ের শিশুপুত্র এক সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল, মেনী তাহা দেখে নাই, সেজন্য মেনীকে তাঁহারা ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

মেনী উত্তর করিল,—'রায়েদের খোকা সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল। সেজন্য তাঁহারা আর আমাকে ভাত দিবেন না।'

ভিলে বলিল,—'তবে দিদি, আমাদের কি হবে? ভাত কোথা হইতে আসিবে? ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে!'

মেনী বলিল,—'আর বৎসর ভড়েদের বাড়ী তুমি দুর্গা ঠাকুর দেখিয়াছিলে! সেই দশ হাত আর কত রাঙতা? ভড়েরা তোমাকে মুড়কি ও নাড়িকেল নাড়ু দিয়াছিল? পূজা হইয়া গেলে বোসেদের গঙ্গায় তাহারা ঠাকুর বিসর্জন করিয়াছিল, মা দুর্গা বোসেদের গঙ্গার ভিতর আছেন। কাল যদি তোমাকে দুইটি ভাত দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা দুইজনে বোসেদের গঙ্গায় যাইব। তোমাকে কোলে লইয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব; জলের ভিতর মা দুর্গা আছেন; তাঁহার কাছে আমরা যাইব। তিনি আমাদিগকে অনেক ভাত দিবেন, আমাদের সকল দুঃখ ঘুচাইবেন।'

ঘরের কোণে বসিয়া ভাই-ভগিনীর কথোপকথন আমি শুনিতেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি তখন কেবল নয়টা হইয়াছিল, আমার বাড়ীর দ্বার বন্ধ হয় নাই। চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুণ ফেলিয়া কাপড় পড়িলাম। তাহার পর এলোকেশীর মুখে শুনিলাম যে, কেষ্টার ঠাকুরমাকে লোকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের হীরক লাভ

মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘর ঠিক আমার বাগানের পাশে। ঐ স্থানটাতে আমার বাগানে একটু খোঁচ হইয়া আছে। মেনী ও তাহার ভাই মরিয়া গেলে ঐ ভূমিটুকু আমি লইব। তাহা হইলে আমার বাগানের খোঁচটি ঘুচিয়া যাইবে। তাহারা সত্য সত্যই বোসেদের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পরদিন প্রাতঃকালে বেলা দশটার

সময় আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। পথে দেখিলাম যে, কেষ্টাদের বাড়ীতে হু হু করিয়া একখানা পাল্কী আসিয়া লাগিল, পাল্কীর ভিতর হইতে কেষ্টার ঠাকুরমা বুড়ী বাহির হইল; তাহার পর লাঠি ধরিয়া ঠুক ঠুক করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বুড়ী কোথায় গিয়াছিল ও কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি সে স্থানে যাইলাম। শুনিলাম যে, গোবর্ধনপুর হইতে একজনদের বৌ লইয়া একখানা পাল্কী নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিল। বৌ রাখিয়া খালি পাল্কী সন্ধ্যার পর ফিরিয়া যাইতেছিল। নেকোর দোকানে পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ তামাক খাইতেছিল। সেই সময় কেষ্টার ঠাকুরমা তেল লইতে দোকানে আসিতেছিল। বোরার ভিতর থাকিয়া যে নেঙটা ভূতটা বলাই চিন্তিকে খাইতে গিয়াছিল, সেই ভূতটা আসিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু দোকানে অনেক লোক দেখিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু দোকানে অনেক লোক দেখিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সে বাতাসে মিশিয়া গেল। কেষ্টার ঠাকুরমা উঠিয়া ঘোরতর ভয়বিহ্বল হইয়া, সম্মুখে একখানা পাল্কী ও তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর দ্বার বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বেহারাগণ তাহা জানিতে পারে নাই; বলাই চিন্তির নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কী তুলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহারা গোবধনপুর পৌঁছিল। সেই স্থানে গিয়া পাল্কীর ভিতর বুড়ীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু ভূতের ভয়ে সে রাত্রিতে বুড়ীকে ফিরিয়া আনিতে পারিল না। কারণ, এ সামান্য ভূত নহে, এ নেঙটা গোরা ভূত! আজ প্রাতঃকালে বুড়ীকে বুড়ী ফিরিয়া আনিল। আমি ভাবিলাম যে, সামান্য একটা সাহেবের টুপি পরিয়াছিলাম, তাহাতে কি কাণ্ড না হইল। এ সব নষ্টচন্দ্রের খেলা!

গোয়ালা-ছুঁড়ী মেনীর বাড়ী গিয়া দেখিলাম যে, যাহারা শিশি-বোতল ক্রয় করে, সেইরূপ একটা লোক সে স্থানে বসিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা বোতল ও একটা শিশি আনিয়া মেনী তাহাকে দেখাইতেছে। শিশির ভিতর ছোট একখণ্ড কাচের ন্যায় কি ছিল। ভিলে তাহা বাহির করিয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ক্ষুদ্র কাচটাতে পল কাটা আছে, আর সেই পল হইতে নানা বর্ণের আভা বাহির হইতেছে। আমি ভাবিলাম যে, এরূপ কাচ ইহাদের ঘরে কোথা হইতে আসিল, যে স্থান হইতে আসুক, এ সামান্য কাচ নহে। বোতল ও শিশির লোকটা মেনীকে চারিটি পয়সা দিল। ভিলের নিকট হইতে আমি কাচখণ্ড চাহিলাম। ভিলে দিতে সম্মত হইল না। দুই পয়সা দিয়া তাহা আমি কিনিতে চাহিলাম। তখন মেনী বলিল,—'দাও, দাদা, দাও। কাচটুকু লইয়া তুমি কি করিবে? ডমরুবাবু দুই পয়সা দিলে আমাদের ছয় পয়সা হইবে। ছয় পয়সার চাউল কিনলে দুইদিন তোমাকে পেট ভরিয়া ভাত দিতে পারিব।'

ভিলে বলিল,—'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি কলাপাতা কাটিয়া আনি?'

মেনী বলিল,—'না ভাই, এখন নয়। রও, আগে নেকোর দোকান হইতে চাউল কিনিয়া আনি, ভাত রাঁধি, তখন কলাপাতা কাটিয়া আনিও।'

শিশি-বোতল লইয়া লোকটা চলিয়া গেল। কাচখণ্ড লইয়া আমিও বাটী আসিলাম! মনে করিলাম, কখনই এ সামান্য কাচ নহে। এবার কলিকাতা গিয়া কোনও জহুরীকে দেখাইব।

কিন্তু সেইদিন বৈকালবেলা আমি বিষম গোলযোগে পড়িলাম। কলিকাতা হইতে একটী লোক আসিয়াছিল। সে কেষ্টার বাপ, গ্রামের চৌকিদার, শিশি-বোতল ক্রেতা; মেনী, ভিলে ও অন্যান্য গ্রামবাসীকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার সেই লোকটা বলিল,—'আমি যোগেশবাবুর সরকার। আমার বাবুর বাড়ীতে এই বালিকার মাসী চাকরাণী ছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রী ঘোরতর পীড়িতা হইয়াছিলেন। ইহার মাসী তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রীর কানে দুইটী হীরার টপ ছিল। কিছুদিন পূর্বে একটী টপ হারাইয়া গিয়াছিল। ভালরূপ জোড়া মিলাইতে না পারিয়া অপর টপটী তাঁহার বাস্কয় তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ইহার মাসীকে তিনি সেই টপটী দিয়াছিলেন। তাহার সোণাটুকু ইহার মাসী বোধ হয় বেচিয়া ফেলিয়াছিল। কাচ মনে করিয়া হীরকখণ্ড শিশির ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মূল্য চারিশত টাকা। আপনি দুই পয়সায় তাহা ফাঁকি

দিয়া লইয়াছেন। যে টপটী হারাইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহা মিলিয়াছে। সেজন্য জোড়া মিলাইবার নিমিত্ত এই বালিকা ও তাহার ভ্রাতাকে চারিশত টাকা দিয়া হীরকখণ্ড লইতে বাবু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হীরকখণ্ড আপনি আমাকে প্রদান করুন।'

পয়সা দিয়া কিনিয়াছি, কেন আমি দিব, এইরূপ বলিয়া প্রথম আমি দিতে সম্মত হই নাই। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে, যোগেশবাবু আমাকে সহজে ছাড়িবেন না। চিরকাল মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছি। মামলা মোকদ্দমা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি বুঝিলাম যে, মোকদ্দমা হইলে হীরা আমি রাখিতে পারিব না, চাই কি আমার সাজা হইলেও হইতে পারে। ফলকথা, হীরা আমাকে ফিরিয়া দিতে হইল। যোগেশবাবু হীরার মূল্য চারিশত টাকা মেনী ও ভিলের নামে একস্থানে জমা রাখিয়াছেন। এক্ষণে প্রতি মাসে তিনি তাহাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেছেন।

হীরকও গেল, বাগানের খোঁচটীও ভাঙ্গিল না। মনে আমার ঘোরতর দুঃখ হইল। মা দুর্গাকে ভর্ৎসনা করিয়া আমি বলিতে লাগিলাম,—'মা! কেন আমার এরূপ হরিষে বিষাদ করিলে? চারি শত টাকা আমার হাতে দিয়া কেন আবার কাড়িয়া হইলে? এবার হইতে আর মা, তোমার আমি পূজা করিব না।'

পূজা করিব না শুনিয়া মা দুর্গার বোধ হয় রাগ হইল। আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পরদিন তিনি জ্বরাসুরকে প্রেরণ করিলেন। কম্প দিয়া আমার জ্বর আসিল। একদিন গেল, দুই দিন গেল, জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিন দিনে আমি বেচু ভূঞ্যাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। বেচু জাতিতে কৈবর্ত্ত। প্রথম সে চাষ করিত, এখন কবিরাজ হইয়াছে। চারি পাঁচখানা গ্রামে বেচুর বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। আমার হাত দেখিয়া বেচু শ্লোক পড়িয়া বলিল,—

কম্প দিয়া জ্বর আসে কম্প দেয় নাড়ী।
ধড় ফড় ক'রে রোগী যায় যম-বাড়ী।।

ইহাকে বিষ-বড়ি দিতে হইবে।

এলোকেশী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—'সে কি! তিন দিনের জ্বরে বিষ-বড়ি?'

বেচু বলিল,—'এ সামান্য বিষ-বড়ি নয়। এ নূতন ঔষধ সম্প্রতি আমি নিজে মনগড়া করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহার গুণ অনেক। এই দেখ, আমি নিজে আস্ত দুইটা খাইয়া ফেলি।'

এই কথা বলিয়া বেচু নিজে দুইটা বড়ি গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর মধুর সহিত খলে মাড়িয়া আমাকে ক'টা বড়ি খাইতে দিল।

বেচু চলিয়া গেল। তিন ঘণ্টা পরে তাহার ঔষধের গুণ প্রকাশিত হইল। আমার চক্ষু দুইটী লাল হইয়া উঠিল। বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রাণ যায় আর কি! এলোকেশীর মেজাজটা কড়া বটে, কিন্তু শরীরে অনেক গুণ আছে। মাটিতে পড়িয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ডমরুধরের বন্ধু আধকড়ি বলিলেন,—"হাঁ, সেই সময় আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। তোমার সেই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তোমার সেই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি বেচু ভূঞ্যাকে ডাকিতে যাইলাম। বেচু ঘরে ছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে, সে এক পানা-পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটী জবাফুলের ন্যায় হইয়াছে। পানা-পুকুরের পচা পাঁক তুলিয়া মাথায় দিতেছে। আমি বলিলাম,—'বেচু' করিয়াছ কি? ডমরুধরকে তুমি কি ঔষধ দিয়াছ? তোমার ঔষধ খাইয়া ডমরুধর মারা পড়িতে বসিয়াছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু উত্তর করিল,—'বড়ি খাইয়া আমিই বা কোন ভাল আছি।' আমি বুঝিলাম যে, সে অবস্থায় তাহাকে আর কোন কথা বলা বৃথা। পুনরায় তোমার বাটীতে আসিয়া মাথায় অনেক জল দিয়া সে যাত্রা তোমার প্রাণ আমরা রক্ষা করিলাম।"

ডমরুধর বলিলেন,—বেচুর ঔষধ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জ্বর আমার গেল না। পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তোমরা সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতে। তোমরা সকলেই মনে করিয়াছিলে যে, সে যাত্রা আমি আর রক্ষা পাইব না। একদিন রাঘব ও নকুল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিছানার দুইপার্শ্বে

দুইজনে বসিয়া আমাকে অনেক আশ্বাস ও ভরসা দিতে লাগিলেন।

রাঘব বলিলেন,—'দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অঙ্গদ মজুমদারকে আপনি জানিতেন? তাহার শরীরটী ঠিক ডমরুধরের মত ছিল। এইরূপ কাটি কাটি হাত, এইরূপ কাটি কাটি পা, শরীরে চর্বি একটুও ছিল না। তাহার পীড়াটিও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। চিতার উপর তাহাকে শোয়াইয়া যখন আমরা আগুন দিলাম, তখন সেই আগুনের তাতে তাহার শরীরটী শট্‌কে উঠিল। ধনুকের মত হইয়া তাহার মাজাটা চিতার উপর উঠিয়া পড়িল। কাঠ সব পুড়িয়া গেল। কিন্তু অঙ্গ পুড়িল না।

তাহাকে আমরা জলে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু আমরা স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে, পাঁচ ছয়টা কুকুর ও শৃগাল আসিয়া জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ডমরুবাবু, তোমার শরীরটিও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু তোমার ভয় নাই। আমরা অধিক কাঠ দিয়া দেখিব। তবে নিতান্তই যদি তুমি পুড়িয়া না যাও, তাহা হইলে কাজেই তোমাকে আধপোড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।'

নকুল ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিলেন,—'তোমার পুরোহিতের বাড়ী এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ। মন্ত্র পড়াইতে রাত্রিতে যদি আমাকে ঘাটে যাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ আমাকে দিয়া করাইতে হইবে। নিজের পুরোহিতকে দিয়া করাইতে পারিবে না। তুমি সে কথা বাড়ীতে বলিয়া রাখ। মৃত্যু হইয়া গেলে আর কথা বলিতে পারিবে না,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।।

এলোকেশী পাশের ঘরে বসিয়া এইসব কথা শুনিতেছিলেন। সহসা খেঙরা হস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় রণমূর্ত্তিতে আসিয়া সপ্‌ করিয়া এক ঘা নকুলের পিঠে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর আর এক ঘা রাঘবের মাথায়। ঘর হইতে দুইজনে পলাইলেন। এলোকেশী তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া আরও দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ

ঈষৎ হাস্য করিয়া আমি বলিলাম,—'এলোকেশী! তুমি এখন যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্দ্ধেক রোগ ভাল হইয়া গেল। আর আমাকে কোনওরূপ ঔষধ খাইতে হইবে না।' এলোকেশী সে কথা শুনিলেন না। পরদিন গোবর্ধনপুরে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন, জিহ্বা দেখিলেন, পেট টিপিয়া দেখিলেন। বুকের উপর বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির ডগা দিয়া অনেক ঠোকাঠুকি করিলেন। তাহার পর আমার বুকে চোঙ বসাইলেন। চোঙের অন্যদিকে কান দিয়া তিনি বলিলেন,—'এখানে একটা প্যাঁচ আছে।' এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা তিনি বলিলেন। প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার বুকে যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে, তখন আমি মরিব না, বহুকাল আমি বাঁচিব।

ডাক্তার তাহার পর পুলটিস ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খাইবার নিমিত্ত আমাকে সাবু দিতে বলিলেন। সাবুর নাম শুনিয়া আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—' কি! সাবুদানা? বিলাতী জিনিষ। তাহা আমি কখনই খাইব না। চিরকাল আমি পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। অখাদ্য খাইয়া আমি অধর্ম করিতে পারিব না। ডাক্তারবাবু! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর যমের বাড়ী গিয়াছিল! যখন আমার বিচার হয়, তখন আমি যমকে বলিয়াছিলাম যে, একাদশীর দিন কখন আমি পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই। যম সেই কথা শুনিয়া প্রসন্নবদনে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে পুলকিত মনে বলিলেন,—সাধু সাধু সাধু! এই মহাত্মা একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করেন না। ইঁহার পদাপণে আজ আমার যমপুরী পবিত্র হইল। শীঘ্র তোমরা যমনীকে শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাগণকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত, কোকিল-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত, অপ্সরা-পদ-নূপুর-ঝঙ্কৃনিত, হীরা-মাণিক-খচিত, নূতন এক স্বর্গ নির্মাণ করিতে

বল। শুনিলেন ডাক্তারবাবু! খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিলে কত ফল হয়? আমি আশ্চর্য্য হই যে, টিকিনাড়ারা এখানে ওখানে যায় কেন, ধর্মকথা শিখিতে আমার কাছে আসে না কেন?'

আমি পুনরায় বলিলাম,—'ডাক্তারবাবু! বুকে আমি তোমার ও জগদ্দল পাথর মস্‌নের পুলটিস চাপাইব না, তোমার ঔষধও আমি খাইব না। কেবল আমি মা দুর্গাকে ডাকিব, আর আমাদের কাটিগঙ্গার জল খাইব। আমাদের কাটিগঙ্গার জল মকরধ্বজের বাবা।'

আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেইদিন হইতে আমি কেবল কাটিগঙ্গার জল খাইতে লাগিলাম। সেই রাত্রিতে মা দুর্গা শিয়রে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—'ডমরুধর! বাছা! তুমি আমার বরপুত্র। কেন তুমি বলিয়াছিলে যে, আর আমার পূজা করিবে না? সেই জন্য তোমাকে এই রোগ দিয়াছি। কিন্তু ভয় নাই, তোমাকে আমি রোগ হইতে মুক্ত করিলাম। তাহার পর আরও একটু নূতন বুদ্ধি তোমাকে আমি দিলাম। এই বুদ্ধিটুকু তুমি খেলাইবে। তাহা হইলে হীরাখণ্ড হাতছাড়া হইয়া তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার দশগুণ তোমার লাভ হইবে। কিন্তু বাছা, তোমার পূজায় আমি যে তৃপ্তিলাভ করি, বঙ্গদেশে কাহারও পূজায় সেরূপ তৃপ্তিলাভ করি না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের নূতন বুদ্ধি

সেই দিন হইতে আমার রোগ দূর হইয়া গেল। জ্বর গেল। দিন দিন শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। রোগের পর আমার যেন নূতন শরীর হইল। এখন মা যে নূতন বুদ্ধিটুকু আমাকে দিয়াছেন, তাহা খেলাইয়া হীরকের দশগুণ টাকা আদায় করিতে আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একদিন বসিয়া বুদ্ধি খেলাইতেছি এমন সময় আমার মনে কোন বিষয় উদয় হইল। আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম। এলোকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাসিতেছ কেন?' আমি বলিলাম,—'চুপ কর। বুদ্ধি পাকিয়া আসিতেছে।'

খুলনা জেলায় বাঘেরহাটের নিকট নীলামে আমি এক মহল কিনিয়াছিলাম। তাহা লইয়া আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ত্রিশঙ্কুবাবুর সহিত মোকদ্দমা চলিতেছিল। অন্য বিষয়ে আমি টাকা খরচ করি না বটে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য টাকা খরচ করিতে কখনও কাতর হই না। এক একটা দলিল জাল করাইতে আমি পাঁচশত টাকা ব্যয় করি। এক এক জন মিথ্যা সাক্ষীকে আমি পাঁচ হইতে দশ টাকা দিয়া বশ করি। মিথ্যা মোকদ্দমা আমি যেমন সাজাইতে পারি, মিথ্যা সাক্ষীদিগকে আমি যেমন শিখাইতে পারি, এমন আর কেহ পারে না। আদালতে হলফ করিয়া আমি নিজে যখন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি, তখন কোন উকীল জেরা করিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। ত্রিশঙ্কুবাবু আমার সহিত পারিবেন কেন? দুটা আদালতে তিনি হারিয়া গিয়াছিলেন।

মহলের একস্থানে বনের ভিতর প্রাচীন ইটে গাঁথা একটী প্রাচীর ও শানের চাতাল ছিল। সেই চাতালের কথা আমার মনে পড়িল। আমি কলিকাতায় যাইলাম। কোন লোককে টাকা দিয়া একখানি তামার পাতে সে কালের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি কথা খোদিত করাইলাম। তাহা লইয়া ঘিটটু ধাঙ্গড়ের সহিত আমি বাঘেরহাট মহলে গমন করিলাম। ঘিটটুকে সেই চাতালের উপর সপরিবারে বাস করিতে বলিলাম। গাছের ডালপালা দিয়া তাহার উপর সে এক ঝুপড়ি প্রস্তুত করিল। ত্রিশঙ্কুবাবু বন্দুক লইয়া একটী কুকুরের সহিত প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই পথ দিয়া গমন করেন। আমি টোপ ফেলিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবু এখন কি করেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি খুলনায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিশঙ্কুবাবু মহলের নিকট সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘিটটু ধাঙ্গড়ের বৃদ্ধ মাতা ছোট একখানি তামার পাত মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ত্রিশঙ্কুবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর হাতে ওটা কি?'

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—'জানি না বাবু কি। উনুন করিবার নিমিত্ত চাতালের শান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এইটা আমি পাইয়াছি।'

ত্রিশঙ্কুবাবু হাতে করিয়া দেখিলেন। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় তাহাতে যে কথাগুলি লেখা ছিল তাহার একটু

দেখিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। এক টাকা দিয়া তামার পাতটী বৃদ্ধার নিকট হইতে তিনি কিনিয়া লইলেন। তাহার পরদিন খুলনার বাসায় তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, —'ডমরুধরবাবু সামান্য ঐ মহলটা লইয়া মিছামিছি আর মোকদ্দমা কেন? আপনারও টাকা খরচ হইতেছে, আমারও টাকা খরচ হইতেছে। দুইশত টাকায় আপনি মহলটী কিনিয়াছেন, পাঁচশত টাকায় মহলটী আমাকে ছাড়িয়া দিন।'

আমি উত্তর করিলাম, — 'মহলটীর জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি উহা ছাড়িব না।'

ত্রিশঙ্কুবাবু মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার, চারি হাজার পর্যন্ত উঠিলেন। তথাপি আমি সম্মত হইলাম না। চারি হাজার পর্যন্ত উঠিয়া তিনি বলিলেন, আর —'আর আমি পারি না। আর আমার ক্ষমতা নাই।'

অবশেষে সাড়ে চারি হাজার টাকায় আমি তাঁহাকে মহলটী বিক্রয় করিলাম। ধাঙ্গড়দিগকে লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরে শুনিলাম যে, ত্রিশঙ্কুবাবু প্রায় বিশ হাত গভীর করিয়া সেই চাতাল ও নিকটবর্তী স্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছিল। মাটীর ভিতর হইতে একটী পয়সাও বাহির হয় নাই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন? কি পাইবেন তিনি আশা করিয়াছিলেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, —'পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় সেই তাম্রফলকে লেখা ছিল—

বিসমিল্লা। আমি মহম্মদ তাহির প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক্ষণে পীর খাঞ্জে আলি সাহেব হইয়া মুসলমান হইয়াছি। আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের বংশধরগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এই চাতালের দশহাত নিম্নে আমি এক লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা পুঁতিয়া রাখিলাম। এই অর্থ জিন্দাগাজী সাহেবের আশ্রয়ে রাখিলাম। যখন আমার ব্রাহ্মণ বংশধরগণ নিতান্ত দরিদ্র হইবে, তখন তিনি এই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। ইতি ১৫ই জিলহিজ্জা ৮৬২ হিজরি।'

ঐ তাম্রপত্র আমি লেখাইয়া আনিয়াছিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবুকে দেখাইবার নিমিত্ত আমি ধাঙ্গড় বুড়ীকে দিয়াছিলাম। মায়ের কৃপায় বুদ্ধি খেলাইয়া হীরার দশগুণ মূল্য আমি লাভ করিলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—'ভাদ্র মাসে ভূত ভূত বলিয়া গ্রামে একটা গোল উঠিয়া ছিল বটে, কিন্তু তুমি যে তার গোঁসাই, তাহা জানিতাম না।'

সকলে বলিল, —'ধন্য ডমরুধর, ধন্য তুমি।'

ডমরুধর বলিলেন—'তাই সকলকেই আমি বলি, মা দুর্গাকে তোমরা ভক্তি কর। মা দুর্গা তোমাদিগকে ধন দিবেন, মান দিবেন, সব দিবেন। আর হাওয়াখোর বাবুদের আমি বলি যে, মায়ের পূজা ছাড়িয়া বিদেশে তোমরা হাওয়া খাইতে যাইও না। ঘরে থাকিয়া ভক্তিভাবে মায়ের পূজা কর। যত হাওয়া চাও, মা তোমাদিগকে দিবেন। ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া হাওয়া খাইতে পারিবে।'

সপ্তম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ · জিলেট মন্ত্র

পূজার পঞ্চমীর দিন ডমরুধর যথারীতি বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতিমার সম্মুখে বসিযা আছেন। হাঁ করিয়া তিনি বলিলেন, —'তোমরা একবার আমার মুখের ভিতর ভাল করিয়া দেখ।' সকলে দেখিলেন। লম্বোদর বলিলেন— 'তোমার মুখেব ভিতর কি আছে? কিছুই নাই। ফোকলা মুখ। তিমির গিরিগহ্বরের ন্যায়।' ডমরু উত্তর করিলেন, — 'তোমাদের পাপ চক্ষু তৈলপেশী বলদের ঠুলি দ্বারা আবৃত। তোমরা দেখিবে কেবল অন্ধকার।'

গজানন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমার মুখের ভিতর কি আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আমার জিহ্বা ও কণ্ঠে সরস্বতী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি মা দুর্গার বরপুত্র। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে যে দেবতাগুলি আগমন করেন, একে একে সকলের আরাধনা করিয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। কার্ত্তিকের বরে আমার কন্দর্পের ন্যায় রূপ হইয়াছে মা সরস্বতীর বরে আমি এত বড় বিদ্বান হইয়াছি। মেঘনাদবধ কে লিখিয়াছে জান?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'কেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ, সকলের তাই বিশ্বাস। কিন্তু কলিকাতায় যখন আমি চাকরী করিতাম, তখন সন্ধ্যার পর সাহেবী পোষাক পরিয়া কে আমার নিকট আসিত? দুই ঘন্টাকাল আমি যাহা বলিতাম, কে তাহা লিখিয়া লইত? সে লোকটি অপর কেহ নয়, সে লোকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদবধ কাব্য আগাগোড়া আমার দ্বারা রচিত। কিন্তু মাইকেল আমাকে অধিক টাকা দিতে পারিতেন না। টাকা দিতেন বঙ্কিম। কোনওদিন পাঁচ, কোনওদিন দশ। যেদিন 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম, সেদিন তিনি আমাকে একেবারে একশত টাকা দিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের জন্যও তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। মাইকেল ও বঙ্কিম অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—'মহাশয়! আপনি যে আমাদের পুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে সে কথা প্রকাশ করিবেন না।' সেই জন্য এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। আর দেখ, এখন যত বড় বড় গ্রন্থকার জীবিত আছেন, অন্ততঃ সাধারণে যাঁহাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া জানে, তাঁহাদের সমুদয় পুস্তকের প্রণেতা এই শর্মা। হাসি পায়। নাম করিব না। নাম করিলে, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম একেবারে যাইবে। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নাম করিতে তাঁহারা আমাকে মানা করিয়াছেন। সেই জন্য চুপ করিয়া আছি। কিন্তু তাঁহারা যে গ্রন্থকার বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, তাই আমার হাসি পায়।

এই দেখ, আজকাল হোমরুল বলিয়া একটা হুজুগ পড়িয়াছে। এই লোকটি সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমি শতগুণ বক্তৃতা করিতে পারি। আমার বক্তৃতা লোকে এইরূপ মুখভঙ্গী অবাক হইয়া শ্রবণ করে।

আমার প্রতি মা সরস্বতীর সামান্য কৃপা নহে। সে বৎসর কার্ত্তিকের ময়ূরে চড়িয়া আমি যখন আকাশ ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন মায়ের কৃপায় আমার মুখ দিয়া মহামন্ত্র বাহির হইয়াছিল। এ তোমার হিড়িং বিড়িং মন্ত্র নহে। জিলেট মন্ত্র। আসল বীজমন্ত্র। এ মন্ত্রের যে কি অদ্ভুত শক্তি, এতদিন তাহা আমি জানিতাম না। এইবার জানিতে পারিয়াছি। এই মন্ত্রের প্রভাবে আমি শুক্লাম্বর ঢাককে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। প্রেতযোনি-প্রাপ্ত তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। সমুদ্রযাত্রা-জনিত পাপ হইতে তাঁহার জামাতাকে পরিত্রাণ করিয়াছি।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন, —'শুক্লাম্বর ঢাকমহাশয়ের কি হইয়াছিল?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঢাকমহাশয়

ডমরুধর বলিলেন,—'শুক্লাম্বর ঢাকমহাশয় গুরুগিরি করেন। তাঁর অনেক শিষ্য আছে। গুরুগিরি করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জন হয়। দোতলা কোঠা বাড়ীতে তিনি বাস করেন। মোকদ্দমা-মামলা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ব্যুৎপত্তি , এরূপ ব্যুৎপত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে ঢাক-মহাশয় আমার সহায়তা করেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। ঢাকমহাশয় অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ। পূজা-আহ্নিক জপ-তপে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেজন্য তাঁহার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। আজকাল ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা করে না। টিকিনাড়ারা সে উপদেশ কাহাকেও প্রদান করে না। কিন্তু ঢাকমহাশয় সে প্রকৃতির লোক নহেন। কাহাকেও চা বা বরফ খাইতে দেখিলে তিনি আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেন।

গত বৈশাখ মাসে একদিন ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সূর্য্য অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন। রৌদ্রে পৃথিবী পুড়িয়া যাইতেছে। আমি তাঁহার বাড়ী গমন করিলাম। ঘোর পিপাসায় কাতর হইয়া আমি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া ফেলিলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঢাকমহাশয় আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা কুন্তলার প্রখর জ্বর হইয়াছে। কুন্তলার বয়স নয় বৎসর। আট বৎসর বয়সে ঢাকমহাশয় তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দুইমাস

পরেই সে বিধবা হইয়াছিল। দোতলার উপর যে ঘরে কুন্তলা শুইয়াছিল, ঢাকমহাশয়ের সহিত আমি সেই ঘরে গমন করিলাম।

জ্বরে কুন্তলার কাঠ ফাটিতেছে। আগুনের ন্যায় শরীরের উত্তাপ হইয়াছে। ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতেছে। মা একটু জল দাও, মা একটু জল দাও, এই কথা ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। মা! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল দাও মা! একটুখানি দাও। কেবল মাথাটি ভিজাইয়া দাও। একটু জল না খাইয়া আর থাকিতে পারি না। জল, জল, জল।

বিরস, বদনে মা নিকটে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে বাতাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

ঢাকমহাশয় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন,—'আজ একাদশী। বিধবা। সেইজন্য জল দিতে বারণ করিয়াছি। কিন্তু জল দিতে আমার গৃহিণীর ইচ্ছা। এখন করি কি? সেইজন্য তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম।'

নীচে গিয়া আমি বলিলাম,—'বাপ রে! জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্ম্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।'

ঢাকমহাশয় তাহাই করিলেন। কন্যাকে জল দিলেন না। রাত্রিতে পাছে নিজে জল চুরি করিয়া খায়, অথবা তাহার কষ্ট দেখিয়া মাতা, ভগিনী কি অপর কেহ পাছে তাহাকে জল প্রদান করে, সেজন্য সন্ধ্যার সময় কুন্তলাকে তিনি নীচের তলার এক ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি পীড়িত কন্যা একেলা সেই ঘরে রহিল। ধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে ঢাকমহাশয়ের এমনি দৃঢ়পণ।

প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘরের চাবি খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে, বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বার বার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এককোণে পড়িয়া আছে। মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার মাথাটি লুটিয়া পড়িল। সেদিন দ্বাদশী। মাতা তাহার মুখে জল দিলেন, কিন্তু সে গিলিতে পারিল না। দুই কশ দিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে আর কথা কহিল না। শেষকালে একবার মাত্র বলিল, —'জল—জল।' এই কথা বলিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন দেশশুদ্ধ লোক ঢাকমহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলে বলিল,— কি দৃঢ় মন! কি ধর্মের প্রতি আস্থা। এরূপ পুণ্যবান লোক কলিকালে দেখা হয় না। তাঁহার প্রতি লোকের এত ভক্তি হইল যে, এক মাসের মধ্যে তাঁহার এক শতের অধিক নূতন শিষ্য হইল।

কন্যার মৃত্যুতে ঢাকমহাশয়ের আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, বিধবা হইয়া চিরজীবন দুঃখে যাপন করা অপেক্ষা মরাই ভাল। কিন্তু মৃত কন্যা তাঁহাকে অধিক দিন আনন্দভোগ করিতে দিল না। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা 'জল, জল! হা জল! হা জল!' এইরূপ ভীষণ চীৎকার করিয়া সে বাড়ীর চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইল। সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে ঘোর ভয়ে ভীত হইল। ইহার চারদিন পরে ঢাকমহাশয়ের পুত্রটি মরিয়া গেল। এইবার ঢাকমহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পনের দিন পরে আবার কুন্তলার ভূত সেইরূপ জল জল করিয়া চীৎকার করিল। এবার মাতঙ্গিনী নামক দাসীর মৃত্যু হইল।

ফলকথা, যখনই কুন্তলার ভূত চীৎকার করিত, তখনই বাড়ীর একটা না একটা মরিতে লাগিল। দাসীর মৃত্যুর পর ঢাকমহাশয় গয়াতে পিণ্ড দিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। কারণ, কিছুদিন পরে পুনরায় যখন চীৎকার হইল, তখন ঢাকমহাশয়ের ছট্টু নামক চাকর মরিয়া গেল। বিধবা হইয়া একাদশীর দিন ভিজা মেঝে চাটা পাপটি সামান্য নহে। গয়াতে হাজার পিণ্ড দিলেও ইহা দিলেও ইহা ক্ষয় হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মোল্লা জামাতা

কুন্তলাকে কি উপায়ে করা যায়, সেই সম্বন্ধে ঢাকমহাশয় আমার সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

ঢাকমহাশয়ের এক বালক দৌহিত্র আছে। তাহার নাম ভুলু। ভুলু ঢাকমহাশয়ের প্রাণস্বরূপ। এক মুহূর্ত্ত তাহাকে

চক্ষুর আড় করিয়া ঢাকমহাশয় থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ পুত্রহীন হইয়া তাঁহার যত স্নেহ-মমতা ভুলুর উপর পড়িয়াছিল। পাছে কুন্তলার চীৎকারে ভুলুর কোনও অনিষ্ট হয়, সেজন্য ঢাকমহাশয় ঘোরতর ভীত হইলেন।

বিপদের উপর বিপদ। ঢাকমহাশয়ের জামাতা, ভুলুর পিতা, যাহার নাম কেশব, বোগদাদে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঢাকমহাশয়ের সম্ভাব ছিল না। ঢাকমহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি লড়াইয়ে মারা পড়িবেন। ভুলু ও ভুলুর মাতা চিরকাল তাঁহার নিকট থাকিবে। ভুলুর মাতার নাম কালিকা। বাল্যকাল হইতে তাহাকে আমি কোলে-পিঠে করিয়াছে। কন্যার ন্যায় তাহাকে আমি স্নেহ করি। এত চুল কখন আমি কাহারও দেখি নাই। কিছুদিন পূর্বে দোতলার ঘরে জানালার ধারে সে চুল এলো করিয়া বসিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব!

ঢাকমহাশয়ের জামাতা, কালিকা দেবীর স্বামী। ভুলুর পিতা কেশব লড়াইয়ে মারা যান নাই। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে আসিয়া তিনি কালিকা ও ভুলুকে লইতে পাঠাইলেন। ঢাকমহাশয়ের মাথায় ঠিক যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বললেন, —'কিছুতেই আমি আমার কন্যাকে ও দৌহিত্রকে তাহার বাড়ী পাঠাইব না। সে সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। তাহার জাতি গিয়াছে।'

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কয়েকজন শিষ্য যাহারা বি-এ, এম-এ পাশ করিযাছে, তাহারা বলিল যে, -- 'মহাশয়! এমন কাজ করিবেন না। আপনার জামাতা রাজকার্যে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। মহাসংগ্রামে পৃথিবী টলমল করিতেছে। জর্ম্মণদিগকে যদি সম্পূর্ণ পরাজিত করা না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। আমাদেরও সর্বনাশ হইবে। ইংরেজের প্রতাপে আমরা সুখে নিরাপদে বাস করিতেছি। আমাদের প্রাণপণে ইংরেজের সাহায্য করা উচিত। আপনি যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা করিলে রাজার বিরুদ্ধে কাজ করা হইবে। এমন কাজ কখন করিবেন না।'

এইরূপ কথা শুনিয়া ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আমি গিয়া বলিলাম,— 'ইংরেজ প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সাগর অতি ভয়ানক বস্তু। জগন্নাথে গিয়া আমি দেখিয়াছি তিনটা ঢেউ খাইয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। সে সাগর-পারে কেহ যাইলে হিন্দুধর্ম্মের গন্ধটী পর্য্যন্ত তাহার গায়ে থাকে না।'

আমি পুনরায় বলিলাম,— 'আর দেখুন, ঢাক-মহাশয়! বিলাতে বরং নিষ্কৃতি আছে। বিলাত গেলে সাহেব হয়, সাহেবি পোষাক পরে, সাহেবি খানা খায়। তা এখন বিলাত না গিয়াও লোকে এই কাজ করিতেছে। কিন্তু বোগদাদে গমন করিলে লোকে মোল্লা হয়। মোল্লা হইয়া পীরের গান করে। বলে,—

হুঁকো বন্দিলাম, কল্কে বন্দিলাম, আর বন্দিলাম টিকে।
আর তালগাছে বন্দিলাম প্রভু চামচিকে।।

তাহার পর সে আরব্য উপন্যাসের দেশ। জিন, দৈত্য ও দানবীতে পরিপূর্ণ। গুজব এই যে, আপনার জামাতা একটা দৈত্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। অতএব এরূপ লোকের সহিত কোন সংস্রব রাখিবেন না। তাহার বাড়ীতে আপনার কন্যাকে পাঠাইবেন না।' ঢাকমহাশয় তাহাই স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সন্দেশের হাঁড়ী

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কন্যা কালিকা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়ী যাইবার নিমিত্ত মাতার নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর নিকট তাঁহাকে পাঠাইবার নিমিত্ত মাতা ঢাকমহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঢাকমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে,— 'সে পতিত পাপিষ্ঠ সমুদ্র-প্রত্যাগত নরাধমের নিকট পাঠাইয়া আমি কন্যার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে পারি না।' হতাশ হইয়া কালিকা স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিত পূর্বে কেশব আসিয়া ঢাকমহাশয়ের খিড়কির নিকট এক বন্য জামতলায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জামতলায় অল্প বন ছিল। সেই বনের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুইজনে কথাবার্তা কহিতে

লাগিলেন। বন্য জামগাছ। অসময়ে ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কসা জাম হইয়াছিল। এখন কেষ্টা ছোঁড়া জাম গাছে উঠিয়া জাম খাইতেছিল। কেশব ও কালিকা তাহাকে দেখেন নাই; পতি-পত্নীর সকল কথা কেষ্টা শুনিতে পায় নাই। তবে, 'বুধবার সন্ধ্যার সময়' ইত্যাদি গোটা কতক কথা কেবল শুনিয়াছিল। যখন স্ত্রী-পুরুষের পরামর্শ শেষ হইবার উপক্রম হইল, তখন গাছ হইতে কেষ্টা বলিয়া উঠিল,— 'ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব।'

দুইজনে চমকিত হইলেন। একটু স্তব্ধ থাকিয়া কালিকা তাহাকে বলিলেন,— 'না, দাদা! তা কি বলিতে আছে? লক্ষ্মী দাদা! কাহাকেও কিছু বলিও না।'

কেশবকে লক্ষ্য করিয়া কেষ্টা জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি ইংরেজী জান?'

কেশব উত্তর করিলেন,—'হাঁ, একটু আধটু জানি। বি-এ পাশ করিয়াছি।'

কেষ্টা বলিল,-- 'শীঘ্রই আমাদের পূজার ছুটী হইবে। 'পূজার সময় তুমি কি করিয়াছ' এই মর্ম্মে মাষ্টার আমাদিগকে একটা প্রবন্ধ লিখিতে দিবেন। আমার এত কাজ যে, আমি লিখিতে অবসর পাইব না। তুমি যদি আমাকে লিখিয়া দাও, তাহা হইলে আমি বলিয়া দিব না।'

কেশব স্বীকার করিলেন। কেষ্টা তাহাকে তিন সত্য করিতে বলিল। কালিকাকেও সত্য করিতে হইল। তখন কেষ্টা গাছ হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। কেশবও আপনার গ্রামে চলিয়া গেলেন।

'বুধবার সন্ধ্যার সময়' এইরূপ দুই একটি কথা কেষ্টা সেদিন শুনিতে পাইয়াছিল। বুধবার সন্ধ্যাবেলা কেষ্টা ভাবিল,—যাই, গিয়া দেখি, আজ তাহারা কি করে। এইরূপ মনে করিয়া সে সেই জামগাছে উঠিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে সে দেখিল যে, কালিকা শরা-ঢাকা এক নূতন হাঁড়ী লইয়া ঘর হইতে চুপি চুপি বাহির হইলেন। জামতলার বনের ভিতর হাঁড়ীটি লুকাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। কালিকা চলিয়া গেলে, কেষ্টা গাছ হইতে নামিল ও দেখিল যে, হাঁড়ীর মুখে শরাখানি কালিকা ময়দা দিয়া আঁটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ময়দা কাঁচা ছিল। শরা একটু উঠাইয়া কেষ্টা দেখিল যে, হাঁড়ীটি সন্দেশে পরিপূর্ণ। কেশববাবু আসিয়া কালিকা দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সেই কথা ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব না, আমি এই অঙ্গীকার করিয়াছি। সন্দেশ খাইব না,—আমি এরূপ অঙ্গীকার করি নাই। অতএব আমি এই সন্দেশগুলি খাইব। এইরূপ মনে করিয়া কেষ্টা সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া বন হইতে বাহির হইল। পথে দাঁড়াইয়া সে দেখিল যে, সম্মুখ দিকে দুইজন গ্রামের লোক আসিতেছে। পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল যে, প্রেম চাকি ধানবোঝাই গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। কেষ্টা ভাবিল যে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে দিই, তা না করিলে আমি ধরা পড়িব। এইরূপ মনে করিয়া সে সন্দেশের হাঁড়ীটি গাড়ীওয়ালাকে দিয়া বলিল,—'প্রেমখুড়ো! কালিকা দিদি আমাকে সন্দেশ দিয়াছেন। আমি একেলা খাইব না। তোমাতে আমাতে দুইজনে খাইব। তুমি ঘোষেদের গঙ্গার ঘাটে গিয়া গাড়ী রাখ। একটু পরে আমি যাইতেছি।' [কলিকাতার দক্ষিণে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ স্থানে প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ লোকে ভাগ করিয়া লইয়াছে। তাই ঘোষেদের গঙ্গা, বসুদের গঙ্গা ইত্যাদি] প্রেম চাকি সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিল। কেষ্টাও অন্য পথ দিয়া সেই দিকে চলিল। প্রেম চাকি ঘাটে উপস্থিত হইয়া হাঁড়ীটি একটু খুলিয়া দেখিল যে, সন্দেশে পরিপূর্ণ। সে ভাবিল যে, আমার ছেলেদের জন্য সন্দেশ লইয়া যাইব! কেষ্টাকে ভাগ দিব না। কিন্তু এই সময় দেখিল যে, দূরে কেষ্টা আসিতেছে। তাড়াতাড়ি হাঁড়ীটির মুখ পুনরায় বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে একটি ঝুড়ি লইয়া হাঁড়ীটি ঝুড়ি লইয়া হাঁড়ীটি ঝুড়ি চাপা দিয়া তাহার উপরে সে বসিয়া রহিল। কেষ্টা আসিয়া সন্দেশের ভাগ চাহিল। প্রেমচাকি বলিল,—'আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল, মুখে সন্দেশ ভাল লাগিল, আমি সব সন্দেশ খাইয়া ফেলিয়াছি।' দুইজনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। এমন সময় কেষ্টা দেখিল যে, দূরে গজরাজ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কেষ্টা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে কালিকার মন সুস্থির নাই। জামতলায় সন্দেশের হাঁড়ী ঠিক আছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি আর একবার বনের নিকট গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, বনের ভিতর সন্দেশের হাঁড়ী নাই। কালিকা কাঁদিয়া উঠেলেন। আমার হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে, এই বলিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন বৈকালবেলা আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। ঢাকমহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আমি নানা বিপদে

পড়িতেছি। মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, অতএব আর আমি মা দুর্গার পূজা করিব না। কথা শুনিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে যাইলাম। আমি বলিলাম যে, মা দুর্গা পরম দয়াময়ী। যাহা হইবার, তাহা হইবার গিয়াছে। ভক্তিভাবে ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করুন। তাহা হইলে আমাকেও যেরূপ তিনি নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, আপনাকেও তিনি সেইরূপ নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

কিন্তু প্রথম তিনি আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাহার পর যখন আমি বলিলাম যে, পূজা বন্ধ করিলে, শিষ্য-সেবক যে বার্ষিক প্রদান করে, তাহার কি হইবে? তখন তিনি পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

আমাদের দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কালিকার কান্নার শব্দ আমাদের কানে প্রবেশ করিল। আমরা সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছে?'

কালিকা উত্তর করিলেন যে,—'আমার সন্দেশের হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে?'

আমি বলিলাম,—'গোটা কত সন্দেশের জন্য এত কান্না কেন? ঢাকমহাশয় তোমাকে অনেক সন্দেশ কিনিয়া দিবেন।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উড়ুখখু হাঁড়ী

ক্রমে সকল কথা প্রকাশ পাইল। পিতার অগোচরে কালিকা ঘর হইতে পলায়ন করিবেন, স্বামীর সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। বুধবার সন্ধ্যাবেলা কেশব ঘোড়ার গাড়ীতে কাটি গঙ্গার ঘাটের নিকট লুক্কায়িত থাকিবেন। একটু অন্ধকার হইলে কালিকা ভুলুকে লইয়া সেই স্থানে গমন করিবেন। তাহার পর ঘোড়ার গাড়ীতে রেল-স্টেশন যাইবেন। সে স্থান হইতে রেল গাড়ীতে কেশব স্ত্রী-পুত্র লইয়া আপনার গ্রামে গমন করিবেন। বাক্স লইয়া গেলে পাছে কেহ জানিতে পারে, সেজন্য কালিকা আপনার গহনাগুলি হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর সন্দেশচাপা দিয়া বনে রাখিয়াছিলেন। যাইবার সময় লইয়া যাইবেন এইরূপ মানস করিয়াছিলেন।

যখন এইসব কথা প্রকাশ হইল, তখন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কে সে হাঁড়ী লইয়া গেল, তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দুইজনে গ্রামের লোক বলিল যে, সন্ধ্যার সময় তাহারা জামগাছের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পেমা চাকি গরুর গাড়ী লইয়া সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। কেষ্টা তাহাকে একটা হাঁড়ী দিল। ইহা তাহারা দেখিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ একজন লোক প্রেম চাকির বাড়ীতে দৌড়িল। আর একজন লোক কেষ্টার বাড়ীতে গেল। আমার চাকর গজরাজকে আমি গঙ্গার ঘাটে পাঠাইলাম। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম যে,—'সেস্থানে যদি তুমি পেমা চাকিকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে গাড়ীশুদ্ধ তাহাকে ধরিয়ে আনিবে।'

গজরাজ তাহাই করিল। প্রেম চাকির গাড়ী আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। হাঁড়ী পাইলাম না। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, হাঁড়ীতে কেবল সন্দেশ ছিল না, তাহার ভিতর অনেক গহণা ছিল, তখন সে বলিল যে, যেস্থানে সে গাড়ী রাখিয়াছিল, তাহার নিম্নে ভূমিতে ঝুড়ি চাপা সেই হাঁড়ী আছে। তখন আমরা সককেই গঙ্গার ঘাটের দিকে দৌড়িলাম।

এদিকে সন্ধ্যার সময় কেশব রেল-ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কাটিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু দূরে ঘোড়ার গাড়ী রাখিয়া তিনি ঘাটের নিকট গমন করিলেন। তখনও সে স্থানে কালিকা ও ভুলু আসে নাই। কিন্তু দেখিলেন যে, একটা ঝুড়ি উপুড় হইয়া রহিয়াছে। ঝুড়িটি তুলিয়া দেখিলেন যে, নিম্নে একটি হাঁড়ী রহিয়াছে। হাঁড়ীর ভিতর সন্দেশ। কেশব মনে করিলেন যে গাড়ীতে ভুলু খাইবে, সেই জন্য কালিকা এই সন্দেশগুলি কাহারও হাতে গোপনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হাঁড়ীটা কোলে লইয়া তিনি কালিকা ও ভুলুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে কেশব দেখিলেন যে, কিছুদূরে অনেক লোক ঘাটের দিকে আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত তিনি অন্য পথে দ্রুতবেগে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। গোয়ালের কোণে হাঁড়ীটি রাখিয়া তিনি গোয়ালের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন।

সকলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া ঝুড়ি দেখিতে পাইল। কিন্তু ঝুড়ি তুলিয়া দেখিল যে, তাহার নিম্নে হাঁড়ী নাই। হতাশ

হইয়া সকলে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে বিলক্ষণ একটা জনতা হইয়াছিল। কালিকাও সকলের সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেশব লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিকার মুখে সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—'কেন! হাঁড়ী আমি লইয়া আসিয়াছি। গোয়ালের কোণে তাহা আমি রাখিয়া দিয়াছে।'

আহ্লাদিত হইয়া কালিকা আলোকে লইয়া মাতা-পিতার সঙ্গে গোয়ালে প্রবেশ করিলেন। আঁতপাতি করিয়া গোয়ালের সকল কোণ, গোয়ালের সকল স্থান অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু হাঁড়ী পাইলেন না।

কালিকা পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিন্দি নামক ঢাকমহাশয়ের ঝি বলিল যে,—'সে প্রতিদিন সকলের পাতের খাবার কুড়াইয়া তাহার বোনঝির নিমিত্ত গোয়ালের কোণে রাখিয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলা তাহার বোনঝি লইয়া যায়। সে হয়তো হাঁড়ী লইয়া গিয়াছে।

বিন্দির বোন্‌ঝি খুঁজিতে লোক দৌড়িল। সে অধিক দূর যায় নাই। হাঁড়ী সহিত সকলে তাহাকে ধরিয়া আনিল। ব্যস্ত হইয়া কালিকা হাঁড়ী খুলিয়া দেখিলেন। হরি হরি! তিনি দেখিলেন যে, সন্দেশের নিম্নে তিনি যে ভাবে গহণাগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ আছে। হাঁড়ী লইয়া আনন্দে তিনি মাতা ও ভুলুর সহিত দোতলায় আপনার ঘরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আরব্য উপন্যাসের জিন

কেশব আর লুক্কায়িত হন নাই। ভিড়ের অন্য লোকের সহিত দাঁড়াইয়া তিনি সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। ঢাকমহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তিনি তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—'দূর হঃ, দূর হঃ! বোগদাদি মোল্লা আসিয়া আজ আমার হিন্দু ধর্ম নষ্ট করিল।' এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার রাগ দাবানলের ন্যায় আরও জ্বলিয়া উঠিল। কেশবকে তিনি একপাটি জুতা ছুড়িয়া মারিলেন।

কেশব ধীরে ধীরে বলিলেন,—'আপনি আমার পিতৃস্থানীয় গুরুজন। আমি প্রত্যুত্তর করিব না। চারদিন পরে আপনার কন্যাকে ও আমার পুত্রকে আমি লইতে পাঠাইব, পাঠাইয়া দিবেন। না, পাঠাইলে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া কেশব চলিয়া গেলেন। কেশব তখনও বাড়ির বাহির হন নাই। এমন সময় ঢাকমহাশয়ের সম্মুখে মাথায় পাগড়ী, বুক পর্য্যন্ত দাড়ি, ইজের পরা, প্রকাণ্ড এক জিন আসিয়া দাঁড়াইল। জিন ঠিক দৈত্য নহে। আমাদের দেশে যেরূপ যক্ষ রক্ষ অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব আছে, বোগদাদ অঞ্চলে সেইরূপ জিন নামক এক প্রকার ভৌতিক বায়বীয় জীব আছে। জিনকে দেখিয়া সকলে ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেবল আমি ডমরুধর ভয় পাইলাম না। অনেক ভূতপ্রেতের সহিত আমি কারবার করিয়াছি। ঢাকমহাশয়ের নিকট গট্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

জিনটির কথা আমি এইরূপ শুনিলাম। একদিন কেশব ছিপ ফেলিয়া তাইগ্রিস নদীতে মাছ ধরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার বঁড়শীতে কি লাগিয়া গেল। সাবধানে উপরে তুলিয়া দেখিলেন যে, তাহা এক তাম্র-নির্মিত হাঁড়ী। তামার ঢাকন দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ। সেই ঢাকনের উপর হিজিবিজি লেখা আছে ও তাহার উপর সিলমোহর আছে। হাঁড়ীর ভাব দেখিয়া তাঁহার আরব্য উপন্যাস বর্ণিত ধীবরের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন যে, ঢাকন খুলিলে হয় তো হাঁড়ীর ভিতর হইতে প্রথম ধূম বাহির হইবে, তাহার পর সেই ধূম জিনের আকার ধারণ করিবে, তাহার পর জিন আমাকে বধ করিতে চাহিবে। এই ভয়ে তিনি তিনদিন হাঁড়ীর ঢাকন খুলিলেন না। তিনদিন পরে হাঁড়ীর ঢাকন খুলিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইল। ছুরি দিয়া অতিকষ্টে তিনি ঢাকন খুলিলেন। তাহার পর যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হাঁড়ী হইতে প্রথম ধূম বাহির হইল: ধূম গাঢ় হইয়া প্রকাণ্ড জিনে পরিণত হইল। কেশব ঘোরতর ভীত হইলেন। কিন্তু জিন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আলাদিন কোথায়? প্রদীপের সে জিন কোথায়? আলাদিনের নিমিত্ত মণিমুক্তাখচিত অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে প্রদীপের জিন আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মজুরি হিসাবে তাহার নিকট আমার এক সহস্র দিনার বা টাকা পাওনা আছে। সেই কথা লইয়া তাহার

সহিত আমার বিবাদ হইয়াছিল। সেজন্য প্রদীপের জিন আমাকে তামার হাঁড়ীতে বন্ধ করিয়া সিলমোহর করিয়া তাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এখন তাহার নিকটা হইতে আমি আমার টাকা আদায় কবির।'

কেশব বলিলেন,—'আমি বিদেশী লোক। আরব্য উপন্যাসের সে আলাদিন কোথায়, তাঁহার সে প্রদীপের জিন কোথায়, তাহা আমি জানি না।'

জিন বলিল,—'আমি আলাদিনকে ও প্রদীপের জিনকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কিন্তু প্রথম আমি তোমার উপকার করিব। কারণ, তুমি আমাকে জল হইতে তুলিয়াছ; হাঁড়ি হইতে বাহির কারিয়াছ। তোমার সহিত তোমার দেশে আমি যাইব। নানা বিপদ হইতে তোমাকে আমি রক্ষা করিব। তাহার পর তোমাকে লইয়া এ দেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। সেই হাজার দিনার আদায় করিয়া তোমাকে আমি দিব।' কেশবের সহিত জিন সেই জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছে।

জিন ঢাকমহাশয়ের দিকে ভয়ঙ্কর কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুইটি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল,—'নরাধম কাফের! তুই আমার বন্ধুকে অপমান করিয়াছিস। একচক্ষু কাণা দামড়া গরুর আকৃতি ধারণ কর।'

তৎক্ষণাৎ ঢাকমহাশয় একচক্ষুহীন দামড়া গরু হইয়া গেলেন। সেই মুহূর্তে জিন অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোর বিপদ দেখিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া কেশবকে ধরিলাম। দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'শ্বশুরমহাশয়কে পুনরায় মানুষ করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। জিন কেবল মাঝে মাঝে আমার নিকট আগমন করে। পুনরায় কবে আসিবে, তাহা জানি না। এইবার যেদিন আসিবে, তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া শ্বশুরমহাশয়কে ভাল করিতে চেষ্টা করিব।'

এই কথা বলিয়া কেশব আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন। এ স্থানে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। কালিকা কাঁদিতে লাগিলেন, কালিকার মাতা কাঁদিতে লাগিলেন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। ঢাকমহাশয় হাঁ করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি এক হাঁড়ী ভাতের ফেন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। ঢাকমহাশয় চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন। তাহা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিত সুস্থ হইল। আমরা তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি পৈঠা উঠিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে গোয়ালে লইয়া যাইতে হইল। তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, তিনি আর সকলকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দয়া বলিলাম,—'কিছু ভয় নাই, শীঘ্রই পুনরায় আপনি মনুষ্যশরীর পাইবেন। আর যতদিন না পুনরায় আপনার মনুষ্যশরীর হয়, ততদিন আপনাকে আমি ছাড়িয়া যাইব না।'

রাত্রি নয়টায় সময় আমি নিজহাতে খড় কাটিয়া তাঁহাকে জাব দিলাম। তাহার পর গোয়ালের দেল ঠেস দিয়া বসিয়া আমি ক্রমাগত মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিগাম। আমি বললাম যে—'মা! তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমার বন্ধুকে তুমি এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। ইনি পূজা করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু মা! ভাবিও না; যাহাতে ইনি এ বৎসর ঘটা করিয়া তোমার পূজা করেন আমি সে ব্যবস্থা করিব।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আবার এলোকেশী

মা দয়াময়ী। মা আমার কান্না শুনিলেন। রাত্রি তিনটার সময় গোয়ালে অন্ধকারে বসিয়া আমি একটু চক্ষু বুজিয়াছি, এমন সময় মা আমাকে দর্শন দিলেন।

মা বলিলেন,—'ডমরুধর! তুমি আমার বরপুত্র, কিছু ভয় নাই, সরস্বতীর কৃপায় তোমার মুখ হইতে জিলেট মন্ত্র বাহির হইয়াছিল, সেই মহামন্ত্রের প্রভাবে তুমি ঢাকের পশুত্ব মোচন কর। কুন্তলাকে উদ্ধার কর, কেশবকে সমুদ্রযাত্রাজনিত পাপ হইতে মুক্ত কর। সমুদ্রযাত্রা তো সামান্য কথা। জিলেট মন্ত্র-প্রভাবে মানুষের সকল পাপ দূর হয়। এই মহামন্ত্রের মহিমা অপার। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট।'

এইরূপ উপদেশ দিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি প্রথমে স্নান করিলাম শুচি হইয়া গোয়ালে

প্রবেশ করিয়া একচক্ষুহীন দামড়া গরুর অর্থাৎ ঢাকমহাশয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া আমি জিলেট মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ,—সাতবার এই মহামন্ত্র পাঠ করিতেই ঢাকমহাশয়ের দামড়া রূপ ঘুচিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপ হইল।

তাহার পর জিলেট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী তিনবার প্রদক্ষিণ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পক রথ নামিয়া আসিল। সেই রথে চড়িয়া কুন্তলা স্বর্গে গমন করিলেন। জিলেট মন্ত্রে এমনি প্রভাব। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

ঢাকমহাশয়ের পুনরায় মা দুর্গার প্রতি অসীম ভক্তি হইল। তিনি প্রতিমা গঠনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন ও মহাসমারোহে পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

জামাতা কেশবকে তিনি ডাকিতে পাঠাইলেন। জিলেট মন্ত্রে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া আমি তাঁহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিলাম। শ্বশুর-জামাতায় অক্ষুণ্ণ অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও স্বভাব হইল। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

দুই চারদিন পরে জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—এই যে ডমরুমহাশয়, মনুষ্য মধ্যে ইনি রত্নবিশেষ। ইনি জিলেট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহামন্ত্র বলে ইনি না পারেন, এমন কাজ নাই। আজ রাত্রিতে ইঁহাকে আমি শাহারজাদি দিনারজাদির নাচ দেখাইব। পুস্তকে লেখা আছে যে, শাহারজাদি গল্প বলিয়া বাদশাহকে বশ করিয়াছিলেন। সে মিথ্যা কথা। দুই ভগিনীর নাচ দেখিয়া বাদশাহ বশ হইয়াছিলেন।

সেই রাত্রি পুনরায় ঢাকমহাশয়ের বাটী গমন করিলাম। রাত্রি নয়টায় সময় দুইজন পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দুইটি রমণী আমাদের সম্মুখে নানা ভাবভঙ্গী করিয়া নাচিতে লাগিল। কেবল ঢাকমহাশয়, কেশব ও আমি সে নাচ দেখিয়াছিলাম। রমণী দুইটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও অদ্ভুত নাচ দেখিয়া আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। দুর্লভী বাগদিনীকে আমি ভুলিয়া যাইলাম।

নাচ সমাপ্ত হইলে জিন বলিল,—'আজ রাত্রিতেই আমরা বোগদাদে গমন করিব। ডমরুমহাশয় ও কেশবকে সঙ্গে লইয়া যাইব। বায়ুরূপে উড়িয়া মুহূর্ত মধ্যে আমরা সে স্থানে গিয়া ডমরুমহাশয়ের সহিত শাহারজাদির নিকা দিব ও দিনারজাদির সহিত কেশবের বিবাহ দিব।'

সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। কিন্তু আমি বলিলাম যে, এলোকেশীর মত না লইয়া আমি যাইতে পারিব না। কারণ, তাঁহাকে যদি না বলিয়া যাই, তাহা হইলে পৃথিবী খুঁজিয়া তিনি আমাকে বাহির করিবেন। আর মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত তিনি আমাকে বাহির করিবেন। আর মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত তিনি আমাকে ঝাঁটা-পেটা করিবেন।

জিন এলোকেশীকে ডাকিতে পাঠাইল। ঝাঁটা হাতে করিয়া নিবিড় তিমির দ্বারা গঠিত শরীরে জবাকুসুম লোহিত লোচনে এলোকেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জিনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার পর শাহারজাদির সহিত আমার নিকার প্রস্তাব শুনিয়া যখন এলোকেশী জিনকে ঝাঁটা পেটা করিতে দৌড়িলেন, তখন জিন, শাহারজাদি ও দিনারজাদির শরীর গলিয়া ধূমে পরিণত হইল। ধূম বাতাসে মিশিয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহারা কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহা কেহ জানে না। কেশবের নিকট জিন আর আসে না।

যাহা হউক, ঢাকামহাশয় এ বৎসরে ঘোর ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিলেন।

লম্বোধর বলিলেন,—'আচ্ছা আজগুবি গল্প তুমি বানাইতে পার।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সকলই মহামায়ার মায়া। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

ক ঙ্কা ব তী

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রাচীন কথা

কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলা কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

কঙ্কাবতীর ভাই একটি আঁব আনিয়াছিলেন। আঁবটি ঘরে রাখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন,—'আমার আঁবটি যেন কেহ খায় না; যে খাইবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।'

কঙ্কাবতী সে কথা জানিতেন না। ছেলেমানুষ! অত বুঝিতে পারেন নাই, আঁবটি তিনি খাইয়াছিলেন।

সে জন্য ভাই বলিলেন,— 'আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব ।'

মাতাপিতা সকলে বুঝাইলেন, — 'ভাই হইয়া কি ভগিনীকে বিবাহ করিতে আছে?'

কিন্তু কাহারও কথা তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন,— 'কঙ্কাবতী, আমার আঁব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব ।'

কঙ্কাবতীর বড় লজ্জা হইল, মনে বড় ভয় হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকাখানিতে বসিয়া খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর গল্প এইরূপ। এ কথা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। একটি আঁবের জন্য কেহ কি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চায়? এ কথা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব, তাহা আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কুসুমঘাটী

সহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস। গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিত। সুবিধা পাইলে, নিকটস্থ গ্রামসমূহের দুষ্ট লোকেরা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু টাকাকড়ি পাইত, তাহা লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পুষ্করিণী আছে, তাহার ভিতর হইতে আজ পর্যন্ত মড়ার মাথা বাহির হয়। মানুষ মারিয়া দুষ্ট লোকেরা এই পুকুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

মৃতদেহ গোপন করিবার আর একটি উপায় ছিল। পথিককে মারিয়া, মড়াটি লইয়া, দুষ্ট লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া আসত। অপর গ্রামে মড়াটি রাখিয়া, এক প্রকার 'কুঃ' শব্দ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত।

সে গ্রামের চৌকীদার সেই 'কুঃ' শব্দটি শুনিয়া বুঝিতে পারিত যে, তাহার সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকীদার ভাবিত,—'যদি আমার সীমানায় মড়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে।'

এই কথা ভবিয়া সেও আপনার বন্ধুবর্গের সহায়তায়, মৃতদেহটি অপর গ্রামে রাখিয়া সেইরূপ 'কুঃ' শব্দ করিয়া আসিত।

এইরূপে রাতারাতি মড়াটি দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত। কোথা হইতে লোকটি আসিতেছিল, কে তাহাকে

মারিল, অত দূরে আর তাহার কোনও সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাহাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত মৃত্যু। সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক-বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন,—'ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।'

স্থলে, সেখানকার লোকের এইরূপ পদে পদে বিপদের ভয়। জলেও কম নয়। গ্রামের এক পার্শ্বে একটি নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া, 'কুল কুল' করিয়া নদীটি সাগরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। হাঙ্গর-কুম্ভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে 'জ'টে-বুড়ি'ত আছেই, তাছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।

কুসুমঘাটীর অনতিদূরে পর্বতশ্রেণী। পাহাড় বনে আবৃত। বনে বাঘ-ভাল্লুক আছে। বাঘে সর্বদাই লোকের গরুবাছুর লইয়া যায়। মাঝে মাঝে এক একটি বাঘ মনুষ্য খাইতে শিক্ষা করে। তখন সে বাঘ, মানুষ ভিন্ন আর কিছুই খায় না। লোকে উৎপীড়িত হইয়া নানা কৌশলে সে ব্যাঘ্রটিকে বধ করে।

এক একটি বাঘ কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়,— সে মনুষ্য। বনে এক প্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শত্রুকে বিনাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। সে চিরকালই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘে লোকের প্রতি ভয়ানক উপদ্রব করে।

কুসুমঘাটীর লোকের মনে এইরূপ নানা প্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজকাল সকলের মন হইতে এই সব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুটি ও গালা লইয়া কলিকাতায় আসেন। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইংরেজীও পড়িয়াছেন। ভূত-ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন; বলেন, — 'পৃথিবীতে ভূত নাই। আর যদিও থাকে, তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে?' তাঁহাদের দেখা-দেখি আজকালের ছেলেমেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—তনু রায়

শ্রীযুক্ত রামতনু রায় মহাশয়ের বাস কুসুমঘাটী। 'রামতনু রায়' বলিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে না, সকলে তাঁহাকে 'তনু রায়' বলে। ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, পিতাপিতামহ-আদির শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন, দেবগুরুকে ভক্তি করেন, দলাদলি লইয়া আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্মকর্ম করে না বলিয়া রায় মহাশয়ের মনে বড় রাগ।

তিনি বলেন,—'আজকালের ছেলেরা সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।'

তিনি নিজে সব মানেন. সব করেন। বিশেষতঃ কুলীন ও বংশজের যে রীতিগুলি, সেইগুলির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন, —'বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্মটি আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বল বংশজের ধর্মটি কি? বংশজের ধর্ম এই যে,—'কন্যাদান করিয়া পাত্রের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিবে।' বংশজ হইয়া যিনি এ কার্য না করেন, তাঁহার ধর্মলোপ হয়, তিনি একবারেই পতিত হন; শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।'

শাস্ত্র অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া তনু রায়ের প্রতি লোকের বড় ভক্তি। স্ত্রীলোকেরা ব্রত-উপলক্ষে ইহাকেই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সকলে বলেন যে, 'রায় মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে অতি বিরল।' বিশেষতঃ শূদ্রমহলে ইহার খুব প্রতিপত্তি।

তনু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে—'ইঁহাদের কোনও পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা-পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কিনা, তাও সন্দেহ।'

ফল কথা, ইহার নিজের বিবাহের সময় কিছু গোলযোগ হইয়াছিল। 'পাঁচশত টাকা পণ দিব' বলিয়া একটি কন্যা স্থির করিলেন। পৈতৃক ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, সেই টাকাগুলি লইয়া বিবাহ করিতে যাইলেন। কন্যার পিতা, টাকাগুলি গণিয়া ও বাজাইয়া লইলেন। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তবুও তিনি কন্যাসম্প্রদান করিতে তৎপর হইলেন না। কেন বিলম্ব করিতেছেন, কেহ বুঝিতে পারে না।

অবশেষে তিনি নিজেই খুলিয়া বলিলেন,— 'পাত্রের এত অধিক বয়স হইয়াছে, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি নাই। সেইজন্য পাঁচ শত টাকায় সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আর এক শত টাকা না পাইলে কন্যাদান করিতে পারি না।'

কন্যাকর্তার এই কথায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গেলাযোগে লগ্ন অতীত হইয়া গেল, রাত্রি প্রায় অবসান হইল। যখন প্রভাত হয় হয়, তখন পাঁচজন মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, 'রায় মহাশয়কে আর পঞ্চাশটি টাকা দিতে হইবে।' 'খত' লিখিয়া তনু রায় আর পঞ্চাশ টাকা ধার করিলেন ও কন্যার পিতাকে তাহা দিয়া বিবাহকার্য সমাধান করিলেন।

বাসরঘরে গাহিবেন বলিয়া তনু রায় অনেকগুলি গান শিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল। কারণ, বাসর হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। এ দুঃখ তনু রায়ের মনে চিরকাল ছিল।

এক্ষণে তনু রায়ের তিনটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। কুলধর্ম রক্ষা করিয়া দুইটি কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা তনু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচ শত, কেহ হাজার, নগদ গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সুপাত্র বলিতে হইবে।

সম্মান কিছু অধিক পাইবেন বলিয়া, রায় মহাশয় কন্যা দুইটিকে বড় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,— 'অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, কন্যা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে? কন্যা বড় করিয়া বিবাহ দিবে। কুলীন ও বংশজের তাহাতে কোন দোষ নাই! ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে।'

তাই যখন ফুলশয্যার আইন পাশ হয়, তখন তনু রায় বলিলেন,—'পূর্ব হইতেই আমি আইন মানিয়া আসিতেছি। তবে আবার নূতন আইন কেন?' আইনের তিনি ঘোরতর বিরোধী হইলেন; সভা করিলেন, চাঁদা তুলিলেন, চাঁদার টাকাগুলি সব আপনি লইলেন।

তনু রায়ের জামাতা দুইটির বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলেমানুষ বরকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা এক শত কি দুইশত টাকায় কাজ সারিতে চায়। তাই একটু বয়স্ক পাত্র দেখিয়া কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়াছিলেন। এক জনের বয়স হইয়াছিল সত্তর, আর এক জনের পঁচাত্তর।

জামাতাদিগের বয়সের কথায় পাড়ার মেয়েরা কিছু বলিলে, তনু রায় সকলকে বুঝাইতেন,—'ওগো! তোমরা জান না, জামাইয়ের বয়স একটু পাকা হইলে, মেয়ের আদর হয়।'

জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি কন্যাই বিধবা হয়।

তনু রায় জ্ঞানবান্ লোক। জামাতাদিগের শোকে একেবারে অধীর হন নাই। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন,—'বিধাতার ভবিতব্য! কে খণ্ডাতে পারে? কত লোক যে বার বৎসরের বালকের সহিত পাঁচ বৎসর

বালিকার বিবাহ দেয়, তবে তাহাদের কন্যা বিধবা হয় কেন? যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।'

তনু রায়ের পুত্রটি ঠিক বাপের মত। এখন তিনি আর নিতান্ত শিশু নন, পঁচিশ পার হইয়াছেন। লেখাপড়া হয় নাই, তবে পিতার মত শাস্ত্রজ্ঞান আছে। পিতা কন্যাদান করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেছেন, সে জন্য তিনি আনন্দিত, নিরানন্দ নন। কারণ, পিতার তিনিই একমাত্র বংশধর। বিধবা কয়টা আর কে বল? তবে বিধবাদিগের গুণকীর্তন তিনি সর্বদাই করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন,—'আমাদের বিধবারা সাক্ষাৎ সরস্বতী। সদা ধর্মে রত, পরোপকার ইহাদের চিরব্রত। কিসে আমি ভাল খাইব, কিসে বাবা ভাল খাইবেন, ভগিনী দুইটির সর্বদাই এই চিন্তা। তিন দিন উপবাস করিয়াও আমাদের জন্য পাঁচ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভগিনী দুইটি আমার—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা। প্রাতঃস্মরণীয়া।'

আজকাল আর সহমরণ-প্রথা নাই বলিয়া ইনি মাঝে মাঝে খেদ করেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগিনী দুইটি নিমিষের মধ্যেই স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছামিছি বাবার অন্ন ধ্বংস করিতেন না।

সাহেবেরা স্বর্গের দ্বারে এরূপ আগড় দিয়া দেন কেন?

তনু রায়ের স্ত্রী কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোক। এক একটি কন্যার বিবাহ হয়, আর পাত্রের রূপ দেখিয়া তিনি কান্নাকাটি করেন। তনু রায় তখন তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আর বলেন,—'মনে করিয়া দেখ দেখি, তোমার বাপ কি করিয়াছিলেন? এইরূপ নানা প্রকার খোঁটা দিয়া তবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। কন্যাদিগের বিবাহ লইয়া স্ত্রীপুরুষের চির বিবাদ। বিধবা কন্যা দুইটির মুখপানে চাহিয়া সদাই চক্ষের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যায়। মেয়েদের সঙ্গে মা-ও একপ্রকার একাদশী করেন। একাদশীর দিন কিছুই খান না, তবে স্বামীর অকল্যাণ হইবার ভয়ে, কেবল একটু একটু জল পান করেন।

প্রতিদিন পূজা করিয়া একে একে সকল দেবতাদিগের পায়ে তিনি মাথা খুঁড়েন, আর তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন যে,—'হে মা কালি! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মত হয়।'

কঙ্কাবতী তনু রায়ের ছোট কন্যা। এখনও নিতান্ত শিশু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খেতু

তনু রায়ের পাড়ায় একটি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে তাঁহাকে 'খেতুর মা খেতুর মা' বলিয়া ডাকে। খেতুর মা আজ দুঃখিনী বটে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার স্বামী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখাপড়া জানিতেন, কলিকাতায় কর্ম করিতেন, দু'পয়সা উপার্জন করিতেন।

কিন্তু তিনি অর্থ রাখিতে জানিতেন না। পরদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন ও যথাসাধ্য পরের দুঃখ মোচন করিতেন। অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেকগুলি ছেলের তিনি লেখাপড়ার খরচ দিতেন। এরূপ লোকের হাতে পয়সা থাকে না।

অধিক বয়সে তাঁহার স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান হয়। ছেলেটির নাম 'ক্ষেত্র' রাখেন, সেইজন্য তাঁহার স্ত্রীকে সকলেই 'খেতুর মা' বলে।

যখন পুত্র হইল, তখন শিবচন্দ্র মনে করিলেন,—'এইবার আমাকে বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। আমার অবর্তমানে স্ত্রীপুত্র যাহাতে অন্নের জন্য লালায়িত না হয়, আমাকে সে বিলি করিতে হইবে।'

মানস হইল বটে, কিন্তু কার্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অতি দুঃখময়, এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁকে দরিদ্র থাকিতে হয়।

খেতুর যখন চারি বৎসর বয়স, তখন হঠাৎ তাহার পিতার মৃত্যু হইল। স্ত্রী ও শিশু সন্তানটিকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া গেলেন। খেতুর বাপ অনেকের উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড়লোক

হইয়াছেন। কিন্তু এই বিপদের সময় কেহই একবার উঁকি মারিলেন না। কেহই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে,— 'খেতুর মা! তোমার হবিষ্যের সংস্থান আছে কি না?'

এই দুঃখের সময় কেবল রামহরি মুখোপাধ্যায় ইহাদের সহায় হইলেন।

রামহরি ইহাদের জ্ঞাতি, কিন্তু দূরসম্পর্ক। খেতুর বাপ, তাঁহার একটি সামান্য চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশে অভিভাবক নাই, সেজন্য কলিকাতায় তাঁহাকে পরিবার লইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে কয়টি টাকা পান, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করেন।

তিনি কোথায় পাইবেন? তবুও যাহা কিছু পারিলেন, বিধবাকে দিলেন ও চাঁদার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন। খেতুর বাপের খাইয়া যাহারা মানুষ, আজ তাহারা রামহরিকে কতই না ওজর-আপত্তি-অপমানের কথা বলিয়া দুই এক টাকা চাঁদা দিল। তাহাতেই খেতুর বাপের তিলকাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। চাঁদার টাকা হইতে যাহা কিছু বাঁচিল, রামহরি তাহা দিয়া খেতুর মা ও খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

দেশে পাঠাইয়া দুঃখিনী বিধবাকে তিনি চাউলের দামটি দিতেন; অধিক আর কিছু দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণী পৈতা কাটিয়া কোনও মতেঅকুলান কুলান করিতেন। দেশে বন্ধুবান্ধব কেহই ছিল না। নিরঞ্জন কবিরত্ন কেবল মাত্র ইহাদের দেখিতেন শুনিতেন; বিপদে আপদে তিনিই বুক দিয়া পড়িতেন।

খেতুর মা'র এইরূপে কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটি শান্ত সুবোধ, অথচ সাহসী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার রূপগুণে, স্নেহমমতায়, মা সকল দুঃখ ভুলিতেন। ছেলেটি যখন সাত বৎসরের হইল, তখন রামহরি দেশে আসিলেন।

খেতুর মাকে তিনি বলিলেন—'খেতুর এখন লেখাপড়া শিখিবার সময় হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনার কি মত?'

খেতুর মা বলিলেন,—'বাপ রে! তা কি কখন হয়? খেতুকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব? নিমিষের নিমিত্তও খেতুকে চক্ষুর আড় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। না বাছা! এ প্রাণ থাকিতে আমি খেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।'

রামহরি বলিলেন,—"দেখুন, এখানে থাকিলে খেতুর লেখাপড়া হইবে না। মথুর চক্রবর্তীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো? গাজনের শিবপূজা করিয়া অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া সকলে তাহাকে ঘৃণা করিত। তাহার ছেলে ষাঁড়েশ্বর আপনার বাসায় দিনকতক রাঁধুনী বামুন থাকে। অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া শিব কাকার দয়া হয়, তিনি তাহাকে স্কুলে দেন। এখন সে উকীল হইয়াছে। এখন সে একজন বড়লোক।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—'চুপ কর! কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিয়া যদি ষাঁড়েশ্বরের মত হয়, তাহা হইলে আমার খেতুর লেখাপড়া শিখিয়া কাজ নাই।'

রামহরি বলিলেন, —'সত্য বটে, ষাঁড়েশ্বর মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারূপ অখাদ্য মাংসও খায় আবার এদিকে প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয়? পুরুষ মানুষে লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে? পুরুষ মানুষের যেরূপ বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা, বিদ্যাশিক্ষারও সেইরূপ প্রার্থনা।'

খেতুর মা বলিলেন,—"হাঁ। সত্য কথা। পুত্রের যেরূপ বাঁচিবার প্রার্থনা, বিদ্যার প্রার্থনাও তাহার চেয়ে অধিক। যে পিতামাতা ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, সে পিতামাতা ছেলের পরম শত্রু। তবে বুঝিয়া দেখ, আমার মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়হীনা বিধবা। পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, এই একরত্তি ছেলেটিকে লইয়া সংসারে আছি। খেতুকে আমি নিমেষে হারাই। খেলা করিয়া ঘরে আসিতে খেতুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহা আর কি বলিব? ভাবি, খেতু বুঝি জলে ডুবিল, খেতু বুঝি আগুনে পুড়িল, খেত বুঝি গাছ হইতে পড়িয়া গেল, খেতুকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! খেতু যখন ঘুমায়, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি খেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,— খেতুর নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা? ভাবিয়া দেখ দেখি, এ দুধের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে? তাই কাঁদি, তাই বলি— 'না'।"পুনরায় খেতুর মা বলিলেন,—'রামহরি! খেতু আমার বড় গুণের ছেলে।

কেবল দুই বৎসর পাঠশালায় যাইতেছে, ইহার মধ্যেই তালপাতা শেষ করিয়াছে, কলাপাতা ধরিয়াছে।' গুরুমহাশয় বলেন,—'খেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।'

''আর দেখ রামহরি! খেতু আমার অতি সুবোধ ছেলে। খেতুকে আমি যা করিতে বলি, খেতু তাই করে। যেটি মানা করি, সেটি আর খেতু করে না। একদিন দাসেদের মেয়ে আসিয়া বলিল,—'ওগো! তোমার খেতুকে পাড়ার ছেলেরা বড় মারিতেছে।' আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলাম। দেখিলাম, ছয়জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। খেতুর মনে ভয় নাই, মুখে কান্না নাই। আমি দৌড়িয়া গিয়া খেতুকে কোলে লইলাম। খেতু তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—'মা! আমি উহাদের সাক্ষাতে কাঁদি নাই, পাছে উহারা মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আমার সঙ্গে কেহই পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আমিও মারিয়াছি। আবার যখন একা একা পাইব, তখন আমিও ছয়জনকে খুব মারিব।' আমি বলিলাম, — 'না বাছা! তা করিতে নাই। প্রতিদিন যদি সকলের সঙ্গে মারামারি করিবে, তবে খেলা করিবে কার সঙ্গে? খেতু আমার কথা শুনিল। কত দিন সে-ছেলেদের খেতু একলা পাইয়াছিল, মনে করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়াছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।''

''আর একদিন আমি খেতুকে বলিলাম,—'খেতু! তনু রায়ের আঁব গাছে ঢিল মারিও না। তনু রায় খিটখিটে লোক, সে গালি দিবে।' খেতু বলিল,—'মা! ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট গো! একটি আঁব পাকিয়া টুক টুক করিতেছিল। আমার হাতে একটি ঢিল ছিল। তাই মনে করিলাম, দেখি, পড়ে কি না? আমি বলিলাম,—'বাছা! ও গাছের আঁব মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটি তো আর আমাদের নয়? পরের গাছে ঢিল মারিলে, যাদের গাছ, তাহারা রাগ করে; যখন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া খাইও, তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না।''

''তাহার পর, আর একদিন খেতু আমাকে আসিয়া বলিল,—'মা! জেলেদের গাবগাছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব খাইতেছিল। আমাকে তাহারা বলিল,—'খেতু! আয় না ভাই! দূরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি না! তা মা আমি গাছে উঠি নাই। গাব গাছটি তো, মা! আর আমাদের নয়, যে উঠিব? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা দুটি একটি গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! তোমার জন্য একটি গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! খাইয়া দেখ! মা! আমাদের যদি একটি গাবগাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত।' আমি বলিলাম,—'খেতু! বুড়ো মানুষে গাব খায় না, ও গাবটি তুমি খাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোন দোষ নাই, তার জন্য জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ডগায় গিয়া উঠিও না, সরু ডালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। গাবের আঁটি চুষিয়া চুষিয়া ফেলিয়া দিও, আঁটি গিলিও না, গলায় বাঁধিয়া যাইবে।' গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?''

''দেখ, এ গ্রামে একবার একজন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে আসিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাদের বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চুণপানা করিয়া আমার খেতু সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি খেতুকে কোলে লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুছিতে পুছিতে ছেলে নিয়ে বাটী আসিলাম। খেতু নীরব, খেতুর মুখে কথা নাই। তার শিশুমনে সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—'মা! তুমি কাঁদ কেন?' আমি বলিলাম,—'বাছা! আমার ঘরে একদিন সন্দেশ ছড়াছড়িযাইত, চাকরবাকরে পর্যন্ত খাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তোমার হাতে এক পয়সার সন্দেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কি আর রাখিতে স্থান আছে? এমন অভাগিনী মার পেটেও বাছা তুই জন্মেছিলি!' সাত বৎসরের শিশুর একবার কথা শুন! খেতু বলিল,—'মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, সব পচা? তুমি তো জান? সন্দেশ খাইলে আমার অসুখ করে। সেই যে মা, চৌধুরীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেখানে

সন্দেশ খাইয়াছিলাম, তার পরদিন আমার কত অসুখ করিয়াছিল! সন্দেশ খাইতে নাই, মুড়ি খাইতে আছে। ঘরে যদি মা! মুড়ি থাকে তো দাও আমি খাই।”

খেতুর মার মুখে খেতুর কথা আর ফুরায় না। রামহরির নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, তাহা আর কি বলিব?

অবশেষে রামহরি বলিলেন,—'খুড়ীমা! ভয় করিও না। আমার নিজের ছেলের চেয়েও আমি খেতুর যত্ন করিব। শিব কাকার আমি অনেক খাইয়াছি। তাহার অনুগ্রহে আজ পরিবারবর্গকে এক মুঠা অন্ন দিতেছি। আজ তাঁহার ছেলে যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্য হইবে না। খেতু কেমন আছে, কেমন লেখাপড়া করিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্বদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার খেতু যখন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন সে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ও গ্রীষ্মের ছুটির সময় খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস সে আপনার নিকট থাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আজ শুক্রবার। বুধবার ভাল দিন। সেই দিন খেতুকে লইয়া কলিকাতায় যাইব।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নিরঞ্জন

তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবাসী।

নিরঞ্জন বলেন,—'রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।'

তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যে দিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন,—'কন্যা-বিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।'

নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক। নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রি দিন তিনি পুথিপুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইঁহার নাম হয় নাই। পূর্বে অনেকগুলি ছাত্র ইঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত; দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া, ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার-পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের জন্য ইনি মারামারি করিতেন না। কারণ, ইঁহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈতৃক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার, জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার একজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—'ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।'

পেয়াদা বলিল,—'তাহা হইবে না, তোমাকে এক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত দুটি মুখে দিয়া, চল, যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবে।'

পেয়াদা বলিল,—'তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই যাইতে হইবে।'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'এইক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।'

পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'কখন্ আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না!'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়। আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।'

জমিদার বলিলেন,—'বামুনমারীর মাঠে আপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিলপত্র ভাল আছে, সে জন্য সবটুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যেটুকু অধিক হইয়াছে, সেটুকু আমার প্রাপ্য।'

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়! দলিলপত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজখানি কি না?'

জনার্দন চৌধুরী কাগজখানি হাতে লইয়া বলিলেন,—'হাঁ, এই কাগজখানি বটে, ইহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।'

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজখানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজখানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজখানি জ্বলিয়া গেল।

জমিদার বলিলেন,—'হাঁ হাঁ! করেন কি?'

নিরঞ্জন বলিলেন,— 'কেবল পাঁচ বিঘা কেন? আজ হইতে আমার সমুদায় ব্রহ্মোত্তর ভূমি আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।'

পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, সেজন্য জনার্দন চৌধুরীর ভয় হইল।

তিনি বলিলেন, 'দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।'

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—'না মহাশয়! জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়বৈভবচিন্তায় যদি ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে, চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার যবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল? সুতরাং সে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশূন্য ব্যক্তির নিকট রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও আপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা-মায়াজালের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-তাপিত তৃষিত মরুপ্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন কখনও কাহারও নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।'

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতি কষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে যাইল।

গোবর্ধন শিরোমণি জনার্দন চৌধুরীর সভাপণ্ডিত: অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সর্বদা তাঁহাকে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ-আপনা-আপনি বিদ্যাশিক্ষা করে।

সে জন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবর্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ, তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্যসুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান্ লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় তিনি বাক্যসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন; তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহারা সেই সুধা পান করেন।

একদিন জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে আসিয়া তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন নিরঞ্জন, গোবর্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তনু রায় বলিলেন,—'কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোন্ শাস্ত্রে আছে? এরূপ শুল্ক গ্রহণ করা তো ধর্মশাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।'

গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—'বল না? মহাভারতে আছে!'

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—'দাতাকর্ণে আছে।'

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—'রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।'

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন,'আমি—শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল! কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি, তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?'

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বিদায়

যে দিন রামহরির সহিত কথাবার্তা হইল, সে দিন রাত্রিতে মা, খেতুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাখিয়া বলিলেন,—'খেতু! বাবা! তোমাকে একটি কথা বলি।'

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'কি মা?'

মা উত্তর করিলেন, — 'বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।'

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কোথায় মা?'

মা বলিলেন,—'তোমার মনে পড়ে না? সেই যে, যেখানে গাড়ী ঘোড়া আছে?'

খেতু বলিলেন,—'সেইখানে? তুমি সঙ্গে যাবে তো মা?'

মা উত্তর করিলেন,—'না বাছা! আমি যাইব না, আমি এইখানেই থাকিব।'

খেতু বলিলেন,—'তবে মা! আমিও যাইব না!'

মা বলিলেন,—'না গেলে বাছা চলিবে না। আমি মেয়েমানুষ, আমাকে যাইতে নাই। রামহরি দাদার সঙ্গে যাইবে, তাতে আর ভয় কি?'

খেতু বলিলেন,—'ভয়! ভয় মা! আমি কিছুতে করি না। তবে তোমার জন্য আমার মন কেমন করিবে, তাই মা বলিতেছি যে, যাব না।'

মা বলিলেন,—'খেতু! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি, বাছা? না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্কুলে পড়িতে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্খ হয়। মূর্খকে কেহ ভালবাসে না, কেহ আদর করে না তুমি যদি স্কুলে যাও আর মন দিয়া লেখাপড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে। আর খেতু! তোমার এই দুঃখিনী মার দুঃখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সরু পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে দেখতে পাই না। আর কিছুদিন পরে হয় তো মোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তখন বল, পয়সা কোথায় পাইব? লেখাপড়া শিখিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পৈতা কাটিতে হইবে না। আমি তখন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব, পূজাআচ্ছা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বলিব,—খেতু আমার বড় সুছেলে, খেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।'

খেতু বলিলেন—'মা! আমি যদি যাই, তুমি কাঁদিবে না?'

মা উত্তর করিলেন,—'না বাছা, কাঁদিব না।'

খেতু বলিলেন,—'ঐ যে মা! কাঁদিতেছ!'

মা উত্তর করিলেন,—'এখন কান্না পাইতেছে, ইহার পর আর কাঁদিব না। আর খেতু! সেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটি পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুকুর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিব, সেইখান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখাপড়া

করিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে আমি সে চিঠিগুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যখন বাড়িতে আসিবে, তখন সেই চিঠিগুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।'

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা! সেখানে মালা পাওয়া যায়?'

মা বলিলেন,—'মালা কি?'

খেতু বলিলেন,—'সেই যে মা? তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মালা পাই তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।'

মা উত্তর করিলেন,—'হাঁ বাছা! মালা সেখানে অনেক পাওয়া যায়।'

খেতু বলিলেন,—'আমি তোমার জন্য, মা! ভাল মালা কিনিয়া আনিব।'

মা উত্তর করিলেন, 'তাই ভাল! আমার জন্য মালা আনিও।'

মাতাপুত্রে এইরূপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে খেতু নিদ্রিত হইলেন।

তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া খেতু বলিলেন,—'মা, এই কয়দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।'

মা উত্তর করিলেন,—'আচ্ছা, তাই ভাল, তবে তোমার নিরঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে যাইও।'

খেতু বলিলেন,—'তা যাব। আমি আর একটিকথা বলি। তোমার খাওয়া হইলে, এ কয়দিন আমি তোমার পাতে ভাত খাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মা? যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া আমার জন্য রাখ। তাই আমি বলি, 'দুপুর বেলা, মা! আমার ক্ষুধা পায় না, আমার জন্য পাতে ভাত রাখিও না।' ক্ষুধা, কিন্তু মা! খুব পায়। লোকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পড়িয়া থাকে, স্বচ্ছন্দে কুড়াইয়া খাই। কিন্তু তোমার ক্ষুধা পাইলে তুমি তো মা, তা খাও না? তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে মা! তোমার পেট না ভরে!'

ব্রাহ্মণী খেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—'বাবা! এ দুঃখের কান্না নয়! তোমা-হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার দুঃখ কিসের? তোমার সুধামাখা কথা শুনিলে ভয় হয়,— এ হতভাগিনীর কপালে তুমি কি বাঁচিবে?'

সেই দিন আহারাদির পর, খেতুর ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—'মা। আমি ছেঁড়ার দুই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি ওদিক্ হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র হইবে। আর মা! যখন সূচে সূতা না থাকিবে, তখন আমি পরাইয়া দিব, তুমি ছিদ্রটি দেখিতে পাও না, সূতা পরাইতে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।'

এইরূপে মাতাপুত্রে কথা কহিতে কহিতে কাপড় সেলাই হইতে লাগিল। তাহার পর মা সেইগুলিকে ক্ষারে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। খেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হইতে লাগিল।

বৈকালবেলা খেতু নিরঞ্জনের বাটি যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া, কলিকাতায় যাইবাব কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। রামহরির নিকট নিরঞ্জন পূর্বেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে খেতুকে আশীর্বাদ করিয়া, নানারূপ উপদেশ দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—'খেতু! সর্বদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কখনও বলিও না। সুখদুঃখের সকল কথা তোমার রামহরি দাদাকে বলিবে, কোনও কথা তাঁহার নিকট গোপন করিবে না। অনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে কেহ দুষ্ট, কেহ শিষ্ট। সুতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে। অন্যায় করিয়া কাহাকেও মারিও না, দুর্বলকে মারিও না, পাঁচজনে পড়িয়া একজনকে মারিও না, দুর্বলকে কেহ মারিতে আসিলে তাহার পক্ষ হইও। দুর্বলের পক্ষ হইয়া যদি মার খাইতে হয় সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার সময় মনে করিয়া দেখিবে যে, সেদিন কি সুকার্য, কি কুকার্য করিয়াছ। যদিও কোনও প্রকার কুকার্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবে যে, আর এমন কাজ কখনও করিব না।'

এইরূপে খেতু, নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতাপুত্রের নিদ্রা হইল না। দুই জনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

কতবার মা বলিলেন,—'খেতু! ঘুমাও, না ঘুমাইলে অসুখ করিবে।'

খেতু বলিলেন,—'না মা! আজ রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আর মা কা'ল রাত্রিতে তো আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাব না? কা'ল কতদূর চলিয়া যাব। সে কথা যখন মা! মনে করি, তখন আমার কান্না পায়।'

মা বলিলেন,—পূজার ছুটির আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি আবার বাড়ী আসিবে।

প্রাতঃকালে রামহরি আসিলেন। খেতুর মা, খেতুর কপালে দধির ফোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিলেন। নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর খেতুর হাতটি দিলেন। চক্ষু ফুটিয়া জল আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিলেন।

অবশেষে ধীরে ধীরে কেবল এই কথাটি বলিলেন,—'দুঃখিনীর ধন তোমাকে দিলাম।'

রামহরি বলিলেন,—'খেতু! মাকে প্রণাম কর।'

খেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজেও প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া দুইজনে বিদায় হইলেন।

যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতুর মা অনিমিষ নয়নে সেই পথপানে চাহিয়া রহিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না, তখন খেতুর মা পথের ধূলায় শুইয়া পড়িলেন। ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া অবিরল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধূলা ভিজাইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পথে পড়িয়া খেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তনু রায়ের স্ত্রী সেইখানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—'দিদি! চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের অমঙ্গল হয়।'

খেতুর মা উত্তর করিলেন—''সব জানি বোন্! কিন্তু কি করি? চক্ষের জল যে রাখিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমি যে আজ পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি! কি করিয়া ঘরে যাই? আজ যে আমার আর কোন কাজ নাই। আজ তো আর খেতু পাঠশালা হইতে কালিঝুলি মাখিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া আসিবে না? এতক্ষণ খেতু কতদূর চলিয়া গেল! আহা, বাছার কত না মন কেমন করিতেছে!'

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—'চল দিদি! ঘরে চল। সেইখানে বসিয়া, চল, খেতুর গল্প করি। আহা! খেতু কি গুণের ছেলে! দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে—তবেই; তা না হইলে সব বৃথা।'

এই বলিয়া তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর-মার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই জনে খেতুর গল্প করিলেন।

খেতু খাইয়া গিয়াছিল, তনু রায়ের স্ত্রী সেই বাসনগুলি মাজিলেন ও ঘর-দ্বার সব পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বেলা হইলে খেতুর মা রাঁধিয়া খাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারিগুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনাটুকু বাটিয়া দিলেন।

খেতুর মা বলিলেন,—'থাক বোন্ থাক্! আজ আর আমার খাওয়া-দাওয়া! আজ আর আমি কিছু খাইব না।'

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—'না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে? খেতুর অকল্যাণ হইবে।'

'খেতুর অকল্যাণ হইবে।' এই কথাটি বলিলেই খেতুর মা চুপ! যা' করিলে খেতুর অকল্যাণ হয়, তা' কি তিনি করিতে পারেন?

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—'এই সব ঠিক করিয়া দিলাম। বেলা হইলে রান্না চড়াইয়া দিও। কাজকর্ম সারা হইলে আমি আবার ও-বেলা আসিব।'

অপরাহ্নে তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় আসিলেন। কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

খেতুর মা বলিলেন,—'আহা! কি সুন্দর মেয়েটি বোন্! যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।'

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—'হাঁ! সকলেই বলে, এ মেয়েটি তোমার গর্ভের সুন্দর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আসে? মেয়ে হইলে ঘরের মানুষটি আহ্লাদে আটখানা হন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, আঁতুর ঘরেই মুখে নুন দিয়া মারি। গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটির যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি, দিদি! মার প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এ নিয়ম করিয়াছে, তাহাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটাপেটা করি। মুখপোড়া যদি একটু জল খাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে কিছু বলিতাম না!'

খেতুর মা বলিলেন,—'আর বোন! আর জন্মে যে যেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে, আবার এ জন্মে যে যেরূপ করিবে, ফিরে জন্মে সে তার ফল পাইবে।'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'তা বটে! কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথায় প্রবোধ মানে গা?'

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—'এক একবার মনে হয় যে, যদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে, তো ঠাকুরদের সিন্নি দিই।'

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—'চুপ কর বোন্! ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না! বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবরা যদি বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পারে না, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছি ছি! ওমা! কি ঘৃণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে?'

তনু রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—'দিদি! এতদিন তুমি কলিকাতায় ছিলে, কিন্তু তুমি কিছুই জান না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুড়ো-হাবড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অল্প বয়সে যারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তাও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে; যাহার ইচ্ছা না হবে, সে না দিবে।'

খেতুর মা বলিলেন,—'কি জানি, ভাই। অমি অত শত জানি না।'

তনু রায়ের স্ত্রীর দুইটি বিধবা মেয়ে, তাহাদের দুঃখে তিনি সদাই কাতর। সে জন্য বিধবা-বিবাহের কথা পড়িলে তিনি কান দিয়া শুনিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেতুর মা যাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

তনু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটি যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন,—'বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন? শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুইবার কেন? বিধবাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগা দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।'

তনু রায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্য হইয়াছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—'আহা! বাপের প্রাণ! ঘরে দুইটি বিধবা মেয়ে, মনের খেদে উনি এইরূপ কথা বলিতেছেন।'

কেবল নিরঞ্জন বলিলেন,—'হাঁ! বিধবা-বিবাহটি প্রচলিত হইলে তনু রায়ের ব্যবসাটি চলে ভাল!'

এই কথা শুনিয়া সকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,— 'নিরঞ্জনের মনটি হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হইলেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন? যার দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি, আজ সে পথের ভিখারী; কোনও দিন অন্ন হয়, কোনও দিন অন্ন হয় না।'

খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল।

খেতুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার এ মেয়েটি বুঝি এক বৎসরের হইল?'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'হাঁ! এই এক বৎসর পার হইয়া দুই বৎসরে পড়িবে?'

খেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মেয়েটির নাম রাখিয়াছ কি?'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'ইহার নাম হইয়াছে, 'কঙ্কাবতী'।'

খেতুর মা বলিলেন, — 'কঙ্কাবতী! দিব্য নামটি তো? মেয়েটিও যেরূপ নরম নরম দেখিতে, নামটিও সেইরূপ নরম নরম শুনিতে।'

এইরূপে খেতুর মাতে, আর তনু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সদ্ভাব হইল। অবসর পাইলে তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার কাছে আসেন, আর খেতুর মা-ও তনু রায়ের বাটীতে যান। মাঝে মাঝে তনু রায়ের স্ত্রী কঙ্কাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেয়েটি এখনও হাঁটিতে শিখে নাই; হামাগুড়ি দিয়া চারিদিকে বেড়ায়, কখনও বা বসিয়া খেলা করে, কখনও বা পিছু ধরিয়া দাঁড়ায়। খেতুর মা আপনার কাজ করেন ও তাহার সহিত দুটি একটি কথা ক'ন্। কথা কহিলে মেয়েটি ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটি বড় শান্ত, কাঁদিতে একেবারে জানে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—বালক-বালিকা

কলিকাতায় গিয়া খেতু ভালরূপে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি! খেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবল একটি শিশুপুত্র, তাহার নাম নরহরি। তিন বৎসর পরে একটি কন্যা হয়; তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী, খেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ করিতেন। খেতুর প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া স্কুলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। খেতু সকল কথা বুঝিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যখন যে শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর সর্বোত্তম বালক—খেতু; খেতুর উপর কেহ উঠিতে পারে না। যখন যে কয়খানি পুস্তক পড়েন, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া খেতুকে ঠকানো ভার। এইরূপে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল খাইবার নিমিত্ত রামহরি খেতুকে একটি করিয়া পয়সা দিতেন; খেতু কোনও দিন খাইতেন, কোনও দিন খাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন।

খেতুকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'খেতু! তুমি জল খাও না কেন? পয়সা লইয়া কি কর?'

খেতু কিছু অপ্রতিভ হইলেন, একটুখানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন,—'দাদামহাশয়! যে দিন বড় ক্ষুধা পায়, সেই দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল খাই; যে দিন না খাইয়া থাকিতে পারি, সেই দিন আর খাই না। যা পয়সা বাঁচিয়াছে, তাহা আমার নিকট আছে। যখন মার নিকট হইতে আসি, তখন মাকে বলিয়াছিলাম যে, মা! তোমার জন্য আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব; সেই জন্য এই পয়সা রাখিতেছি।'

যখন এই কথা হইতেছিল, তখন রামহরির নিকট খেতু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামহরি খেতুর মাথায় হাত দিয়া সম্মুখের চুলগুলি পশ্চাৎ দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। খেতু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামহরি বলিলেন,—'খেতু! যখন মালা কিনিবে আমাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।'

পূজার ছুটি নিকট হইল। তখন খেতু বলিলেন,—'দাদা মহাশয়! কৈ, এইবার মালা কিনিয়া দিন?'

রামহরি বলিলেন,—'তোমার কতগুলি পয়সা হইয়াছে, নিয়ে এস, দেখি?'

খেতু পয়সাগুলি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টাকারও অধিক পয়সা হইয়াছে। আট আনা দিয়া রামহরি একছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি পয়সাগুলি খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন।

খেতু বলিলেন,—'দাদা মহাশয়! আমি এ পয়সা লইয়া আর কি করিব? এ পয়সা আপনি নিন!'

রামহরি উত্তর করিলেন,—'না খেতু! এ পয়সা আমার নয়, এ পয়সা তোমার, বাড়ী গিয়া মাকে দিও, তোমার মা কত আহ্লাদ করিবেন।'

বাড়ী যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে খেতুর মনে, আর সেখানে মার মনে আনন্দ আর ধরে না। তসর ও

গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি খেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন সময়ে দেশে পৌঁছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে খেতুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুকুরধারে কেন? খেতুর মা আরও অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতে খেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন। খেতুর মা ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেন।

খেতু বলিলেন,—'ঐ যা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।'

মা উত্তর করিলেন,—'থাক্ আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হউক্।'

খেতু বলিলেন,—'মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আসিবে, তা' জানিতাম না!'

মা বলিলেন,—'বাছা! যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলিকাতা পর্যন্ত যাইতাম। খেতু! তুমি রোগা হইয়া গিয়াছ।'

খেতু উত্তর করিলেন,—'না মা! রোগা হই নাই, পথে একটু কষ্ট হইয়াছে, তাই রোগা রোগা দেখাইতেছে। মা! এখন আমি হাঁটিয়া যাই, এত দূর তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।'

মা বলিলেন,— 'না না, আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব।'

কোলে যাইতে যাইতে খেতু পয়সাগুলি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। বাড়ী যাইয়া যখন খেতু মা'র কোল হইতে নামিলেন, তখন মা'র আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,—'এ আবার কি? খেতু! তুমি বুঝি আমার আঁচলে পয়সা বাঁধিয়া দিলে?'

খেতু হাসিয়া উঠিলেন আর বলিলেন—'মা! রও, তোমাকে আবার একটা তামাসা দেখাই।'

এই বলিয়া খেতু মালা-ছড়াটি মা'র গলায় দিয়া দিলেন, আর বলিলেন,—'কেমন মা! মনে আছে তো?'

মা খেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন,—'ভারি দুষ্ট ছেলে!' খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন খেতু দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটীতে কোথা হইতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়াছে।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'মা! ও মেয়েটি কাদের গা?'

মা বলিলেন,—'জান না? ও যে তোমার তনুকাকার ছোট মেয়ে! ওর নাম কঙ্কাবতী। তনু রায়ের স্ত্রী এখন সর্বদাই আমার নিকট আসেন। আমি পৈতা কাটি, আর দুইজনে বসিয়া গল্পগাছা করি। মেয়েটিকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যান। মেয়েটি আপনার মনে খেলা করে, কোনওরূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভালবাসে।'

তনু রায়ের সহিত খেতুর কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পাড়া-প্রতিবাসী, সুবাদে কাকা কাকা বলিয়া ডাকেন।

কঙ্কাবতীকে খেতু বলিলেন,—'এস, এই দিকে এস।'

কঙ্কাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেতু বলিলেন,—'দেখ দেখ, মা! কেমন এ টল্ টল্ করিয়া চলে।'

খেতুর মা বলিলেন,—'পা এখনও শক্ত হয় নাই।'

একটি পাতা দেখাইয়া খেতু বলিলেন,—'এই নাও।'

পাতাটি লইবার নিমিত্ত কঙ্কাবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।

খেতু বলিলেন,—'মা! কেমন হাসে দেখ?'

মা উত্তর করিলেন,—'হাঁ বাছা! মেয়েটি খুব হাসে, কাঁদিতে একেবারে জানে না, অতি শান্ত।'

খেতু বলিলেন,—'মা! আগে যদি জানিতাম, তো ইহার জন্য একটি পুতুল কিনিয়া আনিতাম।'

মা বলিলেন,—'এইবার যখন আসিবে, তখন আনিও।'

নবম পরিচ্ছেদ—মেনী

পূজার ছুটী ফুরাইলে, খেতু কলিকাতায় যাইলেন; সেখানে অতি মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। বৎসরের মধ্যে দুইবার ছুটী হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মার জন্য কোনও না কোনও দ্রব্য, আর কঙ্কাবতীর জন্য পুতুলটি খেলনাটি লইয়া আসেন। খেতুর মার নিকট কঙ্কাবতী সর্বদাই থাকে, কঙ্কাবতীকে তিনি বড় ভালবাসেন।

খেতুর যখন বার বৎসর বয়স, তখন তিনি একটি বড় মানুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা খেতুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাসে টাকা কয়টি খেতু, রামহরির হাতে দিয়া বলিলেন, 'দাদা মহাশয়! এ মাস হইতে মা'র চাউলের দাম আর আপনি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি শুনিয়াছি, আপনার ধার হইয়াছে, তাই যত্ন করিয়া আমি এই টাকা উপার্জন করিয়াছি।'

রামহরি বলিলেন,—'খেতু! তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যম, উৎসাহ, পৌরুষ মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি তোমার মার নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিখিব যে, তুমি নিজে এ টাকা উপার্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিব যে, দ্বাদশ বৎসরের শিশু আমাদের খেতু, তাহার মাকে প্রতিপালন করিতেছে।'

এইবার যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন মার জন্য একখানি নামাবলী, আর কঙ্কাবতীর জন্য একখানি রাঙা কাপড় আনিলেন। রাঙা কাপড়খানি পাইয়া কঙ্কাবতীর আর আহ্লাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহার মাকে দেখাইতে যাইলেন।

খেতু বলিলেন,—'মা! কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শিখাইলে হয় না?'

মা বলিলেন,—'কি জানি বাছা! তনু রায় এক প্রকারের লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।'

খেতু বলিলেন,—''তাতে আর দোষ কি, মা? কলিকাতায় কত মেয়ে স্কুলে যায়।''

মা বলিলেন,—'কঙ্কাবতীর মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।'

সেই দিন তনু রায়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর মা কথায় কথায় বলিলেন,—'খেতু বলিতেছে,—'এবার যখন বাটী আসিব, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি বই আনিব, কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।' আমি বলিলাম— 'না বাছা! তাতে আরকাজ নাই, তোমার তনু কাকা হয় তো রাগ করিবেন।'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'তাতে আবার রাগ কি, আজকাল তো ঐ সব হইয়াছে। জামা গায়ে দেওয়া, লেখাপড়া করা, আজকাল তো সকল মেয়েই করে! তবে আমাদের পাড়াগাঁ তাই, এখানে ও-সব নাই।'

বাটী গিয়া কঙ্কাবতীর মা স্বামীকে বলিলেন,—'খেতু বাড়ী আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর জন্য কেমন একখানি রাঙা কাপড় আনিয়াছে!'

তনু রায় বলিলেন,—''খেতু ছেলেটি ভাল। লেখাপড়ায় মন আছে। দু'পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে। তবে বাপের মত ডোক্‌লা না হয়।''

স্ত্রী বলিলেন—'খেতু বলিতেছিল যে, এইবার যখন বাটী আসিব, তখন একখানি বই আনিয়া কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।'

তনু রায় বলিলেন,—'স্ত্রীলোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।'

না বুঝিয়া তনু রায় এই কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন তিনি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, লেখাপড়ার অনেক গুণ আছে।

আজকালের বরেরা শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ভালবাসে। এরূপ কন্যার আদর হয়, মূল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই—কাজটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিনা? শাস্ত্রসম্মত না হইলে তনু রায় কখনই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

বিচার করিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বটে, তবে এ নিষেধটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্য নয়। পূর্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, নরমেধ যজ্ঞ। এখন মানুষ বলি দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টান্ত—সমুদ্রযাত্রা এখন করিলে জাতি যায়।

তাই তনু রায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি একবার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তনু রায় কিছুতেই পাঠান নাই।

মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—'মা! সাগর যাইতে নাই। সমুদ্রযাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুদ্র দেখিলে পাপ, সমুদ্র ছুঁইলে পাপ। কেন মা পয়সা খরচ করিয়া পাপের ভরা কিনিয়া আনিবে? কেন মা জাতিকূল বিসর্জন দিয়া আসিবে?'

এক্ষণে তনু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। সুতরাং পূর্বকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা পূর্বে মানা ছিল, তাই এখন তাহাতে কোনও রূপ দোষ হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তনু রায় এইরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রটি যখন মনের মতন গড়া হইল, তখন তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা! খেতু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, তাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।'

তনু রায়ের স্ত্রী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন।

এবার যখন খেতু বাড়ী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। 'লেখাপড়া শিখিব,' এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কঙ্কাবতীর খুব আহ্লাদ হইল।

কিন্তু দুই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, লেখাপড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কঙ্কাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখায়। কঙ্কাবতী এটি বলিতে সেটি বলিয়া ফেলেন।

খেতুর রাগ হইল। খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তোমার লেখাপড়া হইবে না। চিরকাল তুমি মূর্খ হইয়া থাকিবে।'

কঙ্কাবতী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন,—'আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে না?'

খেতুর মা বলিলেন,—'ছেলেমানুষকে কি বকিতে আছে? মিষ্ট কথা বলিয়া শিখাইতে হয়! এস, মা! তুমি আমার কাছে এস! তোমার আর লেখাপড়া শিখিতে হইবে না।'

খেতু বলিলেন,—'মা! কঙ্কাবতী রাত্রি-দিন মেনীকে লইয়া থাকে। তাকে কি আর লেখাপড়া হয়?'

মেনী কঙ্কাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'জেঠাই-মা! আমি মেনীকে ক খ শিখাই; তা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা, কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে পারি না। আমিও ছেলে মানুষ, মেনীও ছেলে মানুষ। আমিও বড় হইলে পড়িতে শিখিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে শিখিবে। না মেনী?'

খেতু হাসিয়া উঠিলেন। খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তুমি পাগল না কি?' যাহা হউক, ক্রমে কঙ্কাবতীর প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় সায় হইল।

খেতু বলিলেন,—'আমি শীঘ্র কলিকাতায় যাইব। তাড়াতাড়ি করিয়া প্রথমভাগখানি শেষ করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাসে পুস্তকখানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাখিবে। এবার আমি দ্বিতীয়ভাগ লইয়া আসিব।'

পুনরায় যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল। কঙ্কাবতীকে আর পড়াইতে হইল না। কঙ্কাবতী এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিখিলেন। খেতু কঙ্কাবতীকে একখানি পাটীগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কঙ্কাবতী অঙ্ক শিখিলেন। মাঝে মাঝে খেতু কেবল একটু আধটু বলিয়া দিতেন।

কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু, তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।

দশম পরিচ্ছেদ—বৌদিদি

তের বৎসর বয়সে খেতু ইংরাজীতে প্রথম পাসটি দিলেন। পাস দিয়া তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইয়া মার নিকট তিনি একটি ঝি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা বৃদ্ধা হইতেছেন, মার যেন কোনও কষ্ট না হয়। এটি সেটি আনিয়া, কাপড়খানি চোপড়খানি কিনিয়া, রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পনর বৎসর বয়সে খেতু আর একটি পাশ দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বৎসর বয়সে আর একটি পাশ দিলেন। জলপানি আরও বাড়িল।

খেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইলেন। মা যখন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাঁহার আর কিছু মাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া খেতুর মা একদিন ফুল পান নাই। তাহা শুনিয়া খেতু বাড়ীর নিকট একটি চমৎকার ফুলের বাগান করিলেন। কলিকাতা হইতে কত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুতিলেন। নানা রঙের ফুলে বাগানটি বার মাস আলো করা থাকিত।

রামহরির কন্যা সীতার এখন সাত বৎসর বয়স। মা একেলা থাকেন, সেই জন্য দাদাকে বলিয়া, খেতু সীতাকে মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকে পাইয়া খেতুর মার আর আনন্দের অবধি নাই।

কঙ্কাবতীও সীতাকে খুব ভালবাসিতেন। বৈকাল বেলা দুই জনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কঙ্কাবতী এখন খেতুর সম্মুখে বড় বাহির হন না। খেতুকে দেখিলে কঙ্কাবতীর এখন লজ্জা করে।

তবে খেতুর গল্প করিতে, খেতুর গল্প শুনিতে তিনি ভালবাসিতেন। অন্য লোকের সহিত খেতুর গল্প করিতে, কিংবা অন্য লোকের মুখে খেতুর কথা শুনিতে, তাঁর লজ্জা করিত। এ সব কথা সীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা দুইজনে ফুলের বাগানে যাইতেন। নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া কঙ্কাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ফুল দিয়া নানারূপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, যেখানে যাহা ধরিত, কঙ্কাবতী সীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন। তাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া খেতুর কথা শুনিতেন।

নিরঞ্জন কাকাকে খেতু ভুলিয়া যান নাই। যখন খেতু বাটী আসেন, তখন নিরঞ্জন কাকার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমতে আশীর্বাদ করেন।

কঙ্কাবতী বড় হইলে, খেতু তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজকাল বালিকাদিগের নিমিত্ত যেরূপ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে, কঙ্কাবতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া যাইতেন।

রামহরির সংসারের খেতু সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রামহরি এ কথায় সহজে স্বীকার হন নাই। একবার খেতু নরহরির জন্য একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি খেতুকে বকিয়াছিলেন। খেতুর তাহাতে অতিশয় অভিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া তিনি রামহরির স্ত্রীর নিকট গিয়া নানারূপ দুঃখ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে খেতু বৌদিদি বলিয়া ডাকিতেন।

খেতুর অভিমান দেখিয়া বৌদিদি বলিলেন,—'তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিয়াছ?'

খেতু উত্তর করিলেন,—'বৌদিদি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র নরহরি যেরূপ, আমাকেও সেইরূপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যখন না দেখিলে, তখন আমি 'পর'। আমি যখন পর, তখন আবার তোমাদের সঙ্গে আমরা ঝগড়া কি? দাদা মহাশয় আমাকে পর মনে করিয়াছেন, এখন তুমিও তাই কর, তাহা হইলে সকল কথাই ফুরাইয়া যায়।'

বৌদিদি বলিলেন,—'তাহা হইলে কি হয়, খেতু?'

খেতু উত্তর করিলেন,—'কি হয়? হয় আর কি? তাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্জন করিতে যত্ন করি না।

তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি না। মনে করি. আমার মাকে ভিখারিণী দেখিয়া ইহারা ভিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার এই শরীর, আমার এই অস্থি, মাংস সমুদায় ভিক্ষায় গঠিত। ভদ্রসমাজে আর যাই না, ভদ্রসমাজে আর মুখ তুলিয়া কথা কহি না। দুঃখিনী ভিখারিণীর ছেলে. ভিক্ষায় যাহার দেহ গঠিত কোন্ মুখে সে আবার ভদ্রসমাজে দাঁড়াইবে?'

বৌদিদি বলিলেন,—'ছি খেতু! অমন কথা বলিতে নাই। সম্পর্কে তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক স্নেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে. তাহাই হইবে, তাহার আবার অভিমান কি?'

খেতু বলিলেন,—'বৌদিদি! মাকে সুখে রাখিবে, তোমাদিগকে সুখে রাখিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন যদি তোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় দুঃখ হইবে।'

বৌদিদি উত্তর করিলেন,—'সার্থক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্বাদ করি, খেতু! শীঘ্রই তোমার একটি রাঙা বৌ হউক।'

সেই দিন রামহরির স্ত্রী. রামহরিকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—'দেখ! আমাদের সংসারের কষ্ট দেখিয়া খেতু বড় কাতর হইয়াছে। খেতু এখন দু পয়সা আনিতেছে। সে বলে,—'যখন ইহারা আমাকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, তখন আমিও পুত্রের মত কার্য করিব।' সংসার-খরচে খেতু যদি কোনওরূপ সহায়তা করে, তাহা হইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষয়ে খেতুকে কিছু বলিলে, তাহার মনে বড় দুঃখ হয়।'

স্ত্রী কাছে সকল কথা শুনিয়া, রামহরি খেতুকে ডাকিলেন। খেতু আসিলে রামহরি তাঁহাকে বলিলেন,—'রাগ করিয়াছ, দাদা? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান! আমার মত যখন বয়স হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরূপ পাগল। সেই জন্য, খেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের দুঃখ চিরকাল। আমাদের কখনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না। সে দুঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব? অনেক দিন হইতে আমি জলখাবার খাই না। জ্বর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে কেন এ দুঃখে পড়িতে দিব? এই মনে করিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভাবি নাই, তুমি কিরূপ পিতার পুত্র। খেতু! অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্বাদ করি, ভাই! যেন তুমি সেই দেবতুল্য হও।'

রামহরির চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চক্ষু পুছিতে লাগিলেন। খেতুরও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

খেতু তিনটা পাস দিলেন, আর কন্যাভারগ্রস্ত লোকেরা রামহরির নিকট আনাগোনা করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা খেতুর সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইনি বলেন,—'আমি এত সোনা দিব, এত টাকা দিব'; তিনি বলেন,— 'আমি এত দিব, তত দিব;' এইরূপে সকলে নিলাম-ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

রামহরি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, যে যত দিন না খেতুর স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত হয়, যত দিন না খেতু দুপয়সা উপার্জন করিতে পারে, তত দিন তিনি খেতুর বিবাহ দিবেন না।

কিন্তু কন্যাভারগ্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন? রামহরির নিকট তাঁহারা নানারূপ বিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—'দূর হউক! এক স্থানে কথা দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরূপ ব্যস্ত করিবে না।'

এই মনে করিয়া তিনি অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয়বাবু সঙ্গতিপন্ন লোক ও সদ্বংশজাত। রামহরি কিন্তু তাঁহাকে সঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেতুর মা'র মত না লইয়া কি করিয়া তিনি কথা স্থির করেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ—সম্বন্ধ

কঙ্কাবতীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর রূপে দশদিক্ আলো, কঙ্কাবতীর পানে চাওয়া যায় না। রংটি উজ্জ্বল ধবধবে, ভিতর হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে; জল খাইলে যেন জল দেখা যায়। শরীরটি স্থূলও নয়, কৃশও নয়, যেন পুতুলটি, কি ছবিখানি; মুখখানি যেন বিধাতা কুঁদে কাটিয়াছেন। নাকটি টিকোলো-টিকোলো, চক্ষু দুটি টানা, চক্ষুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু কিঞ্চিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরূপ চক্ষু দুইটির উপর যেরূপ সরু সরু কাল কাল, ঘন ভুরুতে মানায়, কঙ্কাবতীর তাহাই ছিল। গাল দুটি নিতান্ত পূর্ণ নহে, কিন্তু হাসিলে টোল পড়ে। তখন সেই হাসিমাখা টোলখাওয়া মুখখানি দেখিলে শত্রুর মনও মুগ্ধ হয়। ঠোঁট দুটি পাতলা। পান খাইতে হয় না, আপনা আপনি সদাই টুক্‌টুক্ করে। কথা কহিবার সময় এই ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা দুধের মত দুই চারিটি দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দাঁতগুলি যেন ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, ঘোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া কোঁকড়া হইয়া পিঠের উপর গিয়া পড়ে। সম্মুখের সিঁথিটি কে যেন তুলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থূল কথা, কঙ্কাবতী একটি প্রকৃত সুন্দরী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয় বার বার দেখিয়াও আশ মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কঙ্কাবতী যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করেন, তখন যথার্থই যেন বিজলী খেলিয়া বেড়ায়।

এখন কঙ্কাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কঙ্কাবতী সেরূপ আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্য একদিন একটু ছুটিয়া বাটী আসিয়াছিলেন। শ্রমে মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমা আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত মুখ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কঙ্কাবতীর রূপ তখন আর ধরে না।

মা, তাহা দেখিয়া, তনু রায়কে বলিলেন,—'তোমার মেয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ! এ সোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও না। কঙ্কাবতী স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন সুলক্ষণা মেয়ে জনমে কি কখনও দেখিয়াছ? মা যদি অভাগা কুটীরে আসিয়াছেন, তো, মাকে অনাস্থা করিও না। মা যেরূপ লক্ষ্মী, সেইরূপ নারায়ণ দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।'

তনু রায় কঙ্কাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তনু রায়ের মন কখনও এরূপ চকিত হয় নাই। তনু রায় ভাবিলেন,—'এ কি? একেই বুঝি লোকে অপত্যস্নেহ বলে?'

স্ত্রীর কথায় তনু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তনু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—'দেখ, কঙ্কাবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটি কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মনুষ্যজীবনে তো আমার একটি সাধ পূর্ণ কর!'

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি তোমার সাধ?'

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'আমার সাধ এই যে, ঝি-জামাই লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি। দুই মেয়ের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি ঘোর দুঃখের কারণ হইল। যা হউক, সে যা হইবার তা হইয়াছে; এখন কঙ্কাবতীকে একটি ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেয়ে দুইটি বলে যে, 'আমাদের কপালে যা ছিল, তা হইয়াছে, এখন ছোট বোনটিকে সুখী দেখিলে আমরা সুখী হই।'

স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, টাকার চেয়ে তনু রায়ের কেহই প্রিয় নয়। তথাপি, কঙ্কাবতীর কথা মনে পড়িলে, তাঁহার মন কিরূপ করে। সে কি মমতা, না আতঙ্ক? দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে দুরন্ত অর্থলোভও অজেয়। ত্রিভুবনমোহিনী কন্যাকে বেচিয়া তিনি বিপুল অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন? তনু রায়ের মনে আজ দুই ভাব। এরূপ সঙ্কটে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তনু রায় বলিলেন,—'আচ্ছা! আমি না হয়, কঙ্কাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম!

কিন্তু ঘর হইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজকাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে সুপাত্র মিলে না। তার কি করিব?'

স্ত্রী উত্তর করিলেন, —'আচ্ছা! আমি যদি বিনা টাকায় সুপাত্রে সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল?'

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোথায়? কে?'

স্ত্রী বলিলেন,—'বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না?'

তনু রায় বলিলেন,—'কে বল না শুনি?'

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'কেন খেতু?'

তনু রায় বলিলেন,—'তা কি কখনও হয়? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই; এরূপ পাত্রে আমি কঙ্কাবতীকে কি করিয়া দিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেয়েটি যাহাতে সুখে থাকে, দুখানা গহনা-গাঁটি পরিতে পায়, তা তো আমাকে করিতে হইবে?'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'খেতুর কি কখনও ভাল হইবে না? তুমি নিজেই না বল যে 'খেতু ছেলেটি ভাল, খেতু দু'পয়সা আনিতে পারিবে?' যদি কপালে থাকে তো খেতু হইতেই কঙ্কাবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর নাই হউক, ছেলেটি ভাল হয়, এই আমার মনের বাসনা। খেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথায় পাইবে, বল দেখি? মা কঙ্কাবতী আমার যেমন লক্ষ্মী, খেতু তেমনি দুর্লভ সুপাত্র। এক বোঁটায় দুইটি ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন!'

তনু রায় বলিলেন,—'ভাল, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে। এখন তাড়াতাড়ি কিছু নাই।'

আরও কিছু দিন গত হইল। কলিকাতা হইতে খেতুর মা'র নিকট একখানি চিঠি আসিল। সেই চিঠিখানি তিনি তনু রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্রখানি রামহরি লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই—

'খেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আসিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে, লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর খেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত। ব্যক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন? তাঁহারা বলেন, কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হয় পরে হইবে।' আমি অনেকগুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জন্মেজয় বাবুর কন্যা আমার মনোনীত হইয়াছে। কন্যাটি সুন্দরী, ধীর ও শান্ত। বংশ সৎ, কোনও দোষ নাই। মাতাপিতা, ভাইভগিনী বর্তমান। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যাকে নানা অলঙ্কার ও জামাতাকে নানা ধন দিয়া বিবাহকার্য সমাধা করিবেন। এক্ষণে আপনার কি মত জানিতে পারিলে কন্যার পিতাকে আমি সঠিক কথা দিব।'

পত্রখানি পড়িয়া তনু রায় অবাক্। দুঃখী বলিয়া যে খেতুকে তিনি কন্যা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই খেতুকে জামাতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে।

খেতুর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,—'আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটি বাসনা ছিল, যখন দেখিতেছি, সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তখন সে কথায় আর আবশ্যক নাই।'

এই পত্র পাইয়া রামহরি খেতুকে সকল কথা বলিলেন, আর এ বিষয়ে খেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

খেতু বলিলেন,— 'দাদা মহাশয়! মা'র মনের বাসনা কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি। যতদিন মা'র মনের সাধ পূর্ণ হইবার কিছুমাত্রও আশা থাকিবে, ততদিন কোনও স্থানে আপনি কথা দিবেন না।'

রামহরি বলিলেন, —হাঁ, তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি এক্ষণে কোনও স্থানে কথা দিব না।

খেতুর অন্য স্থানে বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিয়া কঙ্কাবতীর মা একবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্রিদিন কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তনু রায়ও কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দুইটি বিধবা গলায়, পুত্রটি মূর্খ। এখন একটি অভিভাবকের প্রয়োজন। খেতু যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, খেতু যেরূপ সুবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চয় ভাল হইবে। আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না পারুক; পরে মাসে মাসে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইব।'

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—'তুমি যদি খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি খরচপত্র কিছু করিতে পারিব না।'

এইরূপ অনুমতি পাইয়া তনু রায়ের স্ত্রী, তৎক্ষণাৎ খেতুর মা'র নিকট দৌড়িয়া যাইলেন, আর খেতুর মা'র পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

খেতুর মা বলিলেন,—'কঙ্কাবতী আমার বৌ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন! দুই দিন আগে যদি বলিতে? অন্য স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিখিয়াছি। রামহরি যদি কোন স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ভয় হইতেছে।'

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—'দিদি! যখন তোমার মত আছে, তখন নিশ্চয় কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হইবে। তুমি একখানি চিঠি লিখিয়া রাখ। চিঠিখানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।'

তাহার পরদিন খেতুর মা ও কঙ্কাবতীর মা দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। খেতুর মা রামহরিকে একখানি পত্র লিখিলেন।

খেতুর মা লিখিলেন যে,—'কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। এক্ষণে তনু রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্য কোনও স্থানে যদি খেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কঙ্কাবতীর সহিত স্থির করিয়া তনু রায়কে পত্র লিখিবে।'

এই চিঠি পাইয়া রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও খেতু, সকলেই আনন্দিত হইলেন।

খেতুর হাতে পত্রখানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—'তোমার মা'র আজ্ঞা, ইহার উপর আর কথা নাই।'

খেতু বলিলেন,—'মা'র যেরূপ অনুমতি, সেইরূপ হইবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তনু কাকা তো মেয়েগুলিকে বড় করিয়া বিবাহ দেন। আর দুই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাসগুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমি দু'পয়সা আনিতেও শিখিব। আপনি এই মর্মে তনু কাকাকে পত্র লিখুন।'

রামহরি তনু রায়কে সেইরূপ পত্র লিখিলেন। তনু রায় সে কথা স্বীকার করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না, বরং তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি মনে করিলেন,—'স্ত্রীর কান্নাকাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম। দেখি না, খেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না? যদি পাই—। আচ্ছা, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে।'

খেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—'বৃদ্ধ হইয়া তনু রায়ের ধর্মে মতি হইতেছে।'

কঙ্কাবতী আজ কয়দিন বিরসবদনে ছিলেন। সকলে আজ কঙ্কাবতীর হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, তাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটি বিড়াল। সুতরাং কঙ্কাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—ষাঁড়েশ্বর

একবার পূজার ছুটীর পর পূর্বে, কলিকাতার পথে, খেতুর সহিত ষাঁড়েশ্বরের সাক্ষাৎ হইল।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন—'খেতু, বাড়ী যাইবে কবে? আমি গাড়ী ঠিক করিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর তো আমার গাড়ীতে তুমি যাইতে পার!'

খেতু উত্তর করিলেন,—'আমার এখনও স্কুলের ছুটি হয় নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।'

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'খেতু! তোমার হাতে ও কি?'

খেতু উত্তর করিলেন,—'এ একটি সিংহাসন। মা প্রতিদিন মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই মা'র জন্য একটি পাথরের শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্য এই সিংহাসন।'

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শিবটি তোমার কাছে আছে? কৈ দেখি?'

খেতু শিবটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ষাঁড়েশ্বরের হাতে দিলেন।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'শিবটি পকেটে রাখিয়াছিলে? খুব ভক্তি তো তোমার?'

খেতু উত্তর করিলেন,—'শিবের তো এখনও পূজা হয় নাই। তাতে আর দোষ কি?'

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'তাই বলিতেছি!'

এই কথা বলিয়া ষাঁড়েশ্বর শিবটি পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।

একথায় সেকথায় যাইতে যাইতে ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'এই যে, পাদ্‌রি সাহেবের বাড়ী! পাদ্‌রি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো আলাপ আছে! এস না? একবার দেখা করিয়া যাই!'

ষাঁড়েশ্বর ও খেতু, দুই জনে পাদ্‌রি সাহেবের নিকট যাইলেন।

পাদ্‌রি সাহেবের সহিত নানারূপ কথাবার্তার পর, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'আর শুনিয়াছেন, মহাশয়? মা পূজা করিবেন বলিয়া খেতু একটি পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটি খেতুর পকেটে রহিয়াছে।'

পাদ্‌রি সাহেব বলিলেন,—'আঁ! সে কি কথা! ছি ছি, খেতু। তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জন্য যে আমরা এত স্কুল করিলাম, সে সব বৃথা হইল। এই বাঙ্গালীজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিয়াত, বদমায়েস, পাষণ্ড, নরাধম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি দাস।'

খেতু বলিলেন,—''আহা! কি মধুর ধর্মের কথা আজ শুনিলাম! সর্বশরীর শীতল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে, এখনি খৃষ্টান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আসুন, আর বিলম্ব করেন কেন? আমার মাথায় দিন, দিয়া আমাকে খৃষ্টান করুন। বাঙ্গালীদের উপর চারি দিক্ হইতে যেরূপ আপনারা সকলে মিলিয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালীদের মন খৃষ্টীয় ধর্মামৃতরসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর? এই সব পট পট করিয়া খৃষ্টান হয় আর কি? আবার আমেরিকার কালা-খৃষ্টানদিগের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃভাব, তা যখন লোকে শুনিবে, আর আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়ামায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকি থাকিবে না, সব খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।'

এই কথা বলিয়া খেতু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ষাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে খেতু ষাঁড়েশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শুনতে পাই, আপনি প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্তন করেন। তবে পাদ্‌রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন?''ষাড়েশ্বর বলিলেন, 'উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম সে যাহা হউক সন্ধ্যা হইয়াছে আমার হরিসঙ্কীর্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে? দেখিলেও পূণ্য আছে।'

ষাঁড়েশ্বরের বাসা নিকট ছিল। খেতু ও ষাঁড়েশ্বর দুই জনে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খেতু দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের দালানে হরিসঙ্কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ষাঁড়েশ্বর সেখানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈঠকখানায় যাইলেন। খেতুকে সেইখানে বসিতে বলিয়া ষাঁড়েশ্বর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ও খেতুকে বলিলেন,—'খেতু! চল, অন্য ঘরে যাই।'

খেতু অন্য ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের আর দুইটি বন্ধু সেখানে বসিয়া আছেন! সেখানে খানা খাইবার সব আয়োজন হইতেছে।

নীচে হরিসঙ্কীর্তন চলিতেছে। ষাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের একজন চাঁই।

অল্পক্ষণ পরে খানা খাওয়া আরম্ভ হইল। দুইজন মুসলমান পরিবেশন করিতে লাগিল।

খেতু বলিলেন,—'আপনারা তবে আহারাদি করুন, আমি এখন যাই।'

খাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'না না, একটু থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুণ্য আছে। এখন যা আমরা খাইতেছি, উহা মাংসের ঝোল, ইহার নাম সূপ্; একটু সূপ্ খাইবে?'

খেতু বলিলেন,—'এ সব দ্রব্য আমি কখনও খাই নাই, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা আহার করুন।'

আবার কিছুক্ষণ পরে খাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'খেতু! এখন যা খাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ খাইতে দোষ কি? একটু খাও না?'

খেতু বলিলেন,—'মহাশয়! আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।'

খাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'তবে না হয়, এই একটু খাও। ইহা অতি উত্তম ব্র্যাণ্ডি। পাদরি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু খাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া যাইবে।'

খেতু বলিলেন,—'মহাশয়! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ি যাই।'

খাঁড়েশ্বরের একটি বন্ধু বলিলেন,—'তবে না হয় একটু হ্যাম আর মুরগী খাও। এ হ্যাম—বিলাতি শূকরের মাংস। ইহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। অভক্ষ্য, গ্রাম্য শূকর। বিলাতী শূকর খাইতে কোনও দোষ নাই। আর এ মুরগীও মহাকুক্কুট, রামপাখী-বিশেষ। হগ্ সাহেবেরবাজার হইতে কেনা, যে সে মুরগী নয়।'

খাঁড়েশ্বরের অপর বন্ধু বলিলেন,—'এইবার ভি-- ব কটলেট আসিয়াছে। খেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু খাইবেন।'

খানসামা এবার কি দ্রব্য আনিয়াছিল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। নীচে হরিসঙ্কীর্তনের ধূম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিন বন্ধুতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তখন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া খেতুকে ধরিলেন, অপর জন খেতুর মুখে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। খাঁড়েশ্বর বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধাক্কায় দুই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটি উলটাইয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাস, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলেন, আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযজ্ঞ করিয়া সেখান হইতে খেতু প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—বিড়ম্বনা

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল খেতুর এক্ষণে কুড়ি বৎসর বয়স। স্কুলের যা কিছু পাশ ছিল, খেতু সব পাশগুলি দিলেন। বাহিরেও দুটি একটি পাশ দিলেন। শীঘ্র একটি উচ্চপদ পাইবেন, খেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী ভাবিলেন, যে এক্ষণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিন স্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রত্যুত্তরে খেতুর মা অন্যান্য কথা বলিয়া অবশেষে লিখিলেন,—'তনু রায়কে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই; আজকাল সে বড়ই ব্যস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইবে, এই কার্যে তনু রায় একজন কর্তা হইয়াছেন। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধন্য কপাল! পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজ্বল্যমান রাখিয়া, অশীতিপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে? যখন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তখন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাথা সিন্দুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একখানি কস্তাপেড়ে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। আহা! তখন কি শোভা হইয়াছিল! যাহা হউক, তনু রায়ের একটু অবসর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।'

কিছু দিন পরে খেতুর মা রামহরিকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম এই,—

'বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তনু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়ামায়া নাই, তাহার ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই।

শুনিতেছি, সে নাকি জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্তমান! বয়সের গাছপাথর নাই। চলিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া! তার আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে, এরূপ করিতে হয় নাকি? তিনি বড় মানুষ, জমীদার, না হয় রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়? বৃদ্ধ মনে ভাবে না যে মৃত্যু সন্নিকট? যেরূপ তাহার অবস্থা, তাহাতে আর কয় দিন? লাঠি না ধরিয়া একটি পা চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা! আর তনু রায় কি নিকষা! দুধের বাছা কঙ্কাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল? সেই মধুমাখা মুখখানি মনে করিলে, বুক ফাটিয়া যায়। শুনিতে পাই, কঙ্কাবতীর মা নাকি রাত্রিদিন কাঁদিতেছেন। আমি ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আসেন নাই। বলিয়া পাঠাইলেন যে, দিদির কাছে আর মুখ দেখাইব না, এ কালা মুখ লোকের কাছে আর বাহির করিব না। এই বিবাহের কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা! তাঁহার মা'র প্রাণ! কতই না তিনি কাতর হইয়া থাকিবেন?'

এই চিঠিখানি পাইয়া রামহরি খেতুকে দেখাইলেন।

খেতু বলিলেন,—'দাদা মহাশয়! আমি এইক্ষণে দেশে যাইব।'

রামহরি বলিলেন,—'জনার্দন চৌধুরী বড়লোক, তুমি সহায়হীন বালক, তুমি দেশে গিয়া কি করিবে?'

খেতু বলিলেন,—'আমি কিছু করিতে পারি না সত্য, তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কঙ্কাবতীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাও কর্তব্য। কৃতকার্য না হই, কি করিব?'

খেতু দেশে আসিলেন। মা'র নিকট ও পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট সকল কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী প্রথমে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। কেবল তাঁহার সভাপণ্ডিত গোবর্ধন শিরোমণি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করিয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলে কি হয়? জনার্দন চৌধুরীর শ্রী-চাঁদ আছে, প্রাণে সখও আছে। দুর্লভ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা দ্বারা গলদেশ তাঁহার সর্বদাই সুশোভিত থাকে। কফের ধাতু বলিয়া শৈত্যনিবারণের জন্য চূড়াদার টুপি মস্তকে তাহার দিন-রাত্রি বিরাজ করে। এইরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভৃতে বসিয়া যখন তিনি গোবর্ধন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

খেতু শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী বিবাহ করিবার জন্য এখন একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। আর বিলম্ব সহে না। এই বৈশাখ মাসের ২৪শে তারিখে বিবাহ হইবে। জনার্দন চৌধুরী এক্ষণে দিন গণিতেছেন। তাঁহার পুত্রকন্যা সকলের ইচ্ছা, যাহাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু, কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। তাঁহার বড় কন্যা এক দিন মুখ ফুটিয়া মানা করিয়াছিলেন। সেই অবধি বড় কন্যার সহিত তাঁহার আর কথাবার্তা নাই।

জনার্দন চৌধুরীকে কন্যা দিতে তনু রায়ও প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনার্দন চৌধুরী বলিলেন যে,—'আমার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিব, একখানি তালুক দিব, স্ত্রীর গা সোনা দিয়া মুড়িব, আর কন্যার পিতাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিব।' তখন তনু রায় আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া তবুও তনু রায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র টাকার কথা শুনিয়া, একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। বাকিয়া ঝকিয়া পিতাকে তিনি সম্মত করিলেন। টাকার লোভে এক্ষণে পিতাপুত্র দুই জনেই উন্মত্ত হইয়াছেন।

তবুও তনু রায় স্ত্রীর নিকট নিজে এ কথা বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—'তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।'

এই কথা বলিয়া পুত্র মা'র নিকট যাইলেন। মাকে বলিলেন,—'মা! জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সব স্থির করিয়া আসিয়াছেন।'

মা'র মাথায় বজ্রাঘাত হইল! মা বলিলেন,—'সে কি রে? ওরে, সে কি কথা! ওরে, জনার্দন চৌধুরী যে

তেকেলে বুড়ো! তার যে বয়সের গাছপাথর নাই! তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি রে?'

পুত্র উত্তর করিলেন,—'বুড়ো নয় তো কি যুবো? না সে খোকা? জনার্দন চৌধুরী ভুলো করিয়া দুধ খায় নাকি? না ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করে? মা যেন ঠিক পাগল! মা'র বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে নাই। কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে যেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক মুলুক দিবে. বাবাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিবে. আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। থুড়থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তিসামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাঁচিত. তার ঠিক কি? মা! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।'

এ কথার উপর আর কথা নাই; মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। অবিরল ধারায় তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে,—'হে পৃথিবী! তুমি দুই ফাঁক হও, যে তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।' মেয়ে দুইটিও অনেক কাঁদিলেন. কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কঙ্কাবতী নীরব। প্রাণ যাহার ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে?

মা ও প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে খেতু এই সকল কথা শুনিলেন।

খেতু প্রথম তনু রায়ের নিকট যাইলেন। তনু রায়কে অনেক বুঝাইলেন। খেতু বলিলেন,—'মহাশয়! এরূপ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটি সুপাত্রের হাতে দিন। মহাশয় যদি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।'

এই কথা শুনিয়া তনু রায় ও তনু রায়ের পুত্র, খেতুর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইলেন; নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া খেতু তাহার পর জনার্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত যোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে জনার্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দন চৌধুরী সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যখন তাঁহাকে দুই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তখন রাগে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেষ্মার ধাত, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল, দম আট্‌কাইয়া তিনি বা মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—'গলাধাক্কা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।'

অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ খেতুর গলাধাক্কা দিতে আসিল।

খেতু জনার্দন চৌধুরীর লাঠিগাছটি তুলিয়া লইলেন। পারিষদবর্গকে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—'তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব।'

খেতুর তখন সেই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভয়ে সকলেই আকুল হইল; গলাধাক্কা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয়পক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া খেতুকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

খেতু চলিয়া গেলেন। তবুও জনার্দন চৌধুরীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, খক্ খক্ করিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—'ছোঁড়ার কি আস্পর্ধা! আমাকে কি না বুড়ো বলে!'

গোবর্ধন শিরোমণি বলিলেন,—'না না! আপনি বৃদ্ধ কেন হইবেন? আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।'

ষাঁড়েশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'হয় তো ছোকরা মদ খাইয়া আসিয়াছিল! চক্ষু দুইটা যেন জবাফুলের মত, দেখিতে পান নাই?'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'ও কথা বলিও না! যারা মদ খায়, তারা খায়। কে মদ-মুরগী খায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।'

ষাঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন,—'সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বলিলেন,—'যে, আমি মদ-মুরগী খাই।' আমি ইঁহার নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এঁর হাড় কয়খানা জেলে পচাইব।'

গোবর্ধন শিরোমণি বলিলেন,—'ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি যে যবনের

জল খান, তাহা জানি! সেই যারে বলে 'বরখ'. সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান। গদাধর ঘোষ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।'

জনার্দন চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি কি? কি বলিলে?'

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—'সর্বনাশ! বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রস্তুত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্মটি একেবারে লোপ হইল। হায় হায়! পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম একেবারে লোপ হইল।'

নিরঞ্জন বলিলেন,—'ষাড়েশ্বর বাবু! একবার মনে করিয়া দেখ, খেতুর বাপ তোমার কত উপকার করিয়াছেন। খেতুর অপকার করিতে চেষ্টা করিও না।'

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'ও সব বাজে কথা এখন তোমরা রাখ; গদাধর ঘোষকে ডাকিতে পাঠাও।'

গদাধর ঘোষকে ডাকিতে লোক দৌড়িল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—গদাধর-সংবাদ

গদাধর ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া অতি দূরে সে মাটিতে বসিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—'কেমন হে গদাধর! এ কি কথা শুনিতে পাই? শিবচন্দ্রের ছেলেটা, ঐ খেতা, কি খাইয়াছিল? তুমি কি দেখিয়াছিলে? কি শুনিয়াছিলে? তাহার সহিত তোমার কি কথাবার্তা হইয়াছিল? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।'

গদাধর বলিল,—'মহাশয়! আমি মূর্খ মানুষ। অত শত জানি না। যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।'

গদাধর বলিল,—'আর বৎসর আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কোথায় থাকি? তাই রামহরির বাসায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিনসে হাঁড়ি মাথায় করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটি বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর খেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলকী যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও।' খেতু তাহাকে দুই পয়সার কিনিয়া দিলেন। তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! তুমি একটা কুলকী খাইবে?' আমি বলিলাম, 'না দাদাঠাকুর! আমি কুলকী খাই না।' রামহরি বাবুর ছেলে খেতুকে বলিল,—'কাকা! তুমি খাইবে না?' খেতু বলিলেন,—'না, আমার পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে আমার পিপাসা ভাঙ্গে না, আমি কাঁচা বরখ খাইব।' এই কথা বলিয়া খেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি সাদা ধবধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই ঢিলটা ভাঙ্গিয়া জলে দিলেন, সেই জল খাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর! ও কি?' খেতু বলিলেন,—'ইহার নাম বরখ। এই গ্রীষ্মকালের দিনে যখন বড় পিপাসা হয়, তখন ইহা জলে দিলে জল শীতল হয়' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'দিদিঠাকুর! সকল কাচ কি জলে দিলে, জল শীতল হয়?' খেতু উত্তর করিলেন,—'এ কাচ নয়, এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এইমাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বরখ তাহাই। সাহেবেরা বরখ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি?' এই বলিয়া আমার হাতে একটুখানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আমার হাত যেন করাত দিয়া কাটিতে লাগিল। আমি হাতে রাখিতে পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর খেতু বলিলেন,—'গদাধর! একটু খাইয়া দেখ না? ইহাতে কোনও দোষ নাই।' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, তোমাদের সব খাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। আমি ইংরেজি পড়ি নাই। সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন, সে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জাতি যায়।'

চৌধুরী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—'ধর্মাবতার! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। তারপর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অনেক সেকালের কথাবার্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।'

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'না না, কি কথা হইয়াছিল, তুমি সমুদয় বল। কোনও কথা গোপন করিবে না।'

গোবর্ধন শিরোমণিকে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—'শিরোমণি মহাশয়! সেই গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা গো!'

শিরোমণি বলিলেন,—'সে বাজে কথা। সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না।'

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'না না, খেতার সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা আমি অল্প অল্প শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কথা জানে। তবে খেতো তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।'

গদাধর বলিতেছে,—'তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! আমাদেব মাঠে সেকালে না কি মানুষ মারা হইত? আর তুমি না কি সেই কাজের একজন সর্দার ছিলে?' আমি উত্তর করিলাম,—'দাদাঠাকুর! উচক্কা বয়সে কোথায় কি করিয়াছি, কি না করিয়াছি, সে কথায় এখন আর কাজ কি? এখন তো আর সে সব নাই? এখন কোম্পানীর কড়া হুকুম।' খেতু বলিলেন,—'তা বটে; তবে সেকালের ঠেঙ্গাড়েদের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিজে হাতে এ সব করিয়াছ, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমরা দুই চারি জন যা বৃদ্ধ আছ, মরিয়া গেলে, আর এ সব কথা শুনিতে পাইব না। আর দেখ, গ্রামের সকলেই তো জানে যে, তুমি এ কাজের এক জন সর্দার ছিলে!' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আপনারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দার হইতে পারি? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা! সকল কাজের সর্দার আপনারা।' তাহার পর খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমাদের দলের সর্দার কে ছিলেন?' আমি বলিলাম,—'আজ্ঞা! আমাদের দলের সর্দার ছিলেন, কমল ভট্টাচার্য মহাশয়। একসঙ্গে কাজ করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমরা কমল কমল বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এক্ষণে মরিয়া গিয়াছেন।' খেতু তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! তোমরা কখনও ব্রাহ্মণ মারিয়াছ?' আমি বলিলাম,—'আজ্ঞা, মাঠের মাঝখানে যারে পাইতাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও দোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও মারিতে গেলে চলে না। প্রথমে মারিয়া ফেলিতে হইত। তাহার পর গলায় পৈতা থাকিলে জানিতে পারিতাম যে, সে লোকটি ব্রাহ্মণ, না থাকিলে বুঝিতাম যে, সে শূদ্র। আর প্রাপ্তির বিষয় যে দিন যেরূপ অদৃষ্টে থাকিত, সেই দিন সেইরূপ হইত। কত হতভাগা পথিককে মারিয়া শেষে একটি পয়সাও পাই নাই। ট্যাঁকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটি পয়সাও বাহির হয় নাই। সে বেটারা জুয়াচোর, দুষ্ট, বজ্জাত! পথ চলিবে বাপু, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়া চল। তা না শুধু হাতে! বেটাদের কি অন্যায় বলুন দেখি, দাদাঠাকুর? একটি মানুষ মারিতে কি কম পরিশ্রম হয়? খালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত।' খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ, গদাধর! মানুষের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় না?' আমি বলিলাম,—'সকলের প্রাণ সমান নয়। কেহ বা লাঠি খাইতে না খাইতে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও বা তিন চারিজনে পড়িয়া পঞ্চাশ লাঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একবার একজন ব্রাহ্মণকে মারিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।' খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছিল?'

এবার গোবর্ধন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বলিল,—'শিরোমণি মহাশয়! সেই কথা গো!'

শিরোমণি বলিলেন,—'চৌধুরী মহাশয়! আপনার আর ওসব পাপ কথা শুনিয়া কাজ নাই। এক্ষণে ক্ষেত্রচন্দ্রকে লইয়া কি করা যায়, আসুন, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান করিয়া অবশ্যই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!'

জনার্দন চৌধুরী আমাকে বলিলেন,—'না না। খেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়াছিল, আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছোঁড়া যে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্যই কোনও না কোনও দুরভিসন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।'

গদাধর পুনরায় বলিতেছে,— 'খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'ব্রাহ্মণ মারিতে কষ্ট হইয়াছিল কেন?' আমি বলিলাম,—'দাদাঠাকুর, কোথা হইতে একবার তিন জন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আসেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাসার অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতেছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা হইল। একটি পাতা হাতে করিয়া আমি তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি আনিতে যাইতেছিলাম। প্রত্যহ ব্রাহ্মণের পদধূলি না খাইয়া আমি কখনও জলগ্রহণ করি না। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমি সেই পাতায় তাঁহাদের পদধূলি লইলাম, আর বলিলাম,—'আসুন, আমার বাড়ীতে, আপনাদিগকে বাসা দিব।' তাঁহারা আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন দিন রহিলেন, অনেকগুলি কাপড় বেচিলেন, অনেক টাকা পাইলেন। আমি সেই সন্ধান কমলকে দিলাম। কমলেতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, 'তিনটীকে সাবাড় করিতে হইবে।' দলস্থ অন্য কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ, তাহা হইলে ভাগ দিতে হইবে। কমলকে বলিলাম,—'তুমি আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে লুকাইয়া থাক। অতি প্রত্যূষে ইঁহাদিগকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। দুই জনেই সেইখানে কার্য সমাধা করিব।' তাহার পরদিন প্রত্যূষে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইবার জন্য লইয়া চলিলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে, সে দিন ঘোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কমল বাহির হইয়া একজনের মাথায় লাঠি মারিলেন। আমিও সেই সময় আর একজনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা দুই জনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা সেই দুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটি পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন, আমিও আমার কাজটি সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া,—'ব্রহ্মহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন,'—এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন,— 'জীবন ক্ষণভঙ্গুর। পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু?' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া বাটীর বাহিরে দিয়া শিরোমণি মহাশয় ঝনাৎ করিয়া বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কমল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, আর রক্ষা নাই, কমল তাঁহাকে ধরধর হইয়াছেন, তখন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। কিছুক্ষণের নিমিত্ত দুই জনে ছটাছুঠি হইল। হাতীর মত কমলের শরীরে বল, কমলকে তিনি পারিবেন কেন? কমল তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভিকুণ্ডলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-দেবতার এমনি কঠিন প্রাণ যে, তিনি অজ্ঞানও হন না, মরেনও না। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—'হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর! হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর! বাপ সকল! ব্রহ্মহত্যা হয়! কে কোথা আছ? আসিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।' আমি পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। কোন্ দিকে ব্রাহ্মণ পলাইয়াছেন, আর কমল বা কোন দিকে গিয়াছেন, কোয়াসার জন্য তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন ব্রাহ্মণের চীৎকার শুনিয়া আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন, কমল তাঁহার বুকের উপরে; কমল আপনার দুই হাত দিয়া ব্রাহ্মণের দুটি হাত ধরিয়া মাটিতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, কমলের বাম পা মাটিতে রহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাহ্মণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঘোরতর বলের সহিত ব্রাহ্মণের নাভির ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন,—'এ বামুন বেটা কি বজ্জাৎ! বেটা যে মরে না হে! গদাধর! শীঘ্র একটা যা হয় কর। তা না হইলে বেটার চীৎকারে লোক আসিয়া পড়িবে।' আমার হাতে তখন লাঠি ছিল না, নিকটে এক খান পাথর পড়িয়া ছিল। সেই পাথরখানি লইয়া আমি ব্রাহ্মণের মাথাটি ছেঁচিয়া দিলাম। তবে ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল। যাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেকগুলি টাকা আর অনেক গরদের কাপড় আমরা পাইয়াছিলাম। কি করিয়া নশিরাম সর্দার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম,— 'এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন?' কথায় কথায় কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল; ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা ছিঁড়িয়া নশিরামকে শাপ দিলেন।

কমল, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ! শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে এক জোড়া ভাল গরদের কাপড় আমরা শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিলাম। যখন সেই গরদের কাপড়খানি পরিয়া, দোবজাটি কাঁধে ফেলিয়া, ফোঁটাটি কাটিয়া, শিরোমণি মহাশয় পথে যাইতেন, তখন সকলে বলিত,—'আহা! যেন কন্দর্প পুরুষ বাহির হইয়াছেন!' বয়সকালে শিরোমণি মহাশয়ের রূপ দেখে কে? না, শিরোমণি মহাশয়?'

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—'গদাধর! গদাধর! তোমার এরূপ বাক্য বলা উচিত নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই জানি না। পীড়া-শীড়ায় তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, আমি তোমার জন্য নারায়ণকে তুলসী দিব। তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।'

নিরঞ্জন এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—'হা মধুসূদন! হা দীনবন্ধু!'

জনার্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর কি হইল, গদাধর?'

গদাধর উত্তর করিল,—'তাহার পর আর কিছু হয় নাই। খেতু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অন্যমনস্কভাবে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একটু বরখ খাবে গদাধর?' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর। আমি বরখ খাইব না, বরখ খাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে'।'

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ যে, খেতু বরফ খাইয়াছে?'

গদাধর উত্তর করিল,—'আজ্ঞা হাঁ, ধর্মাবতার। আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি : আপনি ব্রাহ্মণ! আপনার পায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—বিকার

গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দন চৌধুরী তখন তনু রায় প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'আজ আমি ঘোর সর্বনাশের কথা শুনিলাম। জাতিকুল, ধর্মকর্ম, সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক গণ্ডুষ জল দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।'

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে, মহাশয়?'

জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—'শিবচন্দ্রের পুত্র ঐ যে খেতা, যে কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজী পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্ব-প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সর্বনাশ! বরফ খায়? যাঃ! এইবার ধর্ম কর্ম সব গেল।

সর্বের চেয়ে কিন্তু ভাবনা হইল ষাঁড়েশ্বরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি 'হায়, হায়!' করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব!

যাহা হউক, সর্ববাদি-সম্মত হইয়া খেতুকে 'একঘোরে' করা স্থির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথায় সায় দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন,—'আমি থাকিতে খেতুকে কেহ 'একঘোরে' করিতে পারিবে না। আমরা না হয় দু'ঘোরে হইয়া থাকিব।'

নিরঞ্জন আরও বলিলেন,—'চৌধুরী মহাশয়! আজ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে, ঘোর কলি উপস্থিত। নিদারুণ নরহত্যা ব্রহ্মহত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশয়! আপনি প্রাচীন,

বিজ্ঞ, লক্ষ্মীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না; লোককে জাতিচ্যুত করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, পতিতকে উদ্ধার করাই মানুষের কার্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকুল সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই ষাঁড়েশ্বরের মত সুরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মত্ত, এই তনু রায়ের মত যাহাদিগের অপত্য-বিক্রয়-জনিত শুল্ক গ্রহণে মানস কলুষিত, এই গোবর্ধনের মত যাহারা ব্রহ্মহত্যা-মহাপাতকে পতিত, সেই গলিত নরককীটেরা ধর্মের মর্ম কি জানিবে?'

এই বলিয়া নিরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জন চলিয়া যাইলে, গোবর্ধন শিরোমণি বলিলেন,—'ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। ষাঁড়েশ্বর বাবাজী বীর পুরুষ। ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে?'

খেতু যে একঘোরে হইয়াছেন,—নিয়মিতরূপে লোককে সেইটি দেখাইবার নিমিত্ত, স্ত্রীর মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জনার্দন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুসুমঘাটী নিবাসী শিবচন্দ্রের পুত্র, ক্ষেত্র, 'বরখ' খাইয়া কৃস্তান হইয়াছে।

সেই দিন রাত্রিতে ষাঁড়েশ্বর চারি বোতল মহুয়ার মদ আনিলেন; তারীফ শেখের বাড়ী হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইয়া আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিয়া পরম সুখে পান ভোজন হইল। একবার কেবল এই সুখে ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খাইতে খাইতে ষাঁড়েশ্বরের মনে উদয় হইল যে, তারীফ শেখ হয় তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে! তাই তিনি হাত তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন,—'আমার খাওয়া হইল না। বরফ-মিশ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটি হারাইব?' সকলে অনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রান্না হয় নাই। তবে তিনি পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পান ভোজনের পর নিরঞ্জনের বাটীতে সকলে গিয়া ঢিল ও গোহাড় ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে নিরঞ্জনের বাটীতে ঢিল ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নিরঞ্জন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈতৃক বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে চালিয়া গেলেন।

খেতু বলিলেন,—'কাকা মহাশয়! আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।'

খেতুর মার নিকট যে ঝি ছিল, সে ঝিটি ছাড়িয়া গেল। সে বলিল,—'মা ঠাকুরাণি! আমি আর তোমার কাছে কি করিয়া থাকি? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল খাইবে না।'

আরও নানা বিষয়ে খেতুর মা উৎপীড়িত হইলেন। খেতুর মা ঘাটে স্নান করিতে যাইলে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দূরে দূরে থাকেন; পাছে খেতুর মা তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া ফেলেন।

যে কমল ভট্টাচার্যের কথা গদাধর ঘোষ বলিয়াছিল, একদিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফুটিয়া খেতুর মাকে বলিলেন,—'বাছা! নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেহ আর কিছু বলে না! বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না। তোমার ছেলে বরখ খাইযাছে, তোমাদের এখন জাতিটি গিয়াছে। তা বলিয়া আমাদের সকলের জাতিটি মার কেন? আমাদের ধর্ম-কর্ম নাশ কর কেন? তা তোমার বাছা দেখিতেছি, এ ঘাটটি না হইলে আর চলে না। সেদিন মোটে কলসীটি যেই কাঁকে করিয়া উঠিয়াছি, আর তোমার গায়ের জলের ছিটা আমার গায়ে লাগিল, তিন পয়সার কলসীটি আমাকে ফেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইল। আমরা তোমার বাছা কি করিয়াছি? যে তুমি আমাদের সঙ্গে এত লাগিয়াছ?'

খেতুর মা কোন উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

খেতু বলিলেন,—'মা! কাঁদিও না। এখানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।'

খেতুর মা বলিলেন,—'বাছা! অভাগীরা যাহা কিছু বলে, তাহাতে আমি দুঃখ করি না। কিন্তু তোমার মুখপানে চাহিয়া রাত্রি দিন দিন আমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিদ্রা নাই; একদণ্ড তুমি সুস্থির নও! শরীর তোমার শীর্ণ, মুখ তোমার মলিন। খেতু! আমার মুখপানে চাহিয়া একটু সুস্থির হও, বাছা!'

খেতু বলিলেন,—'মা! আর সাত দিন! আজ মাসের হইল ১৭ তারিখ। ২৪শে তারিখে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন আশাটি আমার সমূলে নির্মূল হইবে। সেই দিন আমরা জন্মের মত এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব।'

খেতুর মা বলিলেন,—'দাসেদের মেয়ের কাছে শুনিলাম যে কঙ্কাবতীকে আর চেনা যায় না। সে রূপ নাই, সে রং নাই, সে হাসি নাই। আহা! তবুও বাছা মা'র দুঃখে কাতর। আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া, বাছা আমার মা'র দুঃখে দুঃখী। কঙ্কাবতীর মা রাত্রিদিন কাঁদিতেছেন, আর কঙ্কাবতী মাকে বুঝাইতেছেন।'

'শুনিলাম, সেদিন কঙ্কাবতী মাকে বলিয়াছে যে, 'মা, তুমি কাঁদিও না। আমার এই কয়খানা হাড় বেচিয়া বাবা যদি টাকা পান, তাতে দুঃখ কি, মা? এরূপ কত হাড় শ্মশানঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য কেহ একটি পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড় ক'খানার যদি এত মূল্য হয়, বাপ ভাই সেই টাকা পাইয়া যদি সুখী হন, তার জন্য আর আমরা দুঃখ কেন করি মা? তবে মা! আমি বড় দুর্বল হইয়াছি, শরীরে আমার সুখ নাই। পাছে এই কয়দিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাই, সেই ভয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা আমার উপর বড় রাগ করিবেন। আমি তো ছাই হইয়া যাইব, কিন্তু আমাকে তিনি যখনি মনে করিবেন, আর তখনি কত গালি দিবেন।'

খেতুর মা পুনরায় বলিলেন, — 'খেতু, কঙ্কাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা তোমাকে বলি না, পাছে তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়! কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।'

খেতু বলিলেন,—'মা। আমি তনু রায়কে বলিলাম যে, রায় মহাশয়! আপনাকে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটি সুপাত্রের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি ধনাঢ্য সুপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিব। কিন্তু মা! তনু রায় আমার কথা শুনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিব। কিন্তু কঙ্কাবতী যে এখানে চিরদুঃখিনী হইয়া রহিল সেই মা দুঃখ! আমি এমন কাপুরুষ, যে তাহার কোন উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা দুঃখ। আর মা, যদি কঙ্কাবতীর বিষয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে বলিও। আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিও না। আহা! সীতাকে এ সময়ে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলাম! সীতা যদি এখানে থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিনের সঠিক সংবাদ পাইতাম।'

খেতুর মা, তার পর দিন খেতুকে বলিলেন,—'আজ শুনিলাম, কঙ্কাবতীর বড় জ্বর হইয়াছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জ্বর হইবে, যে আর বিচিত্র কথা কি? বাছার এখন প্রাণরক্ষা হইলে হয়। জনার্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, চারিদিনের মধ্যে কঙ্কাবতীকে ভাল করিতে হইবে।'

খেতু বলিলেন,—'তাই তো মা! এখন কঙ্কাবতীর প্রাণটা রক্ষা হইলে হয়। মা! কঙ্কাবতীর বিড়াল আসিলে এ কয়দিন তাহাকে ভাল করিয়া দুধ-মাছ খাইতে দিবে। হাঁ মা! আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়ীতে আর আসিবে? না, বড়মানুষের বাড়ীতে গিয়া আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে?'

খেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তাহার পর দিন খেতুর মা জানিয়া আসিলেন যে, কঙ্কাবতীর জ্বর কিছুমাত্র কমে নাই। কঙ্কাবতী অজ্ঞান অভিভূত।

এইরূপে দিন দিন কঙ্কাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই কমিল না। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সে দিন কঙ্কাবতীর গায়ের বড় জ্বালা, কঙ্কাবতীর বড় পিপাসা। কঙ্কাবতী একেবারে শয্যাধরা। কঙ্কাবতীর সমূহ রোগ। কঙ্কাবতীর ঘোর বিকার। কঙ্কাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। কঙ্কাবতী লোক চিনিতে পারেন না, কঙ্কাবতী এখন যান্ তখন যান্।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ—নৌকা

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন:—

'যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেইখানে বসিয়া এক পেট জল খাই, আর গায়ে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।'

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছেন, এমন সময়ে কে বলিল,—'কেও, কঙ্কাবতী?'

কঙ্কাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দূরে কেবল একটি কাতলা মাছ ভাসিতেছে, আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেও, কঙ্কাবতী?'

কঙ্কাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—'হাঁ গো, আমি কঙ্কাবতী।'

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার কি বড় গায়ের জ্বালা, তোমার কি বড় পিপাসা?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'হাঁ গো, আমার বড় জ্বালা, আমার বড় পিপাসা।'

কে আবার বলিল,—'তবে তুমি এক কাজ কর না কেন? নদীর মাঝখানে চল না কেন? নদীর ভিতর অতি সুশীতল ঘর আছে, সেখানে যাইলে তোমার পিপাসাব শান্তি হইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'নদীর মাঝখান যে। অনেক দূর গা সেখানে আমি কি করিয়া যাইব?'

সে বলিল,—'কেন? ঐ যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে? ঐ নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না?'

জেলেদের একখানি নৌকার উপর গিয়া কঙ্কাবতী বসিলেন। এমন সময় বাটীতে কঙ্কাবতীর অনুসন্ধান হইল। 'কঙ্কাবতী কোথায় গেল,—কঙ্কাবতী কোথায় গেল?' এই বলিয়া একটা গোল পড়িল। কে বলিল,—'ও গো! তোমাদের কঙ্কাবতী ঐ ঘাটের দিকে গিয়াছে।'

কঙ্কাবতীর বাড়ীব সকলে মনে করিলেন যে, জনার্দন চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কঙ্কাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন। কঙ্কাবতীর ভগিনী বলিলেন,—

> 'কঙ্কাবতী বোন্ আমার, ঘরে ফিরে এস না?
> বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না?
> তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার।
> কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।।'

নৌকায় বসিয়া বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

> 'শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর।
> শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।
> সেই খানে যাই দিদি পূজি তোমাব পা।
> এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।'

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল। তখন, ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—

> 'কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।

রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার-কথা?
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

'কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি
জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি থুথু যা।'

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।
তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন,—

'কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না?
কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর ক'রো না।
ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

'বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে।
তুষের আগুনে সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকা খানি এই থুথু যা।'

এই বলিতে কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল। তখন বাপ আসিয়া বলিলেন,—

'কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হোতেছে ঘটা দেখ তুমি ঘরে গিয়া।
গহনা পরিবে কত, আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা, নাহিক তাহার সীমা।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

'টাকা কড়ি কাজ নাই বসন-ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
দারুণ যাতনা পিতা আর ত সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।'

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জলে

নৌকার সহিত কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল যে, 'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' রুই বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' পুঠী বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' সবাই বলে,—'কঙ্কাবতী আসিতেছেন।' পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীব-জন্তু সব যেখানে

দাঁড়াইয়াছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীর আদর করিল। সকলেই বলিল,—'এস এস, কঙ্কাবতী এস।'

মাছেদের ছেলেমেয়েরা বলিল,—'আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।'

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন,—'কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা কত পথ আসিতে হইয়াছে! বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এস মা তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।'

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটি সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। 'কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায়,'—সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন,—'এস ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।'

এই কথাটি সকলের মনোনীত হইল। চারিদিক জয়ধ্বনি উঠিল। জলের ভিতর পথে ঘাটে ঢ্যাটরা পড়িল যে, 'কঙ্কাবতী মাছেদের রাণী হইবেন।'

মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, —'ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়শী দিয়া আমাদিগকে কেহ গাঁথিলে, হাত দিয়া কঙ্কাবতী সূতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে, ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটি কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভয় থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, 'কঙ্কাবতী, তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।'

এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীর কাছে যাইল, আর সকলে বলিল,—'কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরে সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।'

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাতলানী মৎস্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমরা সভা তো করিলে, বক্তৃতা তো অনেক করিলে, বিধিমত কঙ্কাবতীকে 'ভোট' দিয়াছ?'

মাছেরা উত্তর করিল,—'না, কৈ কঙ্কাবতীকে বিধিমত ভোট দেওয়া হয় নাই। সেটী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।'

কাতলানী বলিলেন,—'তবে? ভোট না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে কেন?'

তখন মাছেরা সব বলিল,—'ওহো! বুঝেছি বুঝেছি! ভোট না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। এস আমরা সকলে কঙ্কাবতীকে ভোট দিই।'

এই বলিয়া যত মাছ কঙ্কাবতীকে ভোট দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা ভোটের হাঁড়িটী কঙ্কাবতীর সম্মুখে লইয়া গেল। হাঁড়ির মুখে যে ন্যাকড়াখানি বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া বলিল,—'দেখ দেখ, কঙ্কাবতী! কত ভোট পাইয়াছ! এখন আর বলিতে পারিবে না যে তোমাদের রাণী হব না।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'না গো না! ভোটের জন্য নয়। আমি এখন তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার যা হইয়াছে, তা আমিই জানি।'

তখন কাতলানী পুনরায় বলিলেন,—'তোমরা রাজপোষাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজপোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রাণী হইবে কেন?'

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল,—'ও হো! বুঝেছি বুঝেছি! রাজপোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেমের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'না গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আর আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।'

তখন কাতলানী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'তোমরা রাজার ঠিক করিয়াছ? রাজা না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী কি করিয়া হয়? তাই একেলা বসিয়া কঙ্কাবতীর কাঁদিতে সাধ হইয়াছে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'তা নয় গো, তা নয়! আমার রাজায় কাজ নাই। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে তোমাদের এই জলের ভিতর আসিয়াছি।'

কাতলানী তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'রাজা চাই না বটে? আর যদি খেতুকে রাজা করি?'

চমকিত হইয়া কঙ্কাবতী কাতলানীর মুখ পানে চাহিলেন। তিনি ভাবিলেন— 'এই নদীর মাঝখানে, এত গভীর জলের ভিতরেও এ সংবাদটী আসিয়াছে!'

কাতলানী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, আর বলিলেন,—'তোমরা মনে কর, মাছেরা কিছু জানে না, মাছেদের কেবল ধরিয়া খাইতে হয়। শুধু তা নয়, কঙ্কাবতী! শুধু তা নয়। আমরাও কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি। ঘাটে যখন চরিতে যাই, যখন তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে কথা হয়, তখন আমরাও এক আধটা কথা কান পাতিয়া শুনি। যাও মা! এখন উঠ, গিয়া পোষাক পর, রাণী হও, কাঁদিও না।'

বৃদ্ধা কাতলা মাছের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কঙ্কাবতীর মন অনেকটা সুস্থ হইল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভাল! না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি?'

মাছেরা উত্তর করিল,—'করিতে হইবে কি? কেন? দরজীর বাড়ী যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে।'

সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন,—'কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষু দুটী যখন আপনি পিট্‌পিট্ করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,— 'অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহ্লাদ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদেরই অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোষাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।'

কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট্-ফাট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—রাজবেশ

কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জলপথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দূর স্থলপথে যাইলেন। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজী চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। দূর পাহাড় পানে চাহিয়া

দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—'ও কারা আসে?' নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজী বলিলেন,—'কে ও কাঁকড়া ভায়া?'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছ তো?'

দরজী বলিলেন,—'আর ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়। তোমরা সৌখীন পুরুষ, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি?'

কাঁকড়া উত্তর করিলেন,—'এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।'

দরজী বলিলেন,— 'বটে! তা আমার নিকট উত্তম উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টক্‌-টকে লাল খেরো, রং উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগাগোড়া আমি বখেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী কঙ্কাবতী যদি শিমূল তূলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কঙ্কাবতী শিমূল তূলা কি না?'

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—'কৈ না! সেরূপ নরম তো নয়!'

দরজী বলিলেন,—'তাই তো! আচ্ছা ফুঁ দিয়া দেখ দেখি?'

কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গায়ে ফুঁ দিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন,—'কৈ না! উড়িয়া তো গেল না?'

দরজী বলিলেন,—'তাই তো! আচ্ছা! দেখ দেখি, যদি ছোবড়া হয়? ছোবড়া হইলেও কাজ চলিবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'খেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি? এই, সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?'

দরজী উত্তর করিলেন,—'ঈশ্‌! মেয়ের যে আম্বা ভারি! বালিশ হ'বে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি?'

দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ হইল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন,—'তুমি ছেলেমানুষ! আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর; কাঁদিতে নাই।'

এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাড়া দিয়া কঙ্কাবতীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর কান্না থামিলে, পুনরায় কাঁকড়া মহাশয় ভাল করিয়া কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন ও দেখিয়া দরজীকে বলিলেন,—'না! এ ছোবড়াও নয়।'

বুড়ো দরজী বলিলেন,—'তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না, সেলাই করিতেও জানি না। যদি তুমি শিমূল তূলা হইতে, অভাবপক্ষে ছোবড়াও হইতে তাহা হইলে কেমন জামা পরাইয়া দিতাম। তা তোমার কপালে নাই, আমি কি করিব?'

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?'

বুড়ো দরজী বলিলেন,—'তুমি এক কাজ কর, তুমি খলীফা সাহেবের কাছে যাও। খলীফা সাহেব ভাল কারিগর; খলীফা সাহেবের মত কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।'

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটি ছোট, তাতে আবার অত ঠাট্টা কিসের?'

বুড়ো দরজী উত্তর করিলেন,—'না না! তা কি কখনও হয়? তোমাকে আমি কি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটি মন্দ কি? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়।'

বুড়ো দরজীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—'তা বটে! তা বটে! আমার নাকটি ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে, দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে, আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, 'আহা! কাঁকড়ার কি নাক! যেন বাঁশীর মত।' আর যারা ছড়া বাঁধে, তারা লিখিত,—'তিল ফুল জিনি নাসা!' 'কিম্বা শুকচঞ্চু মত নাসা!' যা বল, যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ব্যাপারখানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বদ্ধ পাগল। এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত।' মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া অবশেষে খলীফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। খলীফা তখন অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—'খলীফা সাহেব! খলীফা সাহেব!'

ভিতর হইতে খলীফা উত্তর দিলেন,—'কে হে! কে ডাকাডাকি করে?'

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—'আমি কাঁকড়াচন্দ্র! একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কাজ আছে।'

খলীফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

খলীফা বলিলেন,—'আসুন, আসুন, কাঁকড়াবাবুর আসুন! আর এই যে কচ্ছপবাবুকেও দেখিতেছি! কচ্ছপ বাবু! আপনি ঐ টুলটিতে বসুন, আর কাঁকড়া বাবু! আপনি ঐ চেয়ারখানি নিন্! এ মেয়েটিকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটি! কাঁকড়া বাবু! এ কন্যাটি কি আপনার?'

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন,—'না, এ কন্যাটি আমার নয়, আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্যই এখানে আসিয়াছি। ওঁরে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজপরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্য অতি উত্তম রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।'

খলীফা উত্তর করিলেন,—'রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সাটিন আছে, মায় বারাণসী কিংখাব পর্যন্ত আছে। কিন্তু রাজপোষাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে, মতি বসাইতে হইবে, জরি লেস্ প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?'

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—'আমাদের টাকার অভাব কি? যত নৌকা-জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন?'

খলীফা উত্তর করিলেন,—'যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজপোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।'

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুটি তোড়া মোহর খলীফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলীফা অনেক রাজার পোষাক, অনেক বাবুর পোষাক, অনেক বরের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই।

মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—'ও গো! তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও না গা? আমি বাড়ী লইয়া যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।'

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন,—'তুমি তো বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি! একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।'

কি করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলীফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,—'টাকাগুলি বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এইক্ষণেই তোমাদের রাণীর রাজবস্ত্র করিয়া দিব।'

বাটীর ভিতর খলীফা দুই তোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাতি বাহির করিয়া এক গাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক্! কি আশ্চর্য! 'আজ সকাল বেলা আমরা কার মুখ দেখিয়া উঠিয়া ছিলাম?' খলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলীফানী বলিলেন,—'এবার কিন্তু আমাকে ডায়মনকাটা তবীজ গড়াইতে দিতে হইবে।'

তাহার পর খলীফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন,—'ইনি রাণী। এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্য রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইঁহার গায়ের মাপ লও।'

খলীফানী কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলীফা রাজবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলীফা-রমণী যত্নে সেই পোষাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলীফা-রমণী বলিলেন,—'আহা! মরি কি রূপ!'

খলীফা বলিলেন,—'মরি, কি রূপ!'

সকলেই বলিলেন,— 'মরি কি রূপ!'

রাজপরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে, কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ, মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া, সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী হেন রাণী পাইলাম।'

এক্ষণে এটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায়? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী! যেরূপ জগৎসুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরূপ সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত, মনোমোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রাণী কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মতিমহলই উপযুক্ত স্থান। যাহাকে মতি বলে, তাহাকেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে 'মতিমহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ যোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—'রাণী ধিরাণী মহারাণী! মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করুন।'

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া, ঝিনুকের নাম মতিমহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রাণীগিরি করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—গোয়ালিনী

এইরূপে কিছুদিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিল। স্নান করিতে করিতে তাহার পায়ে সেই ঝিনুকটি ঠেকিল; ডুব দিয়া সে সেই ঝিনুকটি তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার ঝিনুক! ঝিনুকটি সে বাড়ী লইয়া গেল; আর আপনার চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাহিরের দ্বারে কুলুপ দিয়া গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী দুধ দিতে যায়। কঙ্কাবতী সেই সময় ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হন। প্রথম দিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যেমন তিনি মাটিতে পা দিলেন, আর তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্ববৎ বেশ হইল। কঙ্কাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলেন। প্রতিদিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কঙ্কাবতী, গোয়ালিনীর সমুদয় কাজকর্ম সারিয়া রাখেন; ঘর-দ্বার পরিষ্কার করেন, বাসন-কোষণ মাজেন, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধেন, আপনি খান আর গোয়ালিনীর জন্য ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ালিনী বড়ই আশ্চর্য হয়। গোয়ালিনী মনে করে,— 'এমন করিয়া আমার সমুদয় কাজকর্ম কে করে? দ্বারে যেরূপ চাবি দিয়া যাই, সেইরূপ চাবি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ীর ভেতর কেহ আসে নাই। তবে এ সব কাজকর্ম করে কে?'

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,— 'আমাকে ধরিতে হইবে; প্রতিদিন যে আমার কাজকর্ম সারিয়া রাখে, তারে ধরিতে হইবে!'

এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোয়ালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে দ্বারটি খুলিয়া দেখে যে, বাটীর ভিতর এক পরমা সুন্দরী বালিকা বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী যেই ঝিনুকের ভিতর লুকাইতে গেলেন, আর সে গিয়া তৎক্ষনাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া। ধরিয়া দেখে না, কঙ্কাবতী।

আশ্চর্য হইয়া গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল,—'কঙ্কাবতী! তুমি এখানে? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? তুমি না নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'হাঁ মাসি! আমি কঙ্কাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ ঝিনুকটির ভিতর ছিলাম। ঝিনুকটি আনিয়া তুমি চালের বাতায় রাখিয়াছ; তাই মাসি! আমি তোমার বাড়ী আসিয়াছি।'

গোয়ালিনী এখন সকল কথা বুঝিল। আশ্চর্য হইবার আর কোনও কারণ রহিল না।

কঙ্কাবতী পুনরায় বলিলেন,—'মাসি! আমি যে এখানে আছি, সে কথা এখন তুমি আমার বাড়ীতে বলিও না। শুধু হাতে বাড়ী যাইলে বাবা হয়ত বকিবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজীকে দিল, কিন্তু আমাকে দিল না। আমি কত কাঁদিলাম, তবুও তাহারা আমাকেদিল না। দেখি, যদি তাহারা আমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে বাবাকে নিয়া দিব, বাবা তাহা হইলে বকিবেন না, দাদা গালি দিবেন না।'

গোয়ালিনী বলিল,—'বাছা রে আমার! জনার্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে চায়! পোড়ার মুখো বাপ রও, এইবার দেখা হইলে হয়! গালি দিয়া ভূত ছাড়াইব!'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'না মাসি, বাবাকে গালি দিও না। জান তো, মাসি? বাবা দুঃখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?'

এইরূপ কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, কঙ্কাবতী এখন কিছুদিন গোয়ালিনীর ঘরে থাকিবেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মাসি! প্রতিদিন তুমি পাড়ায় যাও। গ্রামে যে দিন যে ঘটনা হয়, আমাকে আসিয়া বলিও।'

গোয়ালিনীর ঘরে কঙ্কাবতী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামে যে দিন যেখানে যাহা হয়, গোয়ালিনী আসিয়া তাঁহাকে বলে।

এক দিন গোয়ালিনী আসিয়া বলিল,—'আহা! খেতুর মা'র বড় অসুখ! খেতুর মা এবার বাঁচেন কি না!'

অতি কাতরভাবে, কাঁদকাঁদ হইয়া, কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে, মাসি? তাঁর কি হইয়াছে?'

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—'শুনিলাম, তাঁহার জ্বর-বিকার হইয়াছে। খেতু বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্য আসেন নাই। বৈদ্য বলিয়াছেন,—'তোমার বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া, শেষে জাতিটি হারাইব না কি?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মাসি! তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। আমার আপনার মা যেরূপ, তিনিও আমার সেইরূপ। তাঁর অসময়ে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, সে জন্য বড় দুঃখ মনে রহিল।'

এই বলিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যুষে কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মাসি! আজ একটু সকাল সকাল তুমি পাড়ায় যাও। শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বল, তিনি কেমন আছেন।'

গোয়ালিনী সকাল সকাল পাড়ায় যাইল, সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া, কঙ্কাবতীকে বলিল,—'আহা! বড় দুঃখের কথা! খেতুর মা নাই! খেতুর মা মারা গিয়াছেন। মাকে ঘাটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, খেতু দ্বার দ্বার ঘুরিতেছেন, কিন্তু কেহই আসিতেছে না। সকলেই বলিতেছে,—'তুমি বরখ খাইয়াছ তোমার জাতি গিয়াছে: তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে।' যাঁড়েশ্বর চক্রবর্তী, গোবর্ধন শিরোমণি, আর কঙ্কাবতী! তোমার বাপ এই তিনজনে সকলকে মানা করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কেহ না যায়।'

এই সংবাদ শুনিয়া কঙ্কাবতী একেবারে শুইয়া পড়িলেন। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী তাঁহাকে কত বুঝাইল। গোয়ালিনী কত বলিল,—'কঙ্কাবতী! চুপ কর। কঙ্কাবতী! উঠ, খাও।' কঙ্কাবতী উঠিলেন না, সে দিন রাঁধিলেন না, খাইলেন না। মাটিতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মাসি! তুমি আর একবার পাড়ায় যাও। দেখ গিয়া সেখানে কি হইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বল।'

গোয়ালিনী পুনরায় পাড়ায় যাইল। একটু রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। একপ্রহর রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। মাটিতে শুইয়া, পথ পানে চাহিয়া, কঙ্কাবতী কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এক প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল।

গোয়ালিনী বলিল,—'কঙ্কাবতী! বড়ই দুঃখের কথা শুনিয়া আসিলাম। খেতুর মাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কেহই আসেন নাই। খেতু করেন কি? সন্ধ্যা হইলে কাঠ আপনি মাথায় করিয়া প্রথমে ঘাটে রাখিয়া আসিলেন। আহা! একেবারে অতগুলি কাঠ লইয়া যাইতে পারিবেন কেন? তিনবার কাঠ লইয়া তাঁকে ঘাটে যাইতে হইয়াছে। এখন তিনি মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া যাইতেছেন। মরিলে লোক ভারি হয়। তাতে শ্মশান ঘাট তো আর কম দূর নয়! খানিক দূর লইয়া যান, তার পর আর পারেন না! মাকে মাটিতে শয়ন করান, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান। এইরূপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। একটু দূরে দূরে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া আসিলাম।'

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কঙ্কাবতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটির দ্বারটি খুলিলেন, বাটীর বাহিরে যাইয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িলেন।

গোয়ালিনী বলিল,—'কঙ্কাবতী, কোথায় যাও? কঙ্কাবতী, কোথায় যাও?'

আর কোথায় যাও! আজ কঙ্কাবতী রাণী ধিরাণী, মহারাণী নন—আজ কঙ্কাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আজ কঙ্কাবতী সুসজ্জিতা নন, আজ কঙ্কাবতী গোয়ালিনীর একখানি সামান্য মলিন বসনপরিধৃতা। কঙ্কাবতীর মুখ আজ উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন নয়—আজ কঙ্কাবতীর মুখ ঘনঘটায় আচ্ছাদিত।

বাটীর বাহির হইয়া, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী সেই শ্মশানের দিকে ছুটিলেন।

'কঙ্কাবতী শুন, কঙ্কাবতী শুন।' এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দ্দুর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী অবিলম্বেই নিশার তমোরাশিতে মিশিয়া যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম—শ্মশান

দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া, পাগলিনী এখন শ্মশানের দিকে দৌড়িলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাখিয়াছেন, মা'র মস্তকটি আপনার কোলে লইয়াছেন; মা'র কাছে বসিয়া মা'র মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরল ধারায় অশ্রুবারি তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কঙ্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেইজন্য খেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মা'র মুখপানে চাহিয়া খেতু বলিলেন,—'মা! তুমিও চলিলে? যখন কঙ্কাবতী গেল, তখন মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন আর রাখিব না। কেবল, মা, তোমার মুখ পানে চাহিয়া বাঁচিয়াছিলাম। এখন, মা তুমিও গেলে? তবে আর আমার এ প্রাণে কাজ কি? কিসের জন্য, কার জন্য আর বাঁচিয়া থাকিব? এ সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় দুঃখ। বেশ করিয়াছ, কঙ্কাবতী, এখান হইতে গিয়াছ! বেশ করিলে, মা! যে, এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল, মা! যেখানে কঙ্কাবতী, যেখানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শ্মশান-ভূমি হইল। এ সংসারে আর আমার কেহ নাই। চল, মা, শীঘ্রই তোমাদিগের নিকট গিয়া প্রাণের এ দারুণ জ্বালা জুড়াইব। মা! কঙ্কাবতীকে বলিও, শীঘ্রই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলিব।'

কঙ্কাবতী আসিয়া অধোমুখে খেতুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু চমকিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতী মা'র পায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। মা'র পা দুখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পায়ের উপর আপনার মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, খেতু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, সর্বদা সকলের ইষ্ট চিন্তাই করিয়াছি। জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, প্রবঞ্চনা কখনও করি নাই, কোনওরূপ দুষ্কর্ম কখনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জন্য আজ আমার এ ভীষণ দণ্ড, আজ এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা সহিয়াছি। গ্রামের লোকে বিধিমত উৎপীড়ন করিল, তাহাও সহিলাম; প্রাণের পুতলি তুমি কঙ্কাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে, তাহাও সহিলাম; প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলেন, তাহাও সহিলাম; এই সঙ্কটের সময় তুমি যে আমার শত্রুতা সাধিবে, স্বপ্নেও তাহা কখনও ভাবি নাই! মাতার মৃতদেহ একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার জন্য আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আজ তিন দিন এক বিন্দু জল পর্যন্ত আমি খাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি পা-ও আমি মাকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না। কি করিব, ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভূত হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে! দুঃখের এইবার আমার চারি পো হইল! এ দুঃখ আমি আর সহিতে পারি না।'

কাঁদ কাঁদ স্বরে অধোমুখে, কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।'

আশ্চর্য হইয়া খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি জীবিত আছ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমায় আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম, আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেখিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন। মা'র মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। কঙ্কাবতী, তুমি কি করিয়া বাঁচিলে?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাসীর বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে শুনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম না, আমি ছুটিয়া আসিলাম। এক্ষণে চল, মাতাকে ঘাটে লইয়া যাই। তুমি একদিক্ ধর, আমি একদিক্ ধরি।'

এই প্রকারে কঙ্কাবতী ও খেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন। সেখান গিয়া দুই জনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন। নূতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া দুইজনে মায়ের পা ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

খেতু বলিলেন,—'মা! তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার এই পুত্রকে আশীর্বাদ কর, ধর্মপথ হইতে যেন কখনও বিচলিত না হই। সত্য যেন আমার ধ্যান, সত্য যেন আমার জ্ঞান, সত্য যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধনলালসায়, কি সুখ-লালসায়, কি যশোলালসায় যেন সত্যপথ, ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ না করি। অজ্ঞান কপটাচারী জনসমাজের ভ্রুকুটি-ভঙ্গিমায় ভীরু নরাধমদিগের মত কম্পিত হইয়া, যেন কর্তব্যে কখনও পরাঙ্মুখ না হই। হে মা! প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কখনও কাপুরুষ না হই।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মা! তুমি স্বর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী কঙ্কাবতীর প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর। জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, মা যেন ধর্মে আমার মতি হয়, যেন ধর্ম আমার গতি হয়। অধিক আর, মা, তোমাকে কি বলিব! কঙ্কাবতীর মনের কথা তুমি সকলি জান। কঙ্কাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, কঙ্কাবতীর ধর্মরক্ষা হইবে। যদি এ-দিকের সূর্য ও-দিকে উদয় হন, যদি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তবুও কঙ্কাবতী যদি সতী হয়, কঙ্কাবতীকে কেহ ধর্মচ্যুত করিতে পারিবে না। মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পা ছুঁইয়া মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! তোমার কঙ্কাবতী এখন পাগলিনী, তোমার কঙ্কাবতীর অপরাধ ক্ষমা কর।'

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! কি করিয়া চিতায় আগুন দিই? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কঙ্কাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মা'র মুখখানি দেখিয়া লই!'

মুখের নিকট দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খেতু মা'র চুলগুলি নাড়িতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—'দেখ কঙ্কাবতী! কি স্থির শান্তিময়ী মুখশ্রী! মা যেন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে, কঙ্কাবতী! ছেলেবেলা যখন তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতে? প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় যখন তুমি পড়িতে পারিতে না? আমি তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিতেন। মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সেইরূপ তোমাকেও ভালবাসিতেন। আহা! কঙ্কাবতী! কি মা আমরা হারাইলাম!'

এই প্রকারে নানারূপ খেদ করিয়া, অবশেষে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, খেতু অগ্নিকার্য করিলেন। চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী ও খেতু নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে খেদ করেন, আর মাঝে মাঝে অন্যান্য কথাবার্তা কন। কি করিয়া জল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কঙ্কাবতী সেই সমুদয় কথা খেতুকে বলিলেন। খেতু মনে করিলেন, নানা দুঃখে কঙ্কাবতীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। দুঃখের উপর দুঃখ, এ আবার এক নূতন দুঃখ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা খেতু কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সৎকার হইয়া যাইলে, দুই জনে নদীতে স্নান করিলেন।

তাহার পর খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'পুনরায় আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব? বাবা, আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন! আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয়, গোয়ালিনী মাসীর ঘরে যাই।'

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! সে কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। যতই কেন দুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগরবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সামান্য দুইখানি তবণীর ন্যায়, আমরা দুই জনে এই

সংসার কর্তৃক তাড়িত হইতেছি। তাই কঙ্কাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে হইবে, বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে। মাতার পদযুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে যেরূপ ধীর জ্ঞান-গম্ভীর বাক্য তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সেইরূপ কথা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকুক, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে, ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় কৃষক কেন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে? উদাম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসারক্ষেত্রে কর্ম বীজ কেন রোপণ করিবে? মনুষ্যের অজ্ঞানবশতঃ ভাবী ঘটনার উপর কর্তৃত্বের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফল প্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভরসা। সেই আশা ভরসাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। তুমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাখিয়াছ বলিয়া, জনার্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্বর অন্য পাত্র সংঘটন হওয়াও সম্ভব নয়। তোমার পিতা ভ্রাতা যাহা কিছু তোমার লাঞ্ছনা করেন, এক বৎসর কাল পর্যন্ত সহ্য করিয়া থাক। শুনিয়াছি, পশ্চিম অঞ্চলে অধিক বেতনে কর্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিমে চলিলাম; কাশীতে মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া কর্মের অনুসন্ধান করিব। এক বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করিতে পারি, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তখন তোমার পিতা আহ্লাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন। কেবল এক বৎসর, কঙ্কাবতী, দেখিতে দেখিতে যাইবে। দুঃখে হউক, সুখে হউক ঘরে থাকিয়া কোনও রূপে এই এক বৎসর কাল অতিবাহিত কর।'

তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে আমি সেইরূপ করিব।'

দুই জনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সময় দুই জনে তনু রায়ের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তবে এখন আমি যাই! সাবধানে থাকিবে।'

'যাই যাই' করিয়াও খেতু যাইতে পারেন না। যাইতে খেতুর পা সরে না। দুইজনের চক্ষুর জলে তনু রায়ের দ্বার ভিজিয়া গেল।

একবার সাহসে ভর করিয়া খেতু কিছুদূর যাইলেন, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, 'কঙ্কাবতী! একটি কথা তোমাকে ভাল করিয়া বলিতে ভুলিতে গিয়াছি; কথাটি এই যে, অতি সাবধানে থাকিও।'

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই জনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারিদিকে লোকের সাড়া শব্দ হইতে লাগিল।

তখন খেতু বলিলেন,— 'কঙ্কাবতী! এইবার আমি নিশ্চয় যাই। অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তো একবৎসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তখন আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে! তোমার মাকে সকল কথা বলিও, অন্য কাহাকেও কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।'

খেতু এইবার চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখা যাইল, ততদূর কঙ্কাবতী সেই দিক্ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর, চক্ষুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইবার ভয়ে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। খেতু ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কঙ্কাবতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পর আর দেখিতে পাইলেন না।

খেতু ভাবিলেন, 'হা জগদীশ্বর! মনুষ্য-হৃদয় তুমি কি পাষাণ দিয়াই নির্মাণ করিয়াছ! যে, ঐ প্রভাহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রতিমাকে ওখানে ছাড়িয়া, এখানে আমার হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নাই।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বাঘ

খেতু চলিয়া যাইলে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দ্বার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে, সাহসে বুক বাঁধিয়া, আস্তে আস্তে তিনি দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া, বাটীর ভিতর বসিয়া, তনু রায় তামাক খাইতেছিলেন। কে দ্বার ঠেলিতেছে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন কঙ্কাবতী!

কঙ্কাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—'এ কি? কঙ্কাবতী যে! তুমি মর নাই? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে! এতদিন কোথায় ছিলে? আজ কোথা হইতে আসিলে? এতদিন যেখানে ছিলে, পুনরায় সেইখানে যাও। আমার ঘরে তোমার আর স্থান হইবে না।'

কঙ্কাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেই মলিন আর্দ্রবস্ত্রপরিহিতা থাকিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জন-গর্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সত্বর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন,—'এই যে, পাপীয়সী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এসেছেন! যাবেন আর কোন্ চুলো! কিন্তু তা হবে না—এ বাড়ী হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও না যে জনার্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ করিবে। বাবা! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাঙ্গারী পাপীয়সীকে দূর করিয়া দাও।'

বচসা শুনিয়া কঙ্কাবতীর দুই ভগিনী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন, দুঃখিনী কঙ্কাবতী দীন দরিদ্র মলিন বেশে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র তাঁহাকে বিধিমতে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন

কঙ্কাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কঙ্কাবতীর বক্ষঃস্থল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া গদগদ মৃদু-ভাষে বলিলেন,—'এস, আমার মা এস! দুঃখিনী মা'কে ভুলিয়া এতদিন কোথা ছিলে, মা?'

মা'র বুকে মাথা রাখিয়া কঙ্কাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে যে খরতর অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, সে অগ্নি এখন অনেকটা নির্বাণ হইল।

তাহার পর, মা কঙ্কাবতীর একটি হাত ধরিলেন। অপর হাত দিয়া আর একটি মেয়ের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তখন সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'তোমরা কঙ্কাবতীকে দূর করিয়া দিবে? কঙ্কাবতীকে ঘরে স্থান দিবে না? বটে! এ দুধের বাছা কি হেন দুষ্কর্ম করিয়াছে যে, মা বাপের কাছে ইহার স্থান হইবে না? মান-সম্ভ্রম, পুণ্য-ধর্ম লইয়া তোমরা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে বিদায় হই। এস, মা, আমরা সকলে এখান হইতে যাই। দ্বারে দ্বারে আমরা মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু এই মুনি-ঋষিদের অন্ন আর খাইব না।'

তিন কন্যা ও মাতা, সত্য সত্যই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন তনু রায়ের মনে ভয় হইল।

তনু রায় বলিলেন,—'গৃহিণী! কর কি! তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি! এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হইবে? সেই জন্য বলি, ওর যেখানে দুই চক্ষু যায়, সেইখানে ও যাক্, ওর কথায় আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।'

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—'কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে না? আচ্ছা সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নয়? তোমার চিন্তা যে, জনার্দন চৌধুরীর টাকাগুলি হাতছাড়া হইল। যাহা হউক, তোমার গলগ্রহ হইয়া আর আমরা থাকিব না। যেখানে আমাদের দু'চক্ষু যায়, আমরা চারিজনে সেইখানে যাইব। মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করিব।'

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন,—'ঘোর বিপদ!' নানারূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে, শেষে তনু রায় বলিলেন,—'দেখ! পাগলের মত কথা বলিও না। যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। যাও, মা, কঙ্কাবতী বাড়ীর ভিতরে যাও।'

মা, কঙ্কাবতী ও ভগিনী দুইটি বাটীর ভিতর যাইলেন। কঙ্কাবতী পুনরায় বাপ মা'র নিকট রহিলেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা কঙ্কাবতী মাকে বলিলেন,—কঙ্কাবতী নিজে, কি কঙ্কাবতীর মা, এ সমুদয় কথা অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কঙ্কাবতীকে তনু রায় সর্বদাই ভর্ৎসনা করেন, সর্বদাই গঞ্জনা দেন। কঙ্কাবতী সে কথায় কোনও উত্তর করেন না, অধোবদনে চুপ করিয়া শুনেন।

তনু রায় বলেন,—'এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই, তা আমি কি করিব? জনার্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ কন্যা লইয়া আমি করি কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।'

স্ত্রী-পুরুষে, মাঝে মাঝে এই কথা লইয়া বিবাদ হয়। স্ত্রী বলেন,—'কঙ্কাবতীর বিবাহের জন্য তোমার কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাক। কঙ্কাবতীর বিবাহ আমি নিজে দিব। যদি আমার কথা না শুন, যদি অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।'

তনু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, খেতুর কোনও সংবাদ নাই, কঙ্কাবতীর মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, কঙ্কাবতীর মা'র মনে ঘোর চিন্তার উদয় হইল; কঙ্কাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে এখন আর তিনি পূর্বের মত দম্ভের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বৎসর শেষ হইয়া যতই দিন গত হইতে লাগিল, তনু রায়ের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধ্যার পর তনু রায় বলিলেন,—'এত বড় মেয়ে হইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল।'

কঙ্কাবতীর মা উত্তর করিলেন,—'আজ এক বৎসর অপেক্ষা করিলে, আর অল্পদিন অপেক্ষা কর। সুপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।'

তনু রায় বলিলেন,—'এক বৎসর ধরিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ। কোথা হইতে তোমার সুপাত্র আসিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম। সে দিন যদি কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিতেছি, সেকালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে; মনুষ্য না হয়, জীবজন্তুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এই মুহূর্তে বনের বাঘ আসিয়া কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তো আমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই। যদি এই মুহূর্তে বাঘ আসিয়া বলে, —'রায় মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিন', তো আমি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিই।'

এই কথা বলিতে না বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জনের শব্দ হইল। গর্জন করিয়া কে বলিল,—'রায় মহাশয়। তবে কি দ্বার খুলিয়া দিবেন গা?' সেই শব্দ শুনিয়া তনু রায় ভয় পাইলেন! কিসে এরূপ গর্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন না, সর্বনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাহিরে দণ্ডায়মান!

ব্যাঘ্র বলিলেন,—'রায় মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন, যে, ব্যাঘ্র আসিয়া যদি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের সহিত আপনি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন; না দিলে এই মুহূর্তে আপনাকে খাইয়া ফেলিব।'

তনু রায় অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য, ভয়ে একপ্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তবুও আপনার ব্যবসায়টি বিস্মরণ হইতে পারেন নাই।

তনু রায় বলিলেন,—'যখন কথা দিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড়চড় নাই। মুখ হইতে একবার কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কখনও অন্যথা করি না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।'

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম রক্ষা হয়?'

তনু রায় বলিলেন,—'আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরূপ ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হইবে।'

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—'তা বিলক্ষণ জানি! এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন, তা বলুন।'

তনু রায় বলিলেন,—'এ গ্রামের জমিদার, মান্যবর শ্রীযুক্ত জনার্দন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল; দৈব ঘটনাবশতঃ কার্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ দুইসহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন; সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।'

ব্যাঘ্র বলিলেন,—'বাটীর ভিতর চলুন! আপনাকে আমি এত টাকা দিব যে, আপনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্বপনে কখনও ভাবেন নাই।'

এই কথা বলিয়া তর্জন গর্জন করিতে করিতে, ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তনু রায়ের মনে তখন বড় ভয় হইল। তনু রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারে খাইয়া ফেলে। নিরুপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর যাইলেন।

বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিয়া এতক্ষণ কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতীর মাতা ও ভগিনীগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তনু রায়ের পুত্র তখন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিষ্ট পুত্র—তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী ফিরিয়া আসেন না।

যেখানে কঙ্কাবতী প্রভৃতি বসিয়াছিলেন, ব্যাঘ্র গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সকলের সম্মুখে তিনি একটি বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,— 'খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে!'

তনু রায় তোড়াটি খুলিলেন; দেখিলেন, তাহার ভিতর কেবল মোহর! হাতে করিয়া, চশমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মেকি মোহর নয়, প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা! সকলেই আশ্চর্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল? তনু রায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তনু রায় ভাবিলেন,—'এত দিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।'

প্রদীপের কাছে লইয়া তনু রায় মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।

এই অবসরে, ব্যাঘ্র ধীরে ধীরে কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতার নিকট গিয়া বলিলেন,—'কোনও ভয় নাই।'

কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার সে কণ্ঠস্বর, তাহা তাঁহারা সেই মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন? তাঁহাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কঙ্কাবতীর মাতা মৃদুভাবে বলিলেন,—'হে ঠাকুর! যেন তাহাই হয়!'

ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া, পুনরায় তনু রায়ের নিকট গিয়া থাবা পাতিয়া বসিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তনু রায় তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে, এখন?'

তনু রায় উত্তর করিলেন,—'এখন আর কি? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যাঘ্র বলিয়া আপনার প্রতি আমার

কিছুমাত্র অভক্তি হইয়াছে। না না! আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কাহার কিরূপ মানসম্ভ্রম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ বুঝি। জনার্দন চৌধুরী দূরে থাকুক, যদি জনার্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ আমার পায়ে ধরে, তবুও আপনাকে ফেলিয়া তাহার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব না।'

তাহার পর তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—'তুমি আমার কথার উপর কথা কহিও না; তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে; আমি নিশ্চয় ইঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। ইঁহার মত সুপাত্র আর পৃথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কান্নাকাটি কর, তাহা হইলে ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।'

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও কথায় থাকিব না।'

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা? সেই দণ্ডেই তনু রায় পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, সেই দণ্ডেই প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই দণ্ডেই নাপিত পুরোহিত আসিলেন, সেই দণ্ডেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

সেই রাত্রিতেই ব্যাঘ্রের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহকার্য সমাধা হইল। প্রকাণ্ড বনের বাঘকে জামাই করিয়া কার না মনে আনন্দ হয়? আজ তনু রায়ের মনে তাই আনন্দ আর ধরে না।

প্রতিবাসীদিগকে তিনি বলিলেন—'আমার জামাইকে লইয়া তোমরা আমোদ আহ্লাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনও রূপ দুঃখ না করেন!'

জামাইকে তনু রায় বলিলেন,—'বাবাজি! বাসরঘরে গান গাহিতে হইবে; গান শিখিয়া আসিয়াছ তো? এখানে কেবল হালুম হালুম করিলে চলিবে না। শালী শালাজ তাহা হইলে কান মলিয়া দিবে। বাঘ বলিয়া তাহারা ছাড়িয়া কথা ক'বে না।'

বর না চোর! ব্যাঘ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালীশালাজ ঠানদিদিরা বলিতে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব?

প্রভাত হইবার পূর্বে ব্যাঘ্র তনু রায়কে বলিলেন,—'মহাশয়! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার কন্যাকে সুসজ্জিতা করিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন। আর বিলম্ব করিবেন না।'

প্রতিবাসিনীগণ কঙ্কাবতীর চুল বাঁধিয়া দিলেন। কঙ্কাবতীর মাতা কঙ্কাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিলেন।

তাহা দেখিয়া তনু রায় রাগে আরক্তনয়নে স্ত্রীকে বলিলেন—'তোমার মত নির্বোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে এরূপ লক্ষ্মীছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কখনও ভাল হয়? ভাল, বল দেখি? বাঘের কিসের অভাব? কাপড়ের দোকানে গিয়া হালুম করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর বাঘ কাপড়ের গাঁঠরি লইয়া চলিয়া যাইবে! স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া বাঘ হালুম করিয়া পড়িবে, প্রাণে দায়ে স্বর্ণকার পলাইবে, আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যখন এরূপ সুপাত্রের হাতে কন্যা দিলাম, তখন আবার কঙ্কাবতীর সঙ্গে ভাল কাপড়চোপড় দেওয়া কেন? তাই বলি, তোমার মত বোকা আর এ ভূভারতে নাই।'

তনু রায় লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, বৃথা অপব্যয় একেবারে দেখিতে পারেন না। যখন তাঁহার মাতার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়, তখন মাতা বিছানায় শুইয়াছিলেন। নাভিশ্বাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবলমাত্র একখানি ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত পুরাতন নয়, এরূপ একখানি বস্ত্র তখন তাঁহার মাতা পরিয়াছিলেন। কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রখানি তনু রায় খুলিয়া লইলেন। আর একখানি জীর্ণ ছিন্ন গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপ টানা হেঁচড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, মৃত্যুসময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যখন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তখন দেখিলেন, যে মার অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর তিরস্কারে, তনু রায়ের স্ত্রী একখানি ছেঁড়া খোঁড়া নেকড়া-চোকড়া লইয়া একটি পুঁটলী বাঁধিলেন। সেইটি কঙ্কাবতীর হাতে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, কন্যাকে বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বনে

পুঁটলী হাতে করিয়া, কঙ্কাবতী ব্যাঘ্রের নিকট আসিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্র মধুরভাষে বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তুমি বালিকা! পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না।'

কঙ্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। ব্যাঘ্র বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! আমার পিঠের লোম তুমি দৃঢ়রূপে ধর। দেখিও, যেন পড়িয়া যাইও না।'

কঙ্কাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বনাভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিলেন।

বিজন অরণ্যের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কঙ্কাবতী! তোমার কি ভয় করিতেছে?'

কঙ্কাবতীর উত্তর করিলেন,—'তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার আমার ভয় কি?'

কঙ্কাবতী এ কথা বলিলেন, বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাঁহার ভয় হয় নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি আর কখনও চড়েন নাই, এই প্রথম। সুতরাং ভয় হইবার কথা।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! কেন আমি বাঘ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীঘ্রই আমি মুক্ত হইব, সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না?'

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুইজনে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বৃহৎ এক অত্যুচ্চ পর্বতের নিকট গিয়া দুইজনে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! কিছুক্ষণের নিমিত্ত তুমি চক্ষু বুজিয়া থাক। যতক্ষণ না আমি বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।'

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, খল খল করিয়া বিকট হাসির শব্দ কঙ্কাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি! ওরূপ করিয়া কে হাসিল?'

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—'সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই। এখন তুমি চক্ষু উন্মীলন কর, — আর কোনও ভয় নাই।'

কঙ্কাবতী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা এক মনোহর অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত, বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত, অতি সুরম্য অট্টালিকা। ঘরগুলি সুন্দর, পরিষ্কৃত, নানা ধনে পরিপূরিত, নানা সাজে সুসজ্জিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা চারিদিকে রাশি রাশি স্তূপাকারে রহিয়াছে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে অদ্ভুত মানিলেন। অট্টালিকাটি কিন্তু পর্বতের অভ্যন্তরে স্থিত। বাহির হইতে দেখা যায় না। পর্বতগাত্রে সামান্য একটি নিবিড় অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ দ্বারা কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। পর্বতের শিখরদেশ হইতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু আলোক আসিবার পথও এরূপ কৌশলভাবে নিবেশিত ও লুক্কায়িত আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর, বসন-ভূষণ, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি কোনও দ্রব্যেরই অভাব নাই। নাই কেবল আহারীয় সামগ্রী।

অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটুখানি এইখানে বসিয়া থাক, আমি আসিতেছি। কিন্তু সাবধান এখানকার কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোনও দ্রব্য লইও না। যাহা আমি হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনা আপনি কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।'

এইরূপ সতর্ক করিয়া ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খেতু আসিয়া কঙ্কাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কঙ্কাবতী! আমাকে চিনিতে পার?'

কঙ্কাবতী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

খেতু পুনরায় বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! এই বনের মাঝখানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে?'

কঙ্কাবতী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—'না, আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিতেছি। তুমি কি মনে করিবে!'

খেতু বলিলেন,—'না, কঙ্কাবতী! আমাকে দেখিয়া তোমার ঘোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না; আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এখানে কেবল তুমি আর আমি, অন্য কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? তাও বটে, আবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি বিপদ?'

খেতু বলিলেন,—'এখন সে কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। তাহা হইলে তুমি ভয় পাইবে। এখন সে কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, তাহা হইলে কোন ভয় নাই, কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেটি আমি হাতে তুলিয়া দিব, সেইটি লইবে; নিজ হাতে কোনও দ্রব্য লইবে না। এক বৎসর কাল আমাদিগকে এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর, এসমুদয় ধনসম্পত্তি আমাদের হইবে। এই সমুদয় ধন লইয়া তখন আমরা দেশে যাইব। আচ্ছা! কঙ্কাবতী! যখন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'তা আর পারি নি? এক বৎসর কাল তোমার জন্য পথপানে চাহিয়াছিলাম। যখন এক বৎসর গত হইয়া গেল, তবুও তুমি আসিলে না, তখন মা আর আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব! কাল রাত্রিতে বাবা যখন বলিলেন যে,— 'বাঘের সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব' আর সেই কথায় তুমি যখন বাহির হইতে বলিলে,—'তবে কি মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিবেন?' সেই গর্জনের ভিতর হইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে কাহার কণ্ঠস্বর। তার পর আবার, ঘরের ভিতর আসিয়া, যখন তুমি চুপিচুপি মা'র কানে ও আমার কানে বলিলে,—'কোনও ভয় নাই' তখন তো নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, তুমি বাঘ নও।''

খেতু বলিলেন,—'অনেক দুঃখ গিয়াছে। কঙ্কাবতী! তুমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছ, আমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আর এক বৎসর কাল দুঃখ সহিয়া এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তো আমাদের সুখের দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল কাটিয়া যাইবে। তখন এই সমুদয় ঐশ্বর্য আমাদের হইবে। আহা! মা নাই, এত ধন লইয়া যে কি করিব? তাই ভাবি, মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণ্য কর্ম আছে, সমস্ত আমি মাকে করাইতাম। যাহা হউক, পৃথিবীতে অনেক দীনদুঃখী আছে। কঙ্কাবতী! এখন কেবল তুমি আর আমি। যতদূর পারি, দুইজনে জগতের দুঃখ মোচন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মাতার সৎকার কার্য সমাপ্ত করিয়া আমাকে বাটীতে রাখিয়া, তাহার পর তুমি কোথায় যাইলে? কি করিলে? ফিরিয়া আসিতে তোমার এক বৎসরের অধিক হইল কেন? তুমি ব্যাঘ্রের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?'

খেতু বলিলেন,—'না কঙ্কাবতী! এখন নয়। এক বৎসর গত হইয়া যাক, তাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।'

কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কঙ্কাবতী ও খেতু, পর্বত-অভ্যন্তরে সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্টালিকার কোনও দ্রব্য কঙ্কাবতী স্পর্শ করেন না। কেবল খেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, তাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টালিকার ভিতর সমুদয় দ্রব্য ছিল, কেবল খাদ্যসামগ্রী ছিল না। প্রতিদিন বাহিরে যাইয়া খেতু বনের ফলমূল লইয়া আসেন, তাহাই দুইজনে আহার করিয়া কাল যাপন করেন। বাহিরে যাইতে হইলে, খেতু ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া খেতু কখনও বাহিরে যান না। আবার অট্টালিকার ভিতর আসিয়া খেতু পুনরায় মনুষ্য হন। কেন তিনি বাঘের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কঙ্কাবতী তাহা বুঝিতে পারেন না। খেতু মানা করিয়াছেন, সে জন্য জিজ্ঞাসা করিবারও যো নাই! এইরূপে দশ মাস কাটিয়া গেল।

একদিন কঙ্কাবতী বলিলেন,—'অনেকদিন মাকে দেখি নাই। মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়, মা'ও আমাদের কোন সংবাদ পান নাই; মা'ও হয়তো চিন্তিত আছেন। আমরা কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, মা তাহার কিছুই জানেন না।'

খেতু উত্তর করিলেন,—'অল্প দিনের মধ্যেই পুনরায় দেশে যাইব, সে জন্য আর তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর লোকালয়ে যাইতে হইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হইবে, সে জন্য আর যাইতে বড় ইচ্ছাও হয় না। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে, বলিতে তো পারা যায় না। যাহা হউক, মাকে দেখিতে যখন তোমার সাধ হইয়াছে, তখন কা'ল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কাল সন্ধ্যার সময় মা'র নিকট তোমাকে আমি লইয়া যাইব। কঙ্কাবতী! বৎসর পূর্ণ হইতে আর কেবল দুই মাস আছে; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই দুই মাস তুমি না হয়, বাপের বাড়ি থাকিও।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'না, তা আমি থাকিতে চাই না! তুমি এই বনের ভিতর নানা বিপদের মধ্যে একেলা থাকিবে, আর আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তা' কি কখনও হয়? মার জন্য মন উতলা হইয়াছে,—কেবল একবারখানি মাকে দেখিতে চাই। দেখাশুনা করিয়া আবার তখনি ফিরিয়া আসিব।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ—শ্বশুরালয়

তাহার পরদিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া কঙ্কাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অট্টালিকা হইতে অনেকগুলি টাকাকড়ি লইয়া কঙ্কাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন যে 'এই টাকাগুলি তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনী-দিগকে দিবে।'

অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, দুই জনে অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের পথে চলিলেন। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার সময় খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! চক্ষু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।'

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়াবহ হাসি শুনিয়া আতঙ্কে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া খেতু কঙ্কাবতীকে চক্ষু চাহিতে বলিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে ছুটিলেন। প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতীকে পাইয়া, কঙ্কাবতীর মা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন! কঙ্কাবতীর ভগিনীগণও কঙ্কাবতীকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাঘ্র, তনু রায়কে নমস্কার করিলেন। শ্যালককেও তিনি অনেক টাকাকড়ি দিলেন। ব্যাঘ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা, পঞ্চোপচারে কঙ্কাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তনু রায়ের ভাবনা হইল,—'জামাতাকে কি আহার করিতে দিই?'

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে মনে বিচার করিয়া, তনু রায় বলিলেন,—'বাবাজি! এত পথ আসিয়াছ, ক্ষুধা অবশ্যই পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত ব্যঞ্জন আছে, আর কিছু নাই। ভাত-ব্যঞ্জন কিছু তোমার খাদ্য

নয়। তাই ভাবিতেছি,—তোমাকে খাইতে দিই কি? তা, তুমি এক কর্ম কর। আমার গোয়ালে একটি বৃদ্ধা গাভী আছে। সময়ে সে দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এখন তাহার বৎস হয় না, এখন আর সে দুধ দেয় না। বৃথা কেবল বসিয়া খাইতেছে। তুমি সেই গাভীটিকে আহার কর। তাহা হইলে তোমার উদর পূর্ণ হইবে, আমার জামাতাকে আদর করা হইবে। আর মিছামিছি আমাকে খড় যোগাইতে হইবে না।'

ব্যাঘ্র বলিলেন, 'না মহাশয়! আজ দিনের বেলায় আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এখন আমার আর ক্ষুধা নাই; গাভীটি এখন আমি আহার কবিতে পারিব না।'

তনু রায় বলিলেন,—'আচ্ছা! যদি তুমি গাভীটি না খাও, তাহা হইলে না হয়, আর একটি কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাও। তাহার সহিত আমার চির বিবাদ। সে শাস্ত্র জানে না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মামার বাড়িতে গিয়া আছে। আমি তোমায় সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহাকে খাইয়া আইস।'

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—'না মহাশয়! আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাইতে পারিব না।'

তনু রায় পুনর্বার বলিলেন,—'আচ্ছা! ততদূর যদি না যাইতে পার, তবে এই গ্রামেই তোমার আমি খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই গ্রামে এক গোয়ালিনী আছে। মাগী বড় দুষ্ট। দু'বেলা আসিয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তোমাকে কন্যা দিয়াছি বলিয়া মাগী আমাকে 'যা নয় তা'ই বলে। মাগী আমাকে বলে,—'অল্পায়ু, বুড়ো, ডেক্‌রা। টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে খেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া রক্ত খাও। তার রক্ত ভাল, খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।'

ব্যাঘ্র বলিলেন, 'না মহাশয় আজ আমি কিছু খাইতে পারিব না, আজ ক্ষুধা নাই।'

তনু রায় ভাবিলেন,—"জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন। বার বার 'খাও খাও' বলিতে হয় তবে কিছু খান। খাইতে বসিয়া 'এটি খাও, ওটি খাও, আর একটু খাও' এইরূপ পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে সব ফেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, ওদিকে মুখে বলেন, 'আর ক্ষুধা নাই, আর খাইতে পারি না।' জামাতাদিগের রীতি এই।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তনু রায় আবার বলিলেন,—'শ্বশুরবাড়ী আসিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আর কি পরিচয় দিব! পাড়ার মেয়েপুরুষগুলি এক একটি সব অবতার! তামাসা দেখিতে খুব প্রস্তুত; পরের ভাল একটু দেখিতে পারেন না। তুমি আমার জামাতা হইয়াছ, যাহা হউক, তোমার দু'পয়সা সঙ্গতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিতেছেন। এখনি কা'ল সকলে বলিবেন যে, 'তনু রায়ের জামাতা আসিয়াছিল, তনু রায় জামাতার কিছুমাত্র আদর করে নাই।' এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই।' সেই জন্য কিছু খাইতে তোমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে দেখাইয়া দিই। সে দুধ ঘি খায়। মাংস তাহার কোমল। তাহার মাংস তোমার মুখে ভাল লাগিবে। খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। মন্দ দ্রব্য কি তোমাকে খাইতে বলিতে পারি?'

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,— 'এবার মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। এইবার যখন আসিব, তখন দেখা যাইবে।'

তনু রায় মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। জামাতা আদরের সামগ্রী। প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে ক্লেশ হয়। তিনি তিনটি সুখাদ্যের কথা বলিলেন, জামাতা কিন্তু একটিও খাইলেন না। তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা।

তনু রায় বলিলেন,—'শ্বশুরবাড়ীতে এরূপ খাইয়া দাইয়া আসিতে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর মন তাহাতে বুঝিবে কেন? জামাতা কিছু না খাইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে দুঃখ হয়! এই আজ তুমি কিছু খাইলে না, সে জন্য তোমার

শাশুড়ীঠাকুরাণী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন—'তুমি জামাতাকে ভাল করিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' আবার যখন আসিবে, তখন আহারাদি করিয়া এস না। এইখানে আসিয়া আহার করিবে। তোমার জন্য এই তিনটি খাদ্যসামগ্রী আমি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একেবারেই তিনটিকে খাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে দিব না. তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না! ও কথা নয়! তোমার যে আবার ছাতি কি চাদর নাই। যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার উপর আমি রাগ করিব।'

কঙ্কাবতী, সমস্ত রাত্রি মা ও ভগিনীদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র প্রকৃত কে, তাহা মাতাকে বলিলেন। আর দুই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য লইয়া দেশে আসিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তনু রায়, একবার কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! বোধ হইতেছে যে, জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাঘ্র নন। বনের শিকড় মাথায় দিয়া মানুষে যে, সেই বাঘ হয়, ইনি বোধ হয় তাই। আমি ইহাকে নানারূপ সুখাদ্য খাইতে বলিলাম। আমার গোয়ালের বুড়ো গরুটিকে খাইতে দিলাম, নিরঞ্জনকে খাইতে বলিলাম, গোয়ালিনীকে খাইতে বলিলাম, কিন্তু ইনি ইহার একটিকেও খাইলেন না। যথার্থ বাঘ হইলে কি এইসব লোভ সামলাইতে পারিতেন? তাই আমার বোধ হইতেছে ইনি প্রকৃত বাঘ নন্। তুমি দেখিও দেখি? ইঁহার মাথায় কোনও-রূপ শিকড় আছে কি না? যদি শিকড় পাও, তাহা হইলে সেই শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মন্দ করিয়া থাকে, তো শিকড়টি পোড়াইলে ভাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না, শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় মানুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আসিবেন।'

পিতার এই উপদেশ পাইয়া কঙ্কাবতী যখন পুনরায় মার নিকট আসিলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'উনি তোমাকে চুপি চুপি কি বলিলেন?'

পিতা যেরূপ উপদেশ দিলেন, কঙ্কাবতী সে সমস্ত কথা মার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তুমি এ কাজ কখনও করিবে না।'

করিলে নিশ্চয়ই মন্দ হইবে। খেতু অতি ধীর ও সুবুদ্ধি। খেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জন্যই করিতেছেন। খেতুর আজ্ঞা তুমি কোনমতেই অমান্য করিও না। সাবধান, কঙ্কাবতী। আমি যাহা বলিলাম, মনে যেন থাকে!'

রাত্রি অবসান প্রায় হইলে, খেতু ও কঙ্কাবতী পুনবায় বনে চলিলেন। পর্বতের নিকটে আসিয়া, খেতু পূর্বের মত কঙ্কাবতীকে চক্ষু বুজিতে বলিলেন। সুড়ঙ্গ-দ্বারে পূর্বের মত কঙ্কাবতী সেই বিকট হাসি শুনিলেন। অট্টালিকার উপস্থিত হইয়া পূর্বের মত ইঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ—শিকড়

আর এক মাস গত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! কেবল আর এক মাস রহিল। এই এক মাস পরে আমরা স্বাধীন হইব। আর এক মাস গত হইয়া যাইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আমরা তখন দেশে যাইব।'

এক একটি দিন যায়, আর খেতু বলেন,—'কঙ্কাবতী! আর উনত্রিশ দিন রহিল; কঙ্কাবতী! আর আটাইশ দিন রহিল; কঙ্কাবতী! আর সাতাইশ দিন রহিল।'

এইরূপে কুড়ি দিন গত হইয়া গেল। কেবল আর দশ দিন রহিল। দশ দিন পরে কঙ্কাবতীকে লইয়া দেশে যাইবেন, সে জন্য খেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। খেতুর মুখে সদাই হাসি!

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! তুমি এক কর্ম কর। কয়লা দ্বারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটি দাগ দিয়া রাখ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একটি করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা হইলে সম্মুখে সর্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন আর বাকী রহিল।'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, —'দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর মন বড়ই আকুল হইয়াছে। প্রাচীরে তো দশটি দাগ

দিলাম, যেমন এক একটি দিন যাইবে, তেমনি এক একটি দাগ তো মুছিয়া ফেলিলাম; তা তো সব হইবে। কিন্তু এক দিনেই কি দশটি দিন মুছিয়া ফেলিতে পারি না? এক দিনেই কি স্বামীর উদ্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়! আজ কি কা'ল যদি দেশে যাইতে পান, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে।'

এই দুই মাসের মধ্যে, পিতার কথা তাঁহার অনেকবার স্মরণ হইয়াছিল। মন্দ লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার মনে বারবার উদয় হইয়াছিল। তবে মা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য এতদিন তিনি কোনওরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। এক্ষণে দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর ঘোরতর ব্যগ্রতা দেখিয়া কঙ্কাবতীর মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'বাবা পুরুষ মানুষ! পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, বাঘ-ভাল্লুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলের কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন? মা, মেয়েমানুষ, ঘরের বাহিরে যান না। মা কি করিয়া জানিবেন যে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে, তাহার কি উপায় করিতে হয়? শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ কাটিয়া যায়, বাবা এই কথা বলিয়াছেন। এখনও দশ দিন আছে, স্বামী আমার দিন গণিতেছেন, যদি কা'ল তিনি বাড়ী যাইতে পান, তাহা হইলে তাঁর কত না আনন্দ হইবে!'

এইরূপ কঙ্কাবতী সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে ভাবেন, 'কি জানি, পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়! কাজ নাই, এই দশটা দিন চক্ষুকর্ণ বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকি। বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, মা তাহা বারণ করিয়াছেন।'

আবার ভাবেন,—'দুষ্টেরা আমার স্বামীর মন্দ করিয়াছে। দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধি হইতে স্বামীকে আমি মুক্ত করিব। আমি যদি স্বামীকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কত না আমার উপর পরিতুষ্ট হইবেন।'

ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। কি করিবেন, কঙ্কাবতী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রিতেও কঙ্কাবতী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিলকসুন্দরী ও ভুশকুমড়োর গল্প মনে পড়িল।

রাজপুত্র, তিলকসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলকসুন্দরীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন হইয়াছিল। তিলকসুন্দরীর সৎমা তাহার মাথায় একটি শিকড় দিয়া দিলেন। শিকড়ের গুণে তিলকসুন্দরী পক্ষী হইয়া গেল। উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। সৎমা কৌশল করিয়া আপনার মেয়ে ভুশকুমড়োর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন। ভুশকুমড়োকে রাজপুত্র আদর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তিলকসুন্দরী গাছের ডাল হইতে বলিল, —'ভুশকুমড়ো কোলে! তিলকসুন্দরী ডালে!!' রাজপুত্র মনে করিলেন,—'পাখীটি কি বলে?' রাজপুত্র সেই পাখীটিকে ডাকিলেন। পাখীটি আসিয়া রাজপুত্রের হাতে বসিল। সুন্দর পাখীটি দেখিয়া, রাজপুত্র তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার শিকড়টি পড়িয়া গেল। পাখী তখন পুনরায় তিলকসুন্দরী হইল। রাজপুত্র তখন সৎমার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। সৎমার কন্যা ভুশকুমড়োকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেন। তিলকসুন্দরীকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতীর সেই তিলকসুন্দরীর কথা এখন মনে হইল। আরব্য উপন্যাসে এই ভাবের যে গল্প আছে, তাহাও তার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—'দুষ্টগণ শিকড়ের দ্বারা এইরূপে লোকের মন্দ করে। আচ্ছা যাই দেখি, আমার স্বামীর মাথায় কোনরূপ শিকড় আছে কি না?'

এই মনে করিয়া তিনি অন্য ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিলেন। বাতিটি হাতে করিয়া, শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া, খেতুর মাথায় শিকড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খেতু ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। খেতু ইহার কিছুই জানেন না।

সর্বনাশ! অনুসন্ধান করিতে করিতে কঙ্কাবতী খেতুর মাথায় একটি শিকড় দেখিতে পাইলেন। 'বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই! দুষ্টলোকদিগের একবার দুরভিসন্ধি দেখ! ভাগ্যক্রমে আজ আমি মাথাটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম; তা না হইলে কি হইত?'

কঙ্কাবতী, শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে খুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। শিকড়টি মাথার চুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না। পাছে খেতু জাগিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। পুনরায় অপর ঘরে গিয়া, সেস্থান হইতে কাঁচি লইয়া আসিলেন। চুলের সহিত শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে কাটিয়া লইলেন। শিকড়টি তৎক্ষণাৎ বাতির অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

শিকড় পুড়িয়া ঘরের ভিতর অতি ভয়ানক তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে কঙ্কাবতীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কঙ্কাবতী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতীর সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া খেতু জাগরিত হইলেন। মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় নাই! ভয়ে বিহ্বলা, কম্পিত-কলেবরা জ্ঞানহীনা, কঙ্কাবতীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কঙ্কাবতী ভূতলশায়িনী হন আর কি, এমন সময় খেতু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বাতিটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কঙ্কাবতীকে আস্তে আস্তে বসাইলেন। কঙ্কাবতীর মুখে জল দিয়া, কঙ্কাবতীকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুস্থ হইয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমি যে, ঘোর কু-কর্ম করিয়াছি, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।'

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। প্রথম তো অদৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এত দিন গিয়া আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? তাহার পর আমার দোষ। আমি যদি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি তোমার নিকট কিছু গোপন না করিতাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি কখনই করিতে না, আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। শিকড়টি কি বাতির আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছ?'

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হাঁ! শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।'

খেতু বলিলেন,—'তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাঁধিতে হইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী। তোমার জন্য প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইয়াছে। কঙ্কাবতী! প্রকৃত যাহারা পুরুষ হয়, মরিতে তাহারা ভয় করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদিগের জন্যই তাহারা কাতর হয়।'

ব্যস্ত হইয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন? কি? আমাদের কি বিপদ হইবে? কি বিপদ হইবে? কি বিপদের আশঙ্কা তুমি করিতেছ?'

খেতুর উত্তর করিলেন,—'কঙ্কাবতী! যদি গোপন করিবার সময় থাকিত, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই। তোমাকে একাকিনী এ স্থান হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঠিক উত্তর মুখে যাইবে। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য উদয় হইবে, সূর্যকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া চলিলেই তুমি গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর তুমি?'

খেতু বলিলেন,—'আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এ স্থানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকাকড়ি লইয়াছি, সুতরাং এখান হইতে আমি আর যাইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্য এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া সুড়ঙ্গপথে গমন করিবে। পর্বতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রাত্রিটি যাপন করিবে। যখন প্রাতঃকাল হইবে, সূর্য উদয় হইবে, তখন কোন্ দিক উত্তর অনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে যাইলেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইবে। কঙ্কাবতী! আর বিলম্ব করিও না।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'এ স্থান হইতে আমি যাইব? তোমাকে এইখানে রাখিয়া আমি এখান হইতে যাইব? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে? আমি ঘোরতর কুকর্ম করিয়াছি সত্য, আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী। কিন্তু তা বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয়? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না, না জানিয়া এ কাজ করিয়াছি,

ভাল ভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই!'

খেতু উত্তর করিলেন,—'কঙ্কাবতী! তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। রাগ করিয়া তোমাকে বলি নাই যে, 'তুমি এখান হইতে যাও।' বড় বপদের কথা, বড় নিদারুণ কথা, কি করিয়া তোমাকে বলি? এখান হইতে তোমাকে যাইতে হইবে, কঙ্কাবতী! নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে, আর এখনি যাইতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন তুমি পিতার বাটীতে গিয়া থাক, লোকজন সঙ্গে করিয়া দশ দিন পরে পুনর্বার এই বনের ভিতর আসিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা লইয়া যাইও। দশ দিন পরে লইলে কোনও ভয় নাই, তখন তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। এই ধন-সম্পত্তি চারিভাগ করিবে। এক ভাগ তোমার পিতাকে দিবে, এক ভাগ রামহরি দাদা মহাশয়কে দিবে, এক ভাগ নিরঞ্জন কাকাকে দিবে, আর এক ভাগ তুমি লইবে। ব্রত-নিয়ম ধর্ম-কর্ম দান-ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিবে। মনুষ্যজীবন কয় দিন? কঙ্কাবতী' দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর এখন আমি যেখানে যাইতেছি, সেইখানে তুমিও যাইবে; দুই জনে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, প্রাণে বড় ভয় হইতেছে।—হায়! আমি কি করিলাম! কি বিপদের কথা? কি নিদারুণ কথা? এখন কোথায় তুমি যাইবে? আমাকে ভাল করিয়া সকল কথা তুমি বল।'

খেতু বলিলেন, —'তবে শুন। এই অট্টালিকার ভিতর যা ধন দেখিতেছ, ইহার প্রহরিণীস্বরূপ নাকেশ্বরী নামধারিণী এক ভয়ঙ্করী ভূতিনী আছে। সুড়ঙ্গের দ্বারে সর্বদা সে বসিয়া থাকে। সেই যে খল খল বিকট হাসি তুমি শুনিয়াছিলে, সে হাসি এই নাকেশ্বরীর। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্শ করিবে, মুহূর্তের মধ্যে সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইয়াছি। কিন্তু যে শিকড়টি তুমি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিকড়ের দ্বারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। তা' না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেশ্বরী আমাকে খাইয়া ফেলিত! শিকড় নাই, এ কথা নাকেশ্বরী এখনও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশ্বরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। এক তো এখান হইতে বাহিরে যাইবার অন্য উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, গ্রামে যাই কি নগরে যাই, যেখানে যাইব, নাকেশ্বরী সেইখানে গিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে।'

এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতী খেতুর পা-দুটি ধরিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলি তাঁহার ইচ্ছা। উঠ, যাও, আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাও। এখনি নাকেশ্বরী এখানে আসিয়া পড়িবে। তাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ী যাও; মা'র কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।'

কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নয়নে আরক্ত-বদনে কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। কঙ্কাবতীর মৃদু মনোমুগ্ধকারিণী সেই রূপমাধুরী উগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া, এখন অন্য প্রকার এক সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইল।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া যাইব? তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভয়ে প্রাণ লইয়া আমি পলাইব? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে! শতধিক আমার প্রাণে, শতধিক আমার বাঁচনে! তোমার কঙ্কাবতী অল্পবুদ্ধি বালিকা বটে, সেইজন্য সে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে। তা বলিয়া কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়! নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কঙ্কাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কঙ্কাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

খেতু, কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কঙ্কাবতীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কঙ্কাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কঙ্কাবতীর মুখে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। খেতু ভাবিলেন,—'কঙ্কাবতীকে আর যাইতে অনুরোধ করা বৃথা।'

দশম পরিচ্ছেদ—চুরি

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! যদি নিতান্ত তুমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—শুন। তুমি বালিকা, তা'তে জনশূন্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের দ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরী। পাছে তুমি ভয় পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—শুন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড় পোড়ার গন্ধ পাইলেই বোধ হয় নাকেশ্বরী জানিতে পারিবে যে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তখনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণ বধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

'মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতায় না গিয়া কি জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম, সে কথা তোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কাশীতে উপস্থিত হইয়া মাতার শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর কর্ম-কাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বেই একটি উত্তম কাজ পাইলাম। অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত সত্য, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব, এরূপ আশা হইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেইরূপ যৎসামান্য ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আমি তোমার বাপের জন্য রাখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী! বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, এক একদিন সন্ধ্যাবেলা, এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জলখাবার নয়, কেবল খালি জল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হইত, কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্ষুধার জ্বালাও নিবৃত্ত হইত। তাহার পর শয়ন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম, ক্ষুধার জ্বালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্য কাহাকেও একটি পয়সা দিতাম না। একটি বড় লোটা কিনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর, যখন কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গঙ্গার ঘাট বড় উচ্চ। জল আনিতে গিয়া একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। হাতে ও পায়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই ঘাটের একটি সোপানে বসিলাম। কঙ্কাবতী! সেইখানে বসিয়া কত যে কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। মনে মনে করিলাম যে, হে ঈশ্বর! আমি কি পাপ করিয়াছি? যে, তাহার জন্য আমার এ ঘোর 'শাস্তি!' কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। নিজের সুখদুঃখে যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, এ জগতে শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা লইয়া থাকেন, পাঁচটার ভালমন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের সুখদুঃখ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথায়? যা'রে আমি ভালবাসি, যার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছি, যা'র মঙ্গল-কামনা সতত করিয়া থাকি, সে কি অকর্ম-দুষ্কর্ম করিবে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? তাহার কর্মের উপর আমার কোনও অধিকার নাই, অথচ তাহার অসুখ, তাহার ক্লেশ দেখিলে হৃদয় আমার ঘোরতর ব্যথিত হয়। আবার সে নিজে যদিও কোনও দুষ্কর্ম না করে, কি নিজে নিজের অসুখের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে সে প্রপ্রীড়িত হইতে পারে। আমি হয় তো পরের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরুপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয়বস্তুর যাতনা আমাকে দেখিতে হয়। এই ধর,—যেমন তোমার প্রতি পিতা-ভ্রাতার পীড়ন; তাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম? চারিদিকে সাধুদিগের ধুনী দেখিয়া তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। আবার ভাবিলাম,—এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র! নানা পাপ, নানা দুঃখ, এই সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি প্রাণী সেই পাপে সেই তাপে তাপিত হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে। আমি,—'যা'র জ্ঞান-চক্ষু তাহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর সুসজ্জিত হইয়াছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পরাজয় মানিয়া, নির্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া থাকিব? কঙ্কাবতী! এইরূপ কত কি যে ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব!

'আস্তে আস্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুইসহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব। টাকাগুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদয় নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ নোটের প্রতি আমাদের গ্রামের লোকের আস্থা নাই। একটি ব্যাগের ভিতর টাকাগুলি লইয়া রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ব্যাগটি আপনার কাছে অতি যত্নে অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ী হইতে নামি নাই। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন বড় একটি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল। সেখানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইবে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। তবুও জলখাবার কিনিবার জন্য গাড়ী হইতে আমি নামিলাম না। যে গাড়ীতে আমি বসিয়াছিলাম, সে গাড়ীতে আর একটি অপরিচিত লোক ছিল,—অন্য আর কেহ ছিল না। সে লোকটি নিজের জন্য জলখাবার আনিতে গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, —'মহাশয়! আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'যদি তুমি আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইব।' এই বলিয়া, জলখাবার কিনিবার নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়সা দিলাম। সে আমাকে জলখাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা খাইলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম, —'গাড়ীর উত্তাপে এইরূপ হইয়াছে।' একটু শুইলাম। শুইতে না শুইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য কিছু মাত্র রহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অল্পে অল্পে জ্ঞানের উদয় হইল। কিন্তু মাথা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইলে দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই! চারিদিকে চাহিয়া দেখি যে গাড়ীতে সে লোকটা নাই। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই! ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না। আবার যে ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে, এখন তাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। এক বৎসর ধরিয়া, এত কষ্ট পাইয়া, জল খাইয়া যে টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই! কিরূপ মর্মভেদী অসহ্য যাতনা আমার মনের ভিতর তখন হইল, একবার বুঝিয়া দেখ দেখি। হাঁ কঙ্কাবতী! মানুষের মনে এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ নিষ্ঠুরতা নরক না হয়, তবে নরক আবার কি? কঙ্কাবতী! মানুষে মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে, তাদের কি ক্লেশ হয় না?'

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কাবতীর চক্ষুতে জল আসিল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভাল হইয়াছে। কাজ নাই!— কাজ নাই আর এ জগতে থাকিয়া! চল আমরা এ জগৎ হইতে যাই। নাকেশ্বরী আমাদের শত্রু নয়,—নাকেশ্বরী আমাদের পরম মিত্র।'

খেতু বলিলেন,—'কান পাতিয়া শুন দেখি! নাকেশ্বরীর কোনও সাড়াশব্দ পাও কি না?'

কঙ্কাবতী একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন,—'না,—কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই।''

খেতু পুনরায় বলিলেন,—'তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্বরী না আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়া লই।'

'যখন বুঝিলাম যে, আমার টাকাগুলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নির্মূল হইল।' যে লোকটি আমার সঙ্গে গাড়ীতে ছিল, সে চোর। জলখাবারের সহিত সে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই জলখাবার খাইয়া যখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সে আমার টাকাগুলি লইয়া পলাইয়াছে। কখন কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? সুতরাং চোর ধরা পড়িবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তবু রেলের কর্মচারীদিগকে সকল কথা জানাইলাম। আমাকে সঙ্গে লইয়া, সমস্ত গাড়ী তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেন।

'কোনও গাড়ীতে সে লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী! এই যে মনুষ্যজীবন দেখিতেছ, কেবল কতকগুলি আশা ও হতাশা, এই লইয়াই মনুষ্য জীবন। কি করিব আর, কঙ্কাবতী? চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—'এখন করি কি? যাই কোথায়? কলিকাতা যাই, কি কাশী

ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই।' তার পর মনে পড়িল যে রাণীগঞ্জের টিকিটখানি, আর গুটি-কত পয়সা ভিন্ন হাতে আর কিছুই নাই। যাহা হউক, হাতে পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব। তুমি পথ পানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে! মনে করিলাম—'তোমার বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে দুই হাজার টাকার খত লিখিয়া দিই, মাসে মাসে টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।'

'কঙ্কাবতী! বারবার তোমার বাপের কথা মুখে আনিতে মনে বড় ক্লেশ হয়। তিনি কেন যাই হউন না? তোমার পিতা তো বটে! তাঁর কথা বলিতে গেলেই যেন নিন্দা হইয়া পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, 'এখান হইতে প্রচুর ধন দিয়া, ধনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা করিয়া দিব!' পৃথিবীর আর একটি রোগ দেখ, কঙ্কাবতী! ধনের জন্য সবাই উন্মত্ত, ধনের জন্য সবাই লালায়িত। পেটে কত-কটি খাই, কঙ্কাবতী। গায়ে কি পরি? যে ধন-পিপাসায় এত তৃষিত হইব? হাঁ! ধন উপার্জনের আবশ্যক। কেন না, ইহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের উপকার করিতে পারা যায়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিতে পারা যায়, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে পারা যায়, দায়গ্রস্তকে দায় হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অনেক পরিমাণে দুঃখময় জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারা যায়।

''যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, যিদি আমোদপ্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতে হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জনে বা জ্ঞানোপার্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত এই সংসারে তিনি দেবতাস্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া কঙ্কাবতী! ধনোপার্জনে লোক যে উন্মত্ত না হয়। জ্ঞানোপার্জনে ও ধর্মোপার্জনে লোক উন্মত্ত হয় হউক। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভঞ্জনের গভীর গর্জন, পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। ঊর্ধ্বপ্রদেশে সেই মহাআকাশে সব স্থির, সব শান্ত। সেইরূপ মানবের এই কর্মক্ষেত্রেও উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন মান জাতি ধর্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল শুনিতে পাও, অজ্ঞানতাময় নীচ-পথাশ্রিত মানবমন হইতেই সে সমুদয় উত্থিত হয়। এই মৃত্যু-সময়ে, মোহান্ধ, নিম্নপথাবলম্বী মানবকুলের বৃথা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কঙ্কাবতী! আমি আর হাসা-সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

'কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী যাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে দুইটি পথ আছে। একটি রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতিবিধি করে, দ্বিতীয়টি বনপথ, তাহাতে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে, সেজন্য সে পথ দিয়া লোকে বড় যাতায়াত করে না। বনপথটি কিন্তু নিকট। সে পথটি দিয়া আসিলে পাচ দিনে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, রাজপথ দিয়া যাইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যখন নামিলাম, তখন আমার হাতে কেবল চারিটি পয়সা ছিল। শীঘ্র গ্রামে পৌঁছিব, সে নিমিত্ত আমি বনপথটি অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পয়সা কয়টি খরচ হইয়া গেল। পাহাড় পর্বত, বন-উপবন, নদী নির্ঝর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফলমূল যাহা কিছু পাই, তাহাই খাই। রাত্রিতে যে দিন গ্রাম পাই, সেদিন কাহারও দ্বারে পড়িয়া থাকি। যে দিন গ্রাম না পাই, সে দিন গাছতলায় শুইয়া থাকি। মনে করিলাম, 'আমাকে বাঘ-ভালুকে কিছু বলিবে না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ-ভালুকে খাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে যে, এ দুঃখ সব ভোগ করিবে?'

এইরূপে চারিদিন কাটিয়া গেল। আমাদের গ্রাম হইতে যে উচ্চ পর্বতটি দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধ্যাবেলা আমি এই পর্বতের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্বতটি এই; যাহার ভিতর এক্ষণে আমরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন অনাহারে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, প্রাতঃকালে আরও অধিক দুর্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাত্রি চলি, সকাল বেলা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব। এইরূপ ভাবিয়া, সে রাত্রিতে আর বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এক প্রহরের পর চন্দ্র অস্ত যাইলেন, ঘোরতর অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্রে যাই, একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বামদিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি কষ্টে বনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু

কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর তুলিতে পারি না। পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময়, সম্মুখে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম অবশ্য এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায় ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম। হা অদৃষ্ট! গিয়া দেখিলাম, দেব নাই, দেবী নাই, জনমানব নাই। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, ভগ্ন; ভিতর ও বাহির বন্য বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত। বহুকাল হইতে জনমানবের সেখানে পদার্পণ হয় নাই। 'হা ভগবান্! তোমার মনে আরও কত কি আছে!' এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানে আমি শুইয়া পড়িলাম।'

একাদশ পরিচ্ছেদ—ভূত-কোম্পানী

খেতু বলিতেছেন,—'রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার শ্বেতবর্ণ এক মড়ার মাথা। একটি পৈটা হইতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। কঙ্কাবতী! ভয় আমার শরীরে কখনও নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মড়ার মাথাটি লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত পৈটাগুলি উঠিল, তারপর ভাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটি লাফ মারিল, আমার ঠিক মুখের সম্মুখে শূন্যেতে স্থির হইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সেইখানে থাকিয়া আকর্ণ হাঁ করিয়া দন্তপাঁতি দুইটি বাহির করিল।

এইরূপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবু! তুমি না কি ভূত মানো না?'

আমি উত্তর করিলাম,—'রক্ষা করুন মহাশয়! আপনারা পর্যন্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কষ্টে, নানা দুঃখে আমি বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছি। যান, ঘরে যান! আমাকে আর জ্বালাতন করিবেন না।'

আমার কথায় মুণ্ডটির আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না? ইংরেজী পড়িয়া তুমি নাকি ভূত মানো না?'

আমি বলিলাম,—'ইংরেজি-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয়?'

মড়ার মুণ্ড উত্তর করিল,—'রাগ হইবে না তো কি, সর্বশরীর শীতল হইবে? ভূত না মানিলে ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্য্যাদা বাড়ে? কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজী-পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একবার উড়াইয়া দিবে? দেবতাদিগকে তোমরা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়! বটে!'

দুঃখের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতা-দিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্বে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও শুনি নাই। আমার তাই হাসি পাইল।

আমি বলিলাম,—'হাঁ মহাশয়! ইংরেজী-পড়া বাবুদের এটী অন্যায় বটে।'

আমার কথায় মড়ার মাথা কিছু সন্তুষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুণ্ড বলিল,—'তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরেজী-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নাস্তিক নও! তোমার মাথায় টিকি আছে?'

আমি বলিলাম,—'না মহাশয়! আমার মাথায় টিকি নাই।'

মুণ্ড বলিল,—'এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর শুন, ইংরেজি-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুনরায় ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, আমরা সে সমুদয় আয়োজন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। যেখানে সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদপত্র বাহির করিব। এই সকল কার্যের নিমিত্ত

আমরা একটি কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং'।'

কঙ্কাবতী! তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে, "স্কল" মানে মনুষ্যের মাথার খুলি, "স্কেলিটন" মানে কঙ্কাল, অর্থাৎ অস্থি-নির্মিত মনুষ্যশরীরের কাটামো। মুণ্ড যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, ইংরেজী-পড়া লোকেরা যাহাতে ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে যাহাতে ভূতের উপর বিশ্বাস হয়, ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত খুলি, কঙ্কাল প্রভৃতি ভূতগণ দল বদ্ধ হইয়াছেন।

স্কল অর্থাৎ সেই মড়ার মাথাটি আমাকে পুনরায় বলিলেন,—'আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজী নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম, 'খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানী' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত, ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাও না? যে, যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, 'লংম্যান এণ্ড কোং।' অথবা 'গুডম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া শতসহস্রবার ঠকিয়া দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংড্রুজ পিংড্রুজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়াছি—'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং।' স্কেলিটন ভায়া ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এস তো স্কেলিটন ভায়া, একটু এদিকে এস তো!'

হাড় ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে স্কেলিটন আমার নিকটে আসিলেন। সর্বশরীরের অস্থিকে স্কেলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার সম্মুখে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলাম মুণ্ডহীন স্কেলিটন।

তখন স্কল আমাকে পুনরায় বলিলেন—'কেমন! ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো?'

আমি উত্তর করিলাম,—'পূর্ব হইতেই আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এত দিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছি। কিন্তু সে অন্য প্রকার ভূত। এখন হইতে আপনাদিগের মত ভূতকে মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ চক্ষের উপর দেখিয়া আর কি করিয়া না মানি? তার জন্য আর আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না; যান এক্ষণে ঘরে যান। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আপনাদিগের ঘরের লোক ভাবিবে। আর, আমাকে একটু নিদ্রা যাইতে হইবে। কারণ, কা'ল প্রাতঃকাল হইতে আবার আমাকে পথ চলিতে হইবে।'

স্কল তখন স্কেলিটনকে বলিলেন,—'দেখিলে, স্কেলিটন ভায়া! কোম্পানী খুলিলে কত উপকার হয়! ইংরেজি পড়িয়া এই বাবুটির মতিগতি একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দু'কথাতেই পুনরায় ইহাকে স্বধর্মে আনয়ন করিলাম। এক্ষণে চল, অন্যান্য বিকৃতমতি বাবুদিগকে অন্বেষণ করি। ভূতবর্গের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি হয়, চল, সেইরূপ উপায় করি।'

স্কেলিটন হাড় ঝম্ ঝম্ করিলেন। আমি একটু কান পাতিয়া শুনিলাম যে, সে কেবল হাড় ঝম্ ঝম্ নয়। তাঁহার মুণ্ড নাই, সুতরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপায় নাই। সে জন্য গায়ের হাড় নাড়িয়া হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া তিনি কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে কথা আমি অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম।

স্কেলিটন বলিলেন,—'যদি ইনি ভূতভক্ত হইলেন, তবে ইঁহাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। লোককে ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্মবান্, অতি ভক্তিমান্ মহাপুরুষ হয়। অতএব তুমি ইঁহাকে ধন দান কর। যখন দেশে গিয়া, ইনি গল্প করিবেন, তখন শত শত লোক অর্থলোভে ভূতভক্ত হইবে।'

আমি বলিলাম,—'সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আমি অর্থলোভী নই। ধন দিয়া আমাকে ভূতভক্ত করিতে হইবে না। আপনাদের অর্থ আমি লইব না।'

এই কথা শুনিয়া স্কল আরও প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—'এস, আমারে সঙ্গে এস। আমাদের সঞ্চিত ধন তোমাকে দিলে, ধনের সফলতা হইবে, ধন সুপাত্রে অর্পিত হইবে, সে ধন দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে, সেই জন্য তোমাকে আমাদের সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের সদ্ব্যবহার করি নাই; এক্ষণে তোমা কর্তৃক সে ধনের সদ্ব্যবহার হইলে, আমাদের উপকার হইবে।'

স্কেলিটনও আমাকে সেইরূপ অনেক অনুরোধ করিলেন। দুই ভূতের অনুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্কেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্কল স্থানবিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফলবৃক্ষের নিকট লইয়া যাইলেন। আম্র, কদলী, পনস, কেন্দু, পিয়াল প্রভৃতি নানা ফল সেইখানে সুপক্ক হইয়াছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহারা আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাঁহারা আমাকে সুশীতল স্ফটিকসদৃশ নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। জলপান করিয়া আমি পিপাসা দূর করিলাম। সেখান হইতে আমরা পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ করে এই পর্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্বতের এক স্থানে আসিয়া স্কল বলিলেন,— 'এইখানকার বন আমাদিগকে একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। আজ সহস্র বৎসব ধরিয়া এখানে জনমানব পদার্পণ করে নাই।' আমরা তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই বন পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। পরিষ্কৃত হইলে পর্বত গাত্রে গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্কল, স্কেলিটন ও আমি অতি কষ্টে সেই গাঁথুনির পাথরগুলি ক্রমে খুলিয়া ফেলিলাম। গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের এই অট্টালিকার সুড়ঙ্গপথটি বাহির হইয়া পড়িল। সুড়ঙ্গদ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরীকে দেখিলাম। নাকেশ্বরী খল খল কবিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চক্ষু-কোটর বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে কোপ-কটাক্ষ করিলেন, আর সে চুপ করিল। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া আমরা এই অট্টালিকার ভিতব প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

স্কল বলিলেন,—'সহস্র বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলের আমরা রাজা ছিলাম। প্রতিবাসী রাজাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই অপরিমিত ধন অর্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্মকর্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও ধনসঞ্চয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তানসন্ততি ছিল না। সে জন্য আমরা দুঃখিত ছিলাম না, বরং আনন্দিত ছিলাম। যেহেতু সন্তানসন্ততি দ্বারা ধনের ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া, আমরা স্বর্গসুখ উপভোগ করিতাম। আমাদের অবর্তমানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জন্য আমরা ইহার উপর 'যক্' দিলাম, অর্থাৎ ইহার উপর এক ভূতিনীকে প্রহরিণী-স্বরূপ নিযুক্ত করিলাম, এ কার্যে যক্ষ বা যক্ষিণী নিযুক্ত করি নাই। কথায় লোকে বলে বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক্ষ বা যক্ষিণী কেহ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদিগের ধন ঐশ্বর্যের উপর যক্ দিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে পর্বত-অভ্যন্তরে এই সুরম্য অট্টালিকাটি নির্মাণ করিলাম। রাজবাড়ী হইতে সমুদয় টাকাকড়ি, মণি-মুক্তা, বসন-ভূষণ ইহার ভিতর লইয়া আসিলাম। যথা-বিধি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া নবমবর্ষীয়া সুলক্ষণা একটি বালিকাকে উৎসর্গ করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলাম যে, এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত তুমি এই ধনের প্রহরিণীস্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে। এক সহস্র বৎসরের মধ্যে যদি কেহ এই ধনের এক কণামাত্রও লয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও, তখন যাহার অদৃষ্টে থাকিবে, সে এই ধনের অধিকারী হইবে। বালিকাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, অট্টালিকার ভিতর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া, আমরা সুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। প্রদীপটি যেই নির্বাণ হইল, আর বালিকার মৃত্যু হইল, মরিয়া সে ভীষণাকৃতি অতি দীর্ঘনাসিকা-ধারিণী ভূতিনী হইল। ভূতসমাজে সেজন্য সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিতা। দ্বারে এখন যে এই প্রহরিণী-স্বরূপ রহিয়াছে, সে সেই বিকৃত-আকৃতি ভূতিনী, যাহার বিকট হাসি তুমি এই মাত্র শুনিলে। বালিকা না রাখিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছুদিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হই। শত্রুর তরবারি-আঘাতে দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবিত থাকিতে ছিলাম একজন মনুষ্য; মরিয়া হইলাম দুইজন ভূত। মুণ্ডটি হইলাম আমি স্কল, আর ধড়টি হইলেন ইনি স্কেলিটন ভায়া। ৯৯৯ বৎসর পূর্বে আমরা এই ধনের উপর যক্ দিয়াছি। আর এক বৎসর গত হইলেই সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়।

তখন নাকেশ্বরী এ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মাসে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘ্যোঁ নামক ভূতের শুভবিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। তখন এ ধন লইলে আর তোমার কোনও বিপদ্ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণামাত্র স্পর্শ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এই ধনসম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা দুইজন। এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বৎসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।'

আমি উত্তর করিলাম,—'মহাশয়! আপনাদের কৃপায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন, তবে এরূপ কোন একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না তাই সন্দেহ।'

এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া, স্কল ও স্কেলিটন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

স্কল বলিলেন,—'এস, আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস।' সকলে পুনরায় যাইলাম,—বনের ভিতর পুনরায় আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্কল বন খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে সামান্য একটি ওষধির গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—'এই গাছটির তুমি মূল উত্তোলন কর।' আমি সেই গাছটির শিকড় তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটি গাছের আঠা দিয়া সেই শিকড়টি আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। তাহার পর সকলে আমার এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

এইখানে উপস্থিত হইয়া স্কল বলিলেন,—'যে সকল কথা তোমাকে আমি এখন বলি, অতি মনোযোগের সহিত শুন। আপাততঃ যথাপ্রয়োজন টাকা লইয়া তুমি তোমার কার্য সমাধা করিবে। যে শিকড় তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে, যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে, ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অট্টালিকার বাহিরে শিকড় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিকড়ের কিন্তু আর একটি গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তুর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই জন্তু হইতে পারিবে। ব্যাঘ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সেজন্য যখন তুমি অট্টালিকার বাহিরে যাইবে, তখন ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া যাইবে। তাহা হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মনুষ্যের মূর্তি ধরিতে পারিবে। অতএব দুইটি কথা স্মরণ রাখিও, কোনও মতেই ভুলিবে না। প্রথম, এ এক বৎসর শিকড়টি যেন কিছুতেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্যু। তুমি যেখানে থাক না কেন, সেইখানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যাঘ্ররূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুহূর্তকালের নিমিত্তও নিজরূপে বাহিরে থাকিবে না, থাকিলেই মৃত্যু, সেইদণ্ডেই মৃত্যু। এক বৎসর পরে শিকড়টি দগ্ধ করিয়া সমুদয় ধনসম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। এ এক বৎসরের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে, তাহা হইলে এ সব কিছুই করিতে হইত না। কারণ নাকেশ্বরী-রক্ষিত ধন না লইলে, নাকেশ্বরী কাহাকেও কিছু বলে না, বলিতেও পারে না। যাহা হউক, এক বৎসর পরে ধন ছাড়িয়া নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘ্যাঘোঁ ভূতের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হয়, তখন লোকে কত না ভাঙ্‌চি দিয়াছিল।''

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভাঙ্‌চি কেন দিয়াছিল, মহাশয়?'

স্কল বলিলেন,—'তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজ্ঞাসা কর। বিবাহে ভাঙ্‌চি দিলে যেমন আমোদটী হয়, এমন আমোদ আর কিছুতেই হয় না। তুমি একটি পাত্র কি পাত্রী স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মত জিজ্ঞাসা কর; তাঁরা বলিবেন,— 'দিবে দাও! কিন্তু—'। ঐ যে 'কিন্তু' কথাটী, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যা বলি আর যা কই, ঘ্যাঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙ্‌চি দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয়!'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ভাঙ্‌চি আবার চমৎকার কি, মহাশয়?'

স্কল উত্তর করিলেন,—'সাত কাণ্ড,—সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই,—তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড তুমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি,—শুন। ঘাঁঘোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটী ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘ্যাঁঘোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘ্যাঁঘোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটস্থ একটি বিলের জলে স্নান করিতে যাইলেন। সেইখানে প্রতিবাসী ভূতগণও পরামর্শ করিয়া স্নান করিতে যাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, আগন্তুক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমার নিবাস একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে, বৌ-ভুলুনি নামক আঁব গাছে।' ঘ্যাঁঘোঁর প্রতিবাসী ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখানে কি মনে করিয়া আগমন হইয়াছে?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘ্যাঁঘোঁকে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবাসী ভূতগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়, তবে কি বৈদ্য? আগন্তুক ভূত বলিলেন,—'কেন? বৈদ্য কেন হইব? ঘ্যাঁঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না-কি?' প্রতিবাসী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—'না না! এমন কিছু নয়! তবে একটু একটু খুক্ খুক্ করিয়া কাসি আছে, তাহার সহিত অল্প অল্প আলকাতরার ছিট থাকে, আর বৈকাল বেলা যৎসামান্য ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়। তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে খাইতে ভাল হইয়া যাইবে।' এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ভূতের তো চক্ষুস্থির! আর তিনি ঘ্যাঁঘোঁর কাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাকেশ্বরীর মাসীকে সকল কথা বলিলেন। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটি সুন্দরী ভূতিনী। তাহার রূপে ঘ্যাঁঘোঁ একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল! কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তারপর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধকূপের ভিতর বসিয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে, তাহাই সুখের কথা।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'শ্লেষ্মার সহিত আলকাতরা কি?'

স্কল বলিলেন,—'তোমাদের যেরূপ রক্ত, আমাদের সেইরূপ আলকাতরা। কাসরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকাতরা বাহির হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যদি আমাদিগের মত ভূতদিগের রোগ হয়, তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায়? আচ্ছা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?'

স্কল উত্তর করিলেন,—'কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়? সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে!'

আমি বলিলাম,—'মারবেল হয়! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে মারবেল হয় কেন?'

স্কল আমার এই কথায় কিছু রাগতঃ হইয়া বলিলেন,—'ভুল হইয়াছে! তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তারপর আমাদের মরা উচিত! এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।'

আমি বলিলাম,—'মহাশয়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তো আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, — ভূত মরিয়া যদি মারবেল হয়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া খেলা করা তো বড় বিপদের কথা?'

স্কল উত্তর করিলেন,—'মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে আবার দোষ কি? হাঁ! জীয়ন্ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে!'

স্কল পুনরায় বলিলেন,—'তোমার সহিত আর আমাদের মিছামিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি, এখন গিয়া কোম্পানীর কাজ করি। আমরা 'স্কল, স্কেলিটন এবং কোম্পানী'। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি, সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে। এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না।'

এই বলিয়া স্কল ও স্কেলিটন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বসিয়া রহিলাম।

তাহার পর কি করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশ্যক নাই। কঙ্কাবতী। কথা এই। এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্বরীর টাকা লই, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে। পতিপরায়ণা সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি?'

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অতি ভয়াবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপূরিত হইল। অট্টালিকা কাঁপিতে লাগিল। দ্বার গবাক্ষ পরস্পরে আঘাতিত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অট্টালিকা ঘোর অন্ধকার আচ্ছাদিত হইল। প্রজ্বলিত বাতিটি নির্বাণ হইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছেন।'

কঙ্কাবতী এতক্ষণ শয্যার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বারটী উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর দ্বারের উপর সমুদয় শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেশ্বরীকে তিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না!

অতি দুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, ঘন ঘন ঘোর গভীর শব্দে, ঘর পরিপূরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দূর হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল। তখন কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, খেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কঙ্কাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ওগো! তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। ওগো! আমি বড় দুঃখিনী, আমি কাঙ্গালিনী কঙ্কাবতী। কত দুঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণসম পতিকে পাইয়াছি। পৃথিবীতে এই পতি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। ওগো! আমার স্বামীকে না মারিয়া তুমি আমার প্রাণ বধ কর। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার পতিকে লইয়া আমি ঘরে যাই। তোমার যাহা কিছু টাকা লইয়াছি, সব ফিরিয়া দিব। মানুষ খাইতে যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, তুমি আমাকে খাও, তুমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও না, স্বামীকে আমার দেশে ফিরিয়া যাইতে দাও।'

নাকেশ্বরীর পা ধরিয়া কঙ্কাবতী এইরূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সে খেদের কথা শুনিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। নাকেশ্বরীর মনে কিন্তু কিছুমাত্র দয়া হইল না, নাকেশ্বরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, আর নাকেশ্বরী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে,—'দূর! দূর!'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ও গো! আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্বামীকে দাও, আমি এখান হইতে এখুনি দূর হইতেছি। স্বামী স্বামী! উঠ। চল আমরা এখান হইতে যাই; স্বামী উঠ!'

কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন করিয়া নাকেশ্বরী তত বলে—'দূর, দূর!'

কঙ্কাবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর আরক্তনয়নে দর্পের সহিত নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—'আমার স্বামীকে দিবে না। আমাকেও খাইবে না? কেবল—'দূর দূর'! মুখে অন্য কথা নাই? বটে। তা নাকেশ্বরী হও, আর যাই হও? আজ তোমার একদিন, কি আমার একদিন!'

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উন্মাদিনীর ন্যায়, কঙ্কাবতী নাকেশ্বরীকে ধরিতে যাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া নাকেশ্বরী কেবলমাত্র একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের প্রবলবেগে কঙ্কাবতী একেবারে দ্বারের নিকট গিয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আর কঙ্কাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

তখন কঙ্কাবতী আস্তে-ব্যস্তে পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—'ওগো! তোমাকে আমি আর ধরিতে যাইব না, তোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার স্বামীকে আর ফিরিয়া চাই না। এখন কেবল এই চাই যে, স্বামী

হইতে তুমি আমাকে পৃথক করিও না। স্বামীর পদযুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে মার, যদি খাইবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে খাও। আর তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনাটী করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না।'

এই বলিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় ঘরের দিকে দৌড়িলেন। কোনও কথা না বলিয়া নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ছাড়িল, আর কঙ্কাবতী একেবারে পর্বতের বাহিরে বনের মাঝখানে গিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—ব্যাঙ-সাহেব

বনের মাঝে কঙ্কাবতী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। শরীরে নানা স্থান হইতে শোণিতধারা বহিতেছিল। কঙ্কাবতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন? স্বামীর নিকট যাইতে গেলেই নাকেশ্বরী আবার তাঁহাকে নিশ্বাসের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িয়া কঙ্কাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই দুঃখ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—'আচ্ছা! তাই ভাল। স্বামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদযুগল ধ্যান করিতে করিতে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কঙ্কাবতী স্বামীর পা দুটি মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন,— উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ, অল্প-আয়তন, চম্পককলিসদৃশ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট সে পা দুখানি মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

একাবিষ্ট চিত্তে এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় কঙ্কাবতীর মনে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—'ভাল! ভূতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মনুষ্যের মন্দ করিলে, তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেকগুণী মনুষ্য আছেন, তাঁহারা মন্ত্র জানেন, তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন। কেন বা আমার স্বামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন? আর, যদি একান্তই আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা না হয়, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব। তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিলেও আমি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিব। যাহা হউক, আমি আমার স্বামীকে নাকেশ্বরীর হাতে হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব,—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক? আমি কি মানুষ নই? পতির হিতকামনায়, আমি সমুদয় জগৎকে তৃণ জ্ঞান করি,—কাহাকেও আমি ভয় করি না।'

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কঙ্কাবতী চক্ষু মুছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জানেন না। উত্তরমুখে যাইতে খেতু বলিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর কোন্ দিক? বিস্তীর্ণ তমোময় সেই বনকান্তারে দিক্ নির্ণয় করা তো সহজ কথা নহে! রাত্রি এখনও প্রভাত হয় নাই, সূর্য এখনও উদয় হন নাই; তবে কোন্ দিক্ উত্তর, কোন্ দিক্ দক্ষিণ, কিরূপে তিনি জানিবেন?

তাই তিনি ভাবিলেন,—'যে দিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালয়ে গিয়া সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কালবিলম্ব করলে আমার আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।'

বনজঙ্গল, গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কতদূর চলিয়া গেলেন কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জনমানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

'কি করি, কোন্ দিকে যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি' কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে একটি ব্যাঙ দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলেন, ব্যাঙ সাহেবের পোষাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রংটী

কেবল ব্যাঙের মত আছে, সাবাং মাখিয়াও রংটী সাহেবের মত হয় নাই। আর, পায়ে জুতা নাই। জুতা এখনও কেনা হয় নাই, ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন! আপাততঃ সাহেবের সাজ পরিয়া দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া, সদর্পে ব্যাঙ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া, এই ঘোর দুঃখের সময়েও কঙ্কাবতীর মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, 'ইঁহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে গিয়া পৌঁছিব?' ব্যাঙ উত্তর করিলেন, 'হিট, মিট ফ্যাট।'

কঙ্কাবতী বলিলেন, 'ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?'

ব্যাঙ বলিলেন,—'হিশ্ ফিশ্ ড্যাম্।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।'

ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে 'নেটিব' মনে করিবে। যখন দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাঙ বলিলেন,— 'কোথাকার ছুঁড়ী রে তুই? আ গেল যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই! কেন? সাহেব বলিতে তোর কি হয়?'

কঙ্কাবতী বলিলেন, 'ব্যাঙ সাহেব! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।'

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, — 'মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি? আমার নাম, মিষ্টার গমীশ।'

কঙ্কাবতী বলিলেন, 'মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে, মিষ্টার গমীশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন্ দিক দিয়া, তাহা আমাকে বলিয়া দিন্। আমার নাম কঙ্কাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতিমাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন—কোন্ দিক দিয়া আমি গ্রামে যাই।'

কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'সাহেব' বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'মিষ্টার গমীশ' বলিয়া ডাকিলেন, সে জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি সাহেব হইয়াছি কেন তা জান?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞা না! তা আমি জানি না। মহাশয়! গ্রামে কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয়? গ্রাম এখন হইতে কত দূর?'

ব্যাঙ বলিলেন,—'দেখ লঙ্কাবতী! তোমার নাম লঙ্কাবতী বলিলে বুঝি? দেখ লঙ্কাবতী! একদিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়াছিলাম। হাতী সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম আমার মান-মর্য্যাদা রাখিয়া, আমাকে ভয় করিয়া, হাতী অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্ধার কথা শুন! দুষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। রাগে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সশঙ্কিত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে

বলিলাম, — 'উট-কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে?' কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লঙ্কাবতী?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমার নাম কঙ্কাবতী; 'লঙ্কাবতী' নয়। আপনি উত্তম বলিয়াছেন, গ্রামে যাইবার পথ আপনি বলিয়া দিলেন না? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'শুন না! অত তাড়াতাড়ি কর কেন? দুষ্ট হাতীর একবার কথা শুন। আমি রাগিয়াছি। দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয় হইল না। হাতীটি উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়ানাকী, ধর্মে রেখেছে তোরে।' হাঁ কঙ্কাবতী! আমার কি থ্যাবড়া নাক?'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি, এই ভেকটীরও সেই অভিমান।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'না, না। কে বলে আপনার থ্যাবড়া নাক? আপনার চমৎকার নাক! মহাশয়! এই দিক দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয়?'

কিছুক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঙ একটু চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কখন পথ বলিয়া দেন, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কঙ্কাবতী ব্যাঙের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, অবশেষে ব্যাঙ বলিলেন, – 'তবে বোধ হয়, কথার মিল করিবার নিমিত্ত হাতী আমাকে 'থ্যাবড়া-নাকী' বলিয়াছে! কারণ, এই দেখ না? আমার কথায়, আর হাতীর কথায় উত্তম মিল হয়—

উট-কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে?

থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া-নাকী ধর্মে রেখেছে তোরে।

কঙ্কাবতী! কবিতাটী খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না? কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাবড়া নাকের কথা আছে। তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনিলে তো এখন? হাতীর একবার আস্পর্ধার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেই জন্য এই সাহেবের পোষাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে, আর বলিবে, 'ও গাড়ীতে সাহেব রহিয়াছে! কেমন কঙ্কাবতী? এ পরামর্শ ভাল নয়?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'উত্তম পরামর্শ! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন্। আর যদি না দেন, তো বলুন আমি চলিয়া যাই।'

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি বলিলে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব। গ্রাম এখান হইতে কত দূর? কতক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছিব?'

ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ত্রৈরাশিক জান?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'অল্প অল্প জানি।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'তবে শ্লেট পেন্সিল নাও।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! এ সময়ে আমার সহিত বিদ্রূপ করিবেন না। শোক সাগরে আমি এখন নিমগ্ন। দুঃখে এখন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। আমার সহিত এখন অধিক কথা কহিবেন না। গল্প করিবার আমার এ সময় নয়। পথ বলিয়া দিন, চলিয়া যাই। পতির প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রতিকার করি।'

ব্যাঙ উত্তর করিলেন, —''আমি বিদ্রূপ করি নাই। অঙ্ক না কষিয়া কি করিয়া বলি, — তুমি কতক্ষণে গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে? যাহা হউক, তোমার কাছে শ্লেট পেন্সিল না থাকে তো মুখে মুখে কষিলেই হইবে। তবে একবার লাফাও দেখি! এক লাফে কত দূর যাইতে পার দেখি! এইগুলি সব ত্রৈরাশিকের রাশি। এইগুলি পাইলে হিসাব করিয়া

বলিব,—তুমি কতক্ষণে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে। কারণ, সকলকার লাফ তো আর সমান নয়।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! আপনাদিগের মত আমরা লাফাইয়া পথ চলি না। আমি লাফাইতে জানি না।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'ঐ তো দোষ! এখন ত্রৈরাশিকের রাশি কোথা পাই? কঙ্কাবতী! তুমি তার কিছু সন্ধান জান? মাটির ভিতর গর্তে তো নাই? গাছের কোটরে তো নাই? কঙ্কাবতী! তুমি গিয়া ত্রৈরাশিকের রাশি তিনটিকে ধরিয়া আনিতে পার?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমি তা জানি না, আমাকে আপনি পথ বলিয়া দিন!'

ব্যাঙ বলিলেন,—'তবে এই অঙ্কটা কষিয়া আমাকে উত্তর বল। যদি দুই জন লোকে দুই দিনে এক হাত প্রাচীর গাঁথে, তাহা হইলে দুইহাজার লোক এক হাত প্রাচীর কতদিনে গাঁথিবে?'

কঙ্কাবতী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—উত্তর ১/৫০০, একদিনের পাঁচশত ভাগের এক ভাগ।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'ভুল! যদি চব্বিশ ঘণ্টাও দিন ধরি, তাহা হইলে তোমার উত্তরে তিন মিনিট হয়। গাঁথিতে তো হইবে,—এক হাত প্রাচীর; এ দুহাজার লোক দাঁড়ায় কোথা যে, তিন মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা করিবে?'

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন,—'সত্য বটে, এই দুই সহস্র লোক কোথায় দাঁড়াইয়া প্রাচীর গাঁথিবে?'

তাহার পর ব্যাঙ বলিলেন,—'যখন এ অঙ্কটি ভাল করিয়া কষিতে পারিলে না, তখন আর একটি অঙ্ক তোমাকে কষিতে হইবে। মনে কর যে, আমার একটি আধুলি, আছে। আমি সেটি একজনকে ধার দিলাম। কিস্তীবন্দী করিয়া সে ধার শোধ দিবে,—তাহার সহিত এইরূপ নিয়ম হইল, প্রতিদিন হিসাব হইবে, যাহা কিছু বাকি থাকিবে তাহার সে অর্ধেক দিয়া যাইবে, কঙ্কাবতী! বল, কয় দিনে সে আমার আধুলিটা পরিশোধ করিবে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন—'এটি সহজ আঁক। ছয়দিনে সমুদয় শোধ হইয়া যাইবে।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া এখন আমার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আচ্ছা, কি করিয়া ছয় দিনে শোধ যাইবে? তাহা আমাকে বুঝিয়া বল।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আধুলির অর্ধেক চারি আনা, প্রথম দিন সে চারি আনা দিবে। বাকি রহিল,—চারি আনা; চারি আনার অর্ধেক দুই আনা, দ্বিতীয় দিনে সে দুই আনা দিবে। বাকি রহিল,—দুই আনা, দুই আনার অর্ধেক এক আনা, তৃতীয় দিনে সে এক আনা দিবে। বাকি রহিল,—এক আনা। এক আনার অর্ধেক দুই পয়সা, চতুর্থ দিনে সে দুই পয়সা দিবে। বাকি রহিল,—দুই পয়সা; দুই পয়সার অর্ধেক এক পয়সা, পঞ্চম দিনে সে এক পয়সা দিবে। বাকি রহিল,— এক পয়সা। ষষ্ঠ দিনে সেই পয়সাটী দিয়া দিলেই সব শোধ হইয়া যাইবে।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'তাহা কি করিয়া হইবে? ষষ্ঠ দিনে সে পুরাপুরি এক পয়সা দিবে কেন? যাহা বাকি থাকিবে তাহার সে অর্ধেক দিবে তো? এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন সে আমাকে পাঁচ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন স-কড়া, তার পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক—'

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-সুরে ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—'ওগো! মা গো! এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটী যে, আর কখন পুরোপুরি হবে না গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো? জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো। ওগো তা লইয়া মানুষে যে কত ঠাট্টা করে গো! 'ব্যাঙের আধুলি', 'ব্যাঙের আধুলি' বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! আমার কি হ'ল গো!'

ব্যাঙ সুর করিয়া, বিনিয়ে বিনিয়ে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! কাঁদিবেন না, চুপ করুন, ধৈর্য ধরুন।'

ব্যাঙ পুনরায় সুর তুলিলেন, 'ওগো! আমার যে ঐ আধুলিটী বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো।'

কঙ্কাবতী বলিলেন, 'ছি মহাশয়! চুপ করুন, কাঁদিতে নাই। আপনি সাহেব মানুষ। কত আধুলি আপনি উপার্জন করিবেন।'

ব্যাঙ পুনরায় সুর ধরিলেন,—'ওগো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্ব গেল গো! ওগো মা গো!''

কঙ্কাবতী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, হাতে মুখে জল দিয়া শান্ত করিলেন।

অবশেষে ব্যাঙ আধ-কান্না সুরে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন,—'ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম, দুই দণ্ড বসিয়া তোমার সঙ্গে গল্পগাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো! ওগো তুমি ঐ দিক্ দিয়া যাও গো; তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছুতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিবে না গো! ওগো তোমরা যে আমাদের মত লাফাইতে পার না গো! ওগো তোমরা যে গুটি গুটি চলিয়া যাও গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে হাসি পায় গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে কান্না পায় না গো! ওগো তুমি যে মেয়েটী ভাল গো! ওগো লেখাপড়া শিখিয়া তুমি যে মদ্দা-মেয়েমানুষ হওনি গো! ওগো তুমি যে ধীর শান্ত, লজ্জাশীলা পতিপরায়ণা গো! ওগো! তুমি যে মদ্দা-মেয়েমানুষ কি মেয়েজ্যাঠা নও গো! ওগো! আমার যে আধুলিটী এইবার জন্মের মত গেল গো! ওগো! আমার কি হইল গো! ওগো মা গো!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—পচাজল

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'একে আমার দুঃখে মরি, তাহার উপর এ আবার এক জ্বালা! যাহা হউক, ব্যাঙের কান্না এখন একটু থামিয়াছে, এইবার আমি যাই।'

ব্যাঙ যেরূপ বলিয়া দিলেন, কঙ্কাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পারিলেন না। যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, আর চলিতে পারিলেন না। বনের মাঝখানে একখানি পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতেছেন, এমন সময় মৃদু মন্দ মধুর তানে গুন্ গুন্ করিয়া কে তাঁহার কানে বলিল,—'তোমরা কারা গা? তুমি কাদের মেয়ে গা?'

কঙ্কাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটি অতি ক্ষুদ্র মশা তাঁহার কানে কানে এই কথা বলিতেছে! মশাটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সেটী নিতান্ত বালিকা-মশা।

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, 'আমি মানুষের মেয়ে গো! আমার নাম কঙ্কাবতী!'

মশা-বালিকা বলিলেন, 'মানুষের মেয়ে! আমাদের খাবার? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন? খাই বটে, কিন্তু মানুষ কখনও দেখি নাই। আমরা ভদ্রমশা কি— না? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কখনও মানুষ দেখি নাই। কিরূপ গাছে মানুষ হয়, তাহাও আমি জানি না। কৈ? দেখি দেখি! মানুষ আবার কিরূপ হয়!'

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কঙ্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মশা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ধাড়ি মানুষ নও, বাচ্ছা মানুষ;—না?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'নিতান্ত ছেলেমানুষ নই, তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।'

মশা-বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম কি বলিলে?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আমার নাম কঙ্কাবতী!'

মশা-বালিকা বলিলেন,—'ভাল হইয়াছে। আমার নাম রক্তবতী। ছেলেবেলা রক্ত খাইয়া পেটটী আমার টুপটুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাখিয়াছেন, — রক্তবতী। আমাদের দুই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর কঙ্কাবতী। এস ভাই! আমরা দুইজনে কিছু একটা পাতাই।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি! আমি এখন ঘোর মনো-দুঃখে আছি। আমি এখন পতিহারা সতী। তুমি বালিকা; সে সব কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইয়া আহ্লাদ-আমোদ করি, এখন আমার সে সময় নয়।'

রক্তবতী বলিলেন,—'তুমি পতিহারা সতী! তার জন্য আর ভাবনা কি? বাবা বাড়ী আসুন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন। এখন এস ভাই! কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি? আমি পচা-জল বড় ভালবাসি। যেখানে পচাজল থাকে, মনের সুখে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই, — পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত খেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পচাজল' পাতাই ব। তুমি আমার 'পাঁচাজল', আমি তোমার 'পচাজল'! কেমন! এখন মনের মতন হইয়াছে তো?'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ইহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। বুড়ো মিনসে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এতো একটী সামান্য বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের যাহা ইচ্ছে হয় করুক, আমি আর কোনও কথা কহিব না।'

কঙ্কাবতী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, তাহাই ভাল। আমি তোমার পচাজল, তুমি আমার পচাজল। হা জগদীশ্বর হে হৃদয়দেবতা! তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা!'

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী বার বার নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন।

পচাজলের দুঃখ দেখিয়া মশা-বালিকাটিরও দুঃখ হইল। মশা-বালিকাটী বুঝিতে পারেন না যে, তাঁর পচাজল এত কাঁদের কেন? গুন্ গুন্ করিয়া কঙ্কাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—'পচাজল! তোমার ভাই! আর দুটীপা কোথায় গেল? উপরের দুটী পা আছে, নীচের দুটী পা আছে, মাঝের দুটী পা কোথায় গেল? ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝি? ওঃ! সেইজন্য তুমি কাঁদিতেছ? তার আবার কান্না কি, পচাজল? খেলা করিতে করতে আমারও একটী পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টী পুনরায় গজাইতেছে। তোমারও পা সেইরূপ গজাইবে, চুপ কর,—কাঁদিও না!'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমার পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। তোমাদের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরূপ। পায়ের জন্য কাঁদি নাই।'

মশা-বালিকা পুনরায় গুন্ গুন্ করিয়া করিয়া উড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া,কঙ্কাবতীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কঙ্কাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—'একি ভাই, পচাজল! সর্বনাশ! তোমার নাক কোথায় গেল? তোমার নাকটী কে কাটিয়া নিল? আহা! তোমার নাক নাই তো খাবে কি দিয়া?'

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিলেন যে, সে শুঁড়ের কথা বলিতেছে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, যে, 'এ মশা-বালিকাটী নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'পচাজল আমাদের নাক এইরূপ। তোমাদের নাক যেরূপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়। আমরা নাক দিয়া খাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই!'

রক্তবতী বলিলেন,—'আহা! তবে পচাজল! তোমার কি দুরদৃষ্ট যে, আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখায়, দেখ দেখি? জলের উপব গিয়া আমি আমার মুখখানি দেখি, আর মনে মনে কত আহ্লাদ করি। মা বলেন যে, 'বড় হইলে আমার রক্তবতী একটী সাক্ষাৎ সুন্দরী হইবে।' তা ভাই পচাজল! তোমাকেও আমি সুন্দরী করিব। বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটী টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তখন তোমাকে বেশ দেখাইবে।'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'আবার সেই নাকের কথা। নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল, ব্যাঙ বলিয়াছিল, এই মশা-বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। তারপর সেই নাকেশ্বরীর নাক! উঃ কী ভয়ানক!

কঙ্কাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন,—'এই ঘোর দুঃখের সময় আমি বড় বিপদেই পড়িলাম। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না:—ওখানে ব্যাঙ, এখানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে

বিষম জ্বালাতনে ফেলিল। ব্যাঙের হাত এড়াইতে না-এড়াইতে মশার হাতে পড়িলাম। মশার একরত্তি মেয়েটা তো এই রঙ্গ করিতেছেন; আবার ইহার বাপ বাড়ী আসিয়া যে কি রঙ্গ করিবেন, তা তো বলিতে পারি না!'

রক্তবতী বলিলেন,—'ঐ যে পাতাটি দেখিতেছ, পচাজল! যার কোণটি কুঁকড়ে রহিয়াছে? উহার ভিতর আমাদের ঘর। আমার মা'রা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন মা। বাবা চরিতে গিয়াছেন, বাবা এখনি কত খাবার আনিবেন। যাই, মা'দের বলিয়া আসি যে, আমার পচাজল আসিয়াছে।'

এই বলিয়া রক্তবতী ঘরের দিকে উড়িয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে রক্তবতী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'পচাজল! মা তোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ, চল, আমার মার সঙ্গে দেখা করিবে।'

কঙ্কাবতী করেন কি? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর, সেই কোঁকড়ানো পাতাটির কাছে যাইলেন।

একটি নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,—''হাঁ গা বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্ত্তার এত বিষয়-বৈভব, তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর একমাত্র সন্তান। তা, হাঁ গা বাছা! রক্তবতী কি তোমার পতির কথা বলিতেছিল? কি হইয়াছে?'

কঙ্কাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'ওগো আমি বড় দুঃখিনী! আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে না পাই, তবে এ ছার প্রাণ কিছুতেই রাখিব না। আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয়ে যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে একটু যদি পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।'

মশানী বলিলেন,—'ছেলেমানুষ, বালিকা তুমি, তোমার কোনও জ্ঞান নাই! একে আমরা স্ত্রীলোক, তায় যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত মশার স্ত্রী; তাতে আমরা পর্দানশীন, কুলবধূ। আমাদিগের কি ঘরের বাহিরে যাইতে আছে, বাছা? না,—আমরা পথঘাট জানি? তুমি কাঁদিও না। কর্তা বাড়ী আসুন, কর্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের কুটুম্ব,—রক্তবতীর পচাজল। যাহা ভাল হয়, তোমার জন্য কর্তা অবশ্যই করিবেন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।'

কঙ্কাবতীর সহিত তিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, তিনি রক্তবতীর মা;— মশার ছোটরাণী। এইবার মশার বড়রাণী পাশ দিয়া একটু মুখ বাড়াইলেন।

বড় মশানী বলিলেন,—'ওটা একটা মানুষের ছানা বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলেপিলে নাই; অনেক দিন ধরিয়া আমার মনের সাধ আছে যে, জীবজন্তু কিছু একটা পুষি। তা ভাল হইয়াছে, ঐ মানুষের ছানাটা এখানে আসিয়াছে; ওটাকে আমি পুষিব। কিছু বড় হইয়াছে সত্য, তা যাই হউক, এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মানুষে শুনিয়াছি মেষ, ছাগল, পায়রা, এই সব খায়, আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মানুষের ছানাটাকে পুষিলে, ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে খাইতে তখন আর আমার ইচ্ছা হইবে না।'

মেজমশানী আর এক পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন,—'দিদি! তোমার যেমন এক কথা! মানুষের ছানাটাকে যদি পুষিবে তো যা'তে কাজে লাগে, এরূপ করিয়া পুষিয়া রাখ। মানুষে যেরূপ দুধের জন্য গরু পোষে, সেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাখ। কর্তা যতদূর হইতে রক্ত লইয়া আসেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসি হইয়া যায়। মানুষ একটি ঘরে পোষা থাকিলে, যখন ইচ্ছা হইবে, তখন টাট্‌কা রক্ত খাইতে পাইব।'

রক্তবতীর মা বলিলেন,—'তোমাদের সব এক কথা। সব তা'তেই তোমাদের প্রয়োজন। ছেলেমানুষ রক্তবতী, মানুষের ছানাটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে; পুষিতে কি খাইতে সে তোমাদিগকে দিবে কেন? ছেলের হাতের জিনিষটি তোমরা কাড়িয়া লইতে চাও। তোমাদের কিরূপ বিবেচনা বল দেখি? আসুন, আজ কর্তা আসুন, তাঁহাকে সকল কথা বলিব। এ সংসারে আর আমি থাকিতে চাই না। আমাকে তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিন। আমার বাপ

ভাই বাঁচিয়া থাকুক, আমার ভাবনা কিসের? আমি ছন্নছাড়া আঁটকুড়োদের মেয়ে নই। আমার চারিদিকে সব জাজ্বল্যমান।'

বড়মশানী বলিলেন—'আঃ মর! ছুঁড়ীর কথা শুন! বাপ-ভাইয়ের গরবে ওঁর মাটিতে আর পা পড়ে না। বাপ-ভাইয়ের মাথা খাও।'

এইরূপে তিন সপত্নীতে ধুন্ধুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। কঙ্কাবতী অবাক্! কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—'ভাল কথা! জীবজন্তুর মত ইহারা আমাকে পুষিতে চায়!'

তিন সতীনে ঝগড়া ক্রমে একটু থামিল। কখন মশা ঘরে আসিবেন, সেই প্রতীক্ষায় কঙ্কাবতী সেইখানে বসিয়া রহিলেন, অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁ গা! তোমাদের কর্তার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?'

ছোটরাণী বলিলেন,—'বাঁশ কাট্‌ছেন, ভার বাঁধছেন, রক্ত নিয়ে আসছেন পারা!'

অর্থাৎ কিনা, কর্তা হয় তো আজ অনেক রক্ত পাইয়াছেন। একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া ভার বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব সেইজন্য হইতেছে।

কঙ্কাবতী আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা ঘরে ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের কর্তা কখন আসিবেন গা? বড় যে বিলম্ব হইতেছে!'

এবার মধ্যমমশানী উত্তর দিলেন,—'তুঁষের ধোঁ, কুলোর বাতাস, কোণ নিয়েছেন পারা।'

অর্থাৎ কিনা,—চরিবার নিমিত্ত কর্তা হয় তো কোনও লোকের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। সে লোক তুঁষের অগ্নি করিয়া তাহার উপর সূর্পের বাতাস দিয়া, ঘর ধূমে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কর্তা গিয়া ঘরের এক কোণে লুক্কায়িত হইয়াছেন, বাহির হইতে পারিতেছেন না। সেইজন্য বিলম্ব হইতেছে।—একটু ধূম কমিলে বাহির হইয়া আসিবেন।

কঙ্কাবতী আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৈ গা! তিনি তো এখনও এলেন না। আর কত বিলম্ব হইবে?'

এইবার বড়মশানী উত্তর করিলেন,—'কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়, ম'রে গিয়েছেন পারা!'

অর্থাৎ কিনা,— কর্তা হয়তো কোনও লোকের গায়ে বসিয়াছিলেন। গায়ে বসিয়া যেমন কটাস্ করিয়া কামড় মারিয়াছেন, আর অমনি সে লোকটী একটী চটাস্ করিয়া চাপড় মারিয়াছে। সেই চাপড়ে কর্তা হয় তো মরিয়া গিয়াছেন।

'কর্তা মরিয়া গিয়াছেন,' এইরূপ অকল্যাণের কথা শুনিয়া ছোটরাণী ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'তোমার যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আসুন কর্তা! তাঁরে বলি যে, 'তুমি মরিয়া গেলে, তোমার বড়রাণীর হাড়ে বাতাস লাগে।' তোমার মুখে চুণ-কালি দিয়া, তোমার মাথা মুড়াইয়া, তোমার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, তোমাকে এখনি বিদায় করিবেন।'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—মশা প্রভু

তিন সতীনে পুনরায় ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কলহের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আসিলেন। ঘরে কলহ-কচকচির কোলাহল শুনিয়া, মশার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মশা বলিলেন,—'এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝগড়ার জ্বালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাক-চিল বসিতে পারে না। যেখানে এরূপ বিবাদ হয়, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না,—তালুকে মনুষ্যদিগের শরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়; ইচ্ছা হয় যে, গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিষ খাইয়া মরি। আত্মহত্যা করিয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্মে ধর্মে আমার প্রাণটী রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমখোরের গায়ে বসিয়াছিলাম।

তাহার রক্ত কি তিক্ত! এক শুঁড় রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ রক্ষা হইল। মনে করিলাম, অপঘাত মৃত্যুতে মরিব? তাই এত কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জ্বালায় এত জ্বালাতন হইয়াছি যে, বাঁচিতে আর আমার তিলমাত্র সাধ নাই।'

এইরূপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ পড়িলে, তিনি একটু সুস্থির হইলে, রক্তবতী গিয়া তাঁহার কোলে বসিলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—'বাবা! আমার পচাজল আসিয়াছে।'

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে আবার কে? পচাজল আবার কি?'

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—'ওগো! একটী মানুষের মেয়ে। সন্ধ্যা হইতে এখানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! মেয়েটী এখানে আসিয়া পর্যন্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আমি পতিহারা সতী! আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। আমি লোকালয়ে যাইব, যেখান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি তাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেক্ষা কর। কর্তাটী বাড়ী আসুন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপায় করা যাইবে। তুমি যখন রক্তবতীর পচাজল হইয়াছ, তখন তোমার দুঃখ মোচন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।' রক্তবতীর পচাজল হইবে, রক্তবতী পচাজলকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবে, তোমার আর দুইটি রাণীর প্রাণে তা সহিবে কেন? তাঁদের আবার ঐ মানুষের ছানাটীকে পুষিতে সাধ হইল। সেই কথা লইয়া আমাকে তাঁরা, যা-না-তাই বলিলেন। তা, আমার আর এখানে থাকিয়া আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। দিয়া, দুই রাণী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর। আমি তোমার কণ্টক হইয়াছি, আমি এখান হইতে যাই।'

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে মানুষের মেয়েটী কোথায়?'

রক্তবতীর মা বলিলেন,—'ঐ বাহিরে বসিয়া আছে।'

রক্তবতী বলিলেন,—'বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায়, আমি এখনি দেখাইয়া দিব।'

মশা ও রক্তবতী দুই জনে উড়িলেন। বিষণ্ণবদনে, অশ্রুপূরিতনয়নে, যেখানে কঙ্কাবতী বসিয়াছিলেন, গুন্ গুন্ করিযা দুইজনে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—'পচাজল! এই দেখ বাবা আসিয়াছেন।'

কঙ্কাবতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মশাকে নমস্কার করিলেন। কঙ্কাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটি ঘাসের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটি ঘাসের ডগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সম্মুখে হাত যোড়করিয়া কঙ্কাবতী দণ্ডায়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! বিপন্ন অনাথিনী বালিকা আমি। জনশূন্য এই গহন কাননে আমি একাকিনী, আমি পতিহারা সতী। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হস্তগত হইয়াছেন। আমাব পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন। আমি আপনার শরণ লইলাম।'

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কাহার সম্পত্তি?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'মহাশয়! পূর্বে আমি পিতার সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্যবালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দানবিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত—যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি দানবিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে পিতা মাতা আপন আপন বালিকাদিগকে দানবিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথিনী হইয়া আজ আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্বে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি।'

মশা বলিলেন, 'উঁহু! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি কোন মশার সম্পত্তি?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'কোন্ মশার সম্পত্তি। সে কথা ত আমি কিছু জানি না। কৈ? আমি তো কোন মশার সম্পত্তি নই!'

মশা বলিলেন,— 'রক্তবতী। তোমার পচাজল দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মত্ত': ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সঠিক সত্য সত্য কথার উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি করিয়া আমি উপকার করি?'

রক্তবতী বলিলেন,— 'ভাই পচাজল! বাবা যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, সত্য সত্য তাহার উত্তর দাও।'

মশা বলিলেন,—'শুন, মনুষ্য-শাবক! এই ভারতে যত নরনারী দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে মশা মহাশয় তোমার অধিকারী, তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয়, তুমি পলাইয়া আসিয়াছ। সেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ। তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি, কোন্ মশা তোমার গায়ে উপবিষ্ট হইয়া রক্ত পান করেন? তাঁহার নাম কি? তাঁহার নিবাস কোথায়? তাঁহার কয় স্ত্রী? কয় পুত্র? কয় কন্যা? পৌত্র দৌহিত্র আছে কি না? তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কোনও অধিকার আছে কি না? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাখিয়াছেন, কি তোমার হস্তপদাদি বন্টন করিয়া লইয়াছেন? যদি তুমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে সে বিভাগের কাগজ কোথায়? মধ্যস্থ দ্বারা তুমি বণ্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমিন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে? এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে, মানুষের আমার অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নরনারীগণের দেহে যা রক্ত আছে, তাহাই খায় কে? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত 'পচাজল' পাতাইয়াছ, সেইজন্য তোমাকে আমি একেবারে কিনিয়া লইতে বাসনা করি। তাহা যদি না করি, তাহা হইলে তোমার অধিকারী মশাগণ আমাব নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এখান হইতে তাঁহারা পুনরায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটী কথা বলি, এরূপ করিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে, মশাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি সুখে স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতে পারেন। শীঘ্রই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এক্ষণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, —'মহাশয়! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মনুষ্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশাদিগের মধ্যে যে মনুষ্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বণ্টিত হইয়া থাকে, তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি যে, আমি কোন্ মশাব সম্পত্তি?'

ক্রোধে মশা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন— 'না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকিটী! গায়ে কখনও মশা বসিতে দেখ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি ন্যাকা! পতিহারা সতী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!'

মশার এইরূপ তাড়নায় কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতীর পানে চাহিয়া, রক্তবতী চক্ষু টিপিলেন। সে চক্ষু-টিপুনীর অর্থ এই যে,—'পচাজল! তুমি কাঁদিও না। বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপ কর, বাবার রাগ এখনি পড়িয়া যাইবে।'

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। কঙ্কাবতীর কান্না দেখিয়া মশা আরও রাগিয়া উঠিলেন। মশা বলিলেন,—'এ কোথাকার প্যান্‌পেনে মেয়েটা র‍্যা। ভ্যানোর্ ভ্যানোর্ কবিয়া কাঁদে দেখ। আচ্ছা যে সব কথা এতক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না বলিলে! এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না? ভাল! এই যে সব মানুষ হইয়াছে, এই যে কোটি কোটি মানুষ ভারতে রহিয়াছে, এ সব মানুষ কেন? কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,— 'মানুষ কেন, কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? তা ত আমি জানি না।'

মশা বলিলেন—'এঃ। এ মেয়েটা নিতান্ত বোকা! একেবারে বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না। এই ভারতের মানুষগুলো বড় বোকা। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত। রক্তবতী শিশু বটে, কিন্তু এর চেয়ে আমার রক্তবতীর লক্ষগুণে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।

তুমি বল তো, মা রক্তবতী, ভারতের মানুষ কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে?'

রক্তবতী বলিলেন, 'কেন বাবা! আমরা খাব বলিয়া তাই হইয়াছে।'

মশা বলিলেন,—'এখন শুনিলে? ভারতের মানুষ কিসের জন্য হইয়াছে তা বুঝিলে?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞা হাঁ, এখন বুঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের সৃজন হইয়াছে।'

রক্তবতী বলিলেন,—'বাবা! আমার পচাজল মানুষের ছানা বই তো নয়! মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, তা সকল মশাই জানে। নির্বোধ মশাকে সকলে মানুষ বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে, 'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা মানুষ।' তা আমাদের মত পচাজলের বোধশোধ কেমন করিয়া হইবে? আমার পচাজলকে বাবা, তুমি আর বকিও না।'

মশা ভাবিলেন,—'সত্য কথা! মানুষের ছানাটাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।

মশা জিজ্ঞেস করিলেন,—'বলি হাঁগো মেয়ে! এখন তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে বল দেখি? তা বলিতে পারিবে তো?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম কুসুমঘাটী। মশা তৎক্ষণাৎ আপনার অনুচরদিগকে কুসুমঘাটী পাঠাইলেন ও কঙ্কাবতীর প্রভুগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। দূতগণ কুসুমঘাটীতে উপস্থিত হইয়া, অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, কঙ্কাবতীর অধিকারী তিনটি মশা। তাঁহাদের নাম, গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড ও বিকৃততুণ্ড। রক্তবতীর পিতার নাম দীর্ঘশুণ্ড। দূতগণ শুনিলেন যে, কঙ্কাবতীর অধিকারিগণের বাস 'আকাশমুখ' নামক শালবৃক্ষ। সেইখানে যাইয়া কঙ্কাবতীর অধিকারিগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন। তাঁহারা দূতগণের সহিত আসিয়া অবিলম্বে দীর্ঘশুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদানুবাদ অনেক দর কষা-কষির পর, তিন ছটাক নররক্ত দিয়া, কঙ্কাবতীকে দীর্ঘশুণ্ড কিনিয়া লইলেন। কঙ্কাবতীকে ক্রয় করিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন,—'রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচাজল নাও! এ মানুষের ছানাটী এখন আমাদের নিজস্ব, ইহা এখন আমাদের সম্পত্তি।'

দীর্ঘশুণ্ড, তাহার পর, গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড, বিকৃততুণ্ড প্রভৃতি মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মহোদয়গণ! আমি দেখিতেছি, আমাদের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। ভারতবাসীগণের রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এতদিন সুখেস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালাপানি, এক দিকে অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী। জীবজন্তুগণকে লোকে যেরূপ বেড়া দিয়া রাখে, ভারতবাসিগণকে এতদিন আমরা সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া এতদিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীতভাবে শোণিত দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ কার্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাসীগণকে যে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আবার, ভারতবাসীদিগের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আজকাল কিছু অধিক হইয়াছে। এই দেখুন, আজ সন্ধ্যাবেলা কুসুমঘাটী হইতে একটি মনুষ্যশাবক আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্যশাবকটী আপনাদের সম্পত্তি। আজ আপনার সম্পত্তি পলাইবে, কা'ল আমার সম্পত্তি পলাইবে। এই প্রকারে মনুষ্যেরা যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর আবার বুঝিয়া দেখুন, দেশভ্রমণের কি ফল! দেশভ্রমণ করিলে মনুষ্যেরা নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মনুষ্যদিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যগণ আর আমাদের বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে তাহারা ধনবান্ হইয়া উঠিবে। তখন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া, রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশ গমনাগমন না করিতে পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরূপ উপায় সত্বর আমাদিগকে করিতে

হইবে।'

দীর্ঘশুণ্ডের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘশুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘশুণ্ডের অতি দূরদৃষ্টি, এরূপ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে না পারে, এরূপ উপায় করা অবশ্য কর্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। মশাগণ অনেক অনুধাবনা—অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটি ভাল বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, তবে লোকে সে বিধি প্রতিপালন করিবে; তা না হইলে লোকে মানিবে না। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমাগত মশাবৃন্দ ভারতের মহা মহা পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে দীর্ঘশুণ্ড তাঁহাদিগকে মশাকুল-অনুমোদিত শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহাপাতক হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে কলিকালে ভারতবাসিগণ করিবে কি? কলিকালে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে—-

সদা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ ব্যংশুকাঃ পিহিতেক্ষণাঃ।
ঘোরান্ধতমসে কূপে সন্তু ভারতবাসিনঃ।।
পিবন্তু রুধিরঞ্চৈষাং যাবন্তো মশকা ভুবি।
অদ্যপ্রভৃতি বৈ লোকে বিধিরেষ প্রবর্ত্তিতঃ।।

ইহার স্থূল অর্থ এই যে, কলিকালে ভারতবাসিগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া, হাত যোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।

এইরূপ মনের মত ব্যবস্থা পাইয়া মশাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পণ্ডিতগণ যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মশাগণও আপন আপন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—খর্বুর

দীর্ঘশুণ্ড মশা বলিলেন,—'রক্তবতী! এক্ষণে এই মনুষ্যশাবকটি তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।'

রক্তবতী বলিলেন,—''পিতা! ইনি আমার ভগিনী। ইহার সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িয়াছে। পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচাজল আমার সারা হইয়া গেল। যাহাতে আমার পচাজল আপনার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর।'

কি করিয়া কঙ্কাবতীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে, মশা আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। আগাগোড়া সকল কথা কঙ্কাবতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মশা শেষে বলিলেন,—'তুমি আমার রক্তবতীর পচাজল, সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমার স্নেহের উদয় হইয়াছে। তোমাকে আমরা কেহ আর খাইব না। স্নেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব; যাহাতে তুমি তোমার পতি পাও, সে জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার তালুকে খর্বুর মহারাজ বলিয়া একটি মনুষ্য আছে। শুনিয়াছি, সে নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে, মন্ত্র পড়িয়া মেঘে সে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শিলাবৃষ্টি পড় পড় হইলে সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে,—এ ডাইনী কি ডাইনী নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মনুষ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সে-ই উদ্ধার করিতে পারিবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তবে মহাশয়, আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট যাই। মহাশয়, স্বামী-শোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শূন্য দেখিতেছি। তাঁর প্রাণ রক্ষা হইবে, কেবল এই প্রত্যাশায় জীবিত আছি। তা না হইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ বিসর্জন দিতাম।'

মশা বলিলেন,—'অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়; তবে রও! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাহার পিঠে চড়িয়া আমরা সকলে এখনি খর্বুর মহারাজের নিকট গমন করিব।'

মশা এই বলিয়া আপনার নিকট, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে 'হাতি-ঠাকুর-পো হাতি-ঠাকুর-পো' বলিয়া অনেক সমাদর ও নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—'কাকা! আমি একটি মানুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমি পচাজলকে বড় ভালবাসি. আমার পচাজলও আমাকে বড় ভালবাসে।'

কঙ্কাবতী আশ্চর্য হইলেন! মশার ছোট ভাই, হাতী? প্রকাণ্ড হাতী! বনের সকলে তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া ডাকে।

রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন,—'ভায়া! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। রক্তবতী একটি মানুষের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। মেয়েটী পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার দুঃখে বড় দুঃখী। আমি তাই মনে করিয়াছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিই। খর্বুর মহারাজের দ্বারাই এ কার্য সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইচ্ছা যে, এখনি খর্বুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুষের মেয়েটী পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন, ভায়া, তুমি যদি কৃপা কর, তবেই হয়। আমাদিগকে যদি পিঠে করিয়া লইয়া যাও তো বড় উপকার হয়।'

হাতি-ঠাকুর-পো সে কথায় সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতী মশানীদিগকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভাই পচাজল, তুমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই, তবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, ভাই, এ জনমের মত তোমার পচাজল এই বিদায় হইল।'

রক্তবতীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, রক্তবতীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মশা ও কঙ্কাবতী দুই জনে হাতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে খর্বুরের বাটীতে গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, খর্বুর শয্যা হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ণ-বদনে আপনার দ্বারদেশে বসিয়া আছেন। একটু একটু তখনও অন্ধকার রহিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্র তখনও অস্ত যান নাই। খর্বুরের বিষণ্ণ মূর্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া খর্বুরের রাগ হইতেছে। খর্বুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—'এই চাঁদের একদিন আমি দণ্ড করিব। চাঁদকে যদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হইলে, খর্বুরের গুণ-জ্ঞান, তুক্‌তাক্‌, মন্ত্র-তন্ত্র, শিকড়-মাকড়, সবই বৃথা।'

মশা, কঙ্কাবতী ও হস্তী গিয়া খর্বুরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মশাকে দেখিয়া খর্বুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত যোড় করিয়া খর্বুর বলিলেন,—'মহাশয়! আজ প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া? প্রতিদিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার শুভাগমন হয়। আজ দিনের বেলা কেন? ঘরে কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আসিয়াছেন না কি? তাই কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন যে, তাঁহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া যাইবেন?'

মশা উত্তর করিলেন,—'না, তা নয়! সে জন্য আমি আসি নাই; কি জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছ কেন? এরূপ বিষণ্ণবদনে থাকা তো উচিত নয়! মনোদুঃখে থাকিতে তোমাদিগকে আমি বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের সুখে না থাকিলে, শরীরে রক্ত হয় না, সে রক্ত সুস্বাদু হয় না;

মনের সুখে যদি তোমরা না থাকিবে, পুষ্টিকর, তেজস্কর দ্রব্য সামগ্রী যদি আহার না করিবে, তবে তোমাদের রক্তহীন দেহে বসিয়া আমাদের ফল কি? তোমরা সব যদি নিয়ত এরূপ অন্যায় কার্য করিবে, তবে আমরা পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিপালন করি? তোমাদের মনে কি একটু ত্রাস হয় না যে, আমাদের গায়ে বসিয়া মশাপ্রভু যদি সুচারুরূপে রক্তপান করিতে না পান, তাহা হইলে, তিনি আমাদিগের উপর রাগ করিবেন?'

খর্বুর বলিলেন,—'প্রভু! আমি শীর্ণ হইয়া যাইতেছি সত্য। আমার শরীরে ভালরূপ সুস্বাদু রক্ত না পাইলে, মহাশয় যে রাগ করিবেন, তাহাও জানি! কিন্তু কি করিব, কেবল স্ত্রীর তাড়নায় আমার এই দশা ঘটিতেছে।'

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন? কি হইয়াছে? তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করেন?'

খর্বুর উত্তর করিলেন,—'প্রভু! আমাদের স্ত্রী-পুরুষে সর্বদা বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে দুই তিন বার মারামারি পর্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর মহাশয়কে কি বলিব! আমি হইলাম তিন হাত লম্বা, আমার স্ত্রী হইলেন, সাত হাত লম্বা। যখন আমাদের মারামারি হয়, তখন আমার স্ত্রী নাগরা জুতা লইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া আমার মস্তকে প্রহার করেন। আমি ততদূর নাগাল পাই না; আমি যা মারি, তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রী প্রহারের চোটে অবিলম্বেই আমি কাতর হইয়া পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না; সুতরাং স্ত্রীর নিকটে আমি সর্বদাই হারিয়া যাই। একে মার খাইয়া, তাতে মনঃক্লেশে শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে; দেহে আমার রক্ত নাই। সে জন্য মহাশয় রাগ করিতে পারেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব? আমার অপরাধ নাই।'

মশা বলিলেন,—'বটে! আচ্ছা, তুমি এক কর্ম কর। আজ হাতীভায়ার পিঠে চড়িয়া তুমি স্ত্রীর সহিত মারামারি কর।'

এই বলিয়া মশা খর্বুরকে হাতীটি দিলেন। খর্বুর হাতীর পিঠে চড়িয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া স্ত্রী সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইল। খর্বুর আজ হাতীর উপর বসিয়া মনের সুখে ঠন্ ঠন্ করিয়া স্ত্রীর মাথায় নাগরা জুতা মারিতে লাগিলেন। আজ স্ত্রী যাহা মারেন, খর্বুরের গায়ে কেবল সামান্য ভাবে লাগে। যখন তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, মশার তখন আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মশার হাত নাই যে, হাততালি দিবেন, নখ নাই যে নখে নখে ঘর্ষণ করিবেন! তাই তিনি কখনও এক পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও দুই পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও গুন্ গুন্ করিয়া 'নারদ নারদ' বলিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই আজ খর্বুরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। খর্বুরের মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। খর্বুরের ধমনী ও শিরায় প্রবলবেগে আজ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা, সেই রক্ত একটু চাখিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন, —'বাঃ! অতি সুমিষ্ট, অতি সুস্বাদু।'

মশা মহাশয়কে খর্বুর শত শত ধন্যবাদ দিলেন ও কি জন্য তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরীর বিবরণ মশা মহাশয় আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া খর্বুর বলিলেন,—'আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে আমি ইঁহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন, আমাকে সেই নাকেশ্বরীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেশ্বরী!'

মশা বলিলেন,—'এবার চল! কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেঙ্গুন, কোথায় বিলাত, এ-খানে ও-খানে সে-খানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব রেল-গাড়ী করিয়া এ-দেশ, ও-দেশ সে-দেশ করিতেছ। রও, এবারকার শাস্ত্র একবার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে।'

খর্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবারকার শাস্ত্রে আমাদের গমনাগমন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল না কি? গাছগাছড়া আনিতে যাইতেও, গাইব না?

মশা উত্তর করিলেন, — 'না! এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকূপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকূপে বসিয়া থাকিতে

হইবে। অন্ধকূপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটী খুলিলে, পাপ হইবে, জাতি যাইবে, আর 'এক-ঘোরে' হইয়া থাকিতে হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে মহাপাতক। শুধু মহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতি- মহাপাতক! কেমন! বড় যে সব জাহাজে চড়া, রেলে চড়া, লেখাপড়া শেখা, মশারি করা! এইবার?'

খর্বুর বলিলেন,—'আপনারা মহাপ্রভু! যেরূপ শাস্ত্র করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।'

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর হস্তীর পৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই প্রহরের সময় পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—খোক্কোশ

নাকেশ্বরী যখন খেতুকে পাইল, তখন খেতু একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান-গোচর আর তাঁহার কিছু মাত্র রহিল না। নিশ্বাস দ্বারা নাকেশ্বরী যে কঙ্কাবতীকে দূরীভূত করিল, খেতু তাহার কিছুই জানেন না।

খেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাকেশ্বরী মনে মনে ভাবিল,—'বহুকাল ধরিয়া অনাহারে আছি। ইষ্ট দেবতা ব্যাঘ্রের প্রসাদে আজ যদি এরূপ উপাদেয় খাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভালরূপে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। এমন সুখাদ্য একেলা খাইয়া তৃপ্তি হইবে না, যাই মাসীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।'

মাসী আসিতে আসিতে পাছে খাদ্য পচিয়া যায়, সেজন্য নাকেশ্বরী তখন খেতুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী মাসীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়ী অনেক দূর, সাত সমুদ্র তের নদী পার, সেই এক-ঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। সেখানে যাইতে, আবার মাসীকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইল।

মাসী বুড়ো মানুষ। মাসীর দাঁত নাই। খেতুর কোমল মাংস দেখিয়া মাসীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। মাসীর মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল।

খেতুর গা টিপিয়া টুপিয়া মাসী বলিলেন,—'আহা! কি নরম মাংস! বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ দুঠেঙো মানুষের মাংস খাইয়া উদর পূর্ণ করিব। মুণ্ডটার ঝোল হউক, পিঠের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অন্যান্য মাংস অম্বল করিয়া রাঁধা থাকুক, দুইদিন ধরিয়া আহার করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।'

মাসী-বোনঝিতে এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একটী গোল উঠিল। হাতীর বৃংহতিধ্বনি, মশার গুন্-গুন্, মানুষের কণ্ঠস্বর, পর্বতের বাহির হইতে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—'মাসী! সর্বনাশ হইল। মুখের গ্রাস বুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ী বুঝি ওঝা আনিয়াছে।'

মাসী বলিলেন,—'চল চল চল! দ্বারের উপর দুইজনে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াই!'

অট্টালিকার দ্বারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী পদপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল!

পর্বতের ধারে সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কখনও বা শুঁড়ে করিয়া ধূলারাশি লইয়া আপনার গায়ে পাউডার মাখিতে লাগিলেন। দোল খাইতে ইচ্ছা হইলে কখনও বা মনের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসীর পদতল দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেতুর নিকট সকলে গমন করিলেন। সকলে দেখিলেন যে, খেতু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞান অচৈতন্য। শরীরে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। কঙ্কাবতী তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া পা দুটী বুকে লইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন খর্বুর খেতুকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে খর্বুর বলিলেন,—'কন্যা কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিও না। তোমার পতি এখনও জীবিত আছেন। সত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। আমি এইক্ষণেই এ রোগের প্রতিকার করিতেছি।'

এই বলিয়া খর্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, খেতুর শরীরে শত শত ফুৎকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া খেতু যেভাবে পড়িয়া ছিলেন, সেইভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিলমাত্রও নড়িলেন চড়িলেন না।

খর্বুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'এ কি হইল! আমার মন্ত্র-তন্ত্র এরূপ কখনও তো বিফল হয় না! রোগী পুনর্জ্জীবিত হউক না হউক, মন্ত্রের ফল অল্পাধিক অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ যে আমার মন্ত্র-তন্ত্র শিকড়-মাকড় একেবারেই নিরর্থক হইতেছে, ইহার কারণ কি?'

খর্বুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু স্থির করিতে পারেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন,—'মশা-প্রভু! আসুন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে যাই' বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপারখানা কি?'

অট্টালিকা হইতে সকলে পুনর্বার বাহির হইলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, অভাগিনীর কপালে পতি যদি বাঁচিবেন তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন? তবে এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদপদ্মে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিবেন, অসীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিন্তাটী কথঞ্চিৎ তাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইয়া, সুড়ঙ্গের পথ দিয়া সকলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, আশ-পাশ, অগ্র-পশ্চাৎ, ঊর্ধ্ব-নিম্ন, দশ দিক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে খর্বুর আসিতে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া দেখেন যে ভূতিনীদ্বয় পদ প্রসারণ করিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। খর্বুর ঈষৎ হাসিলেন; আর মনে মনে করিলেন,—'বটে! তোমাদের চাতুরী তো কম নয়!'

এবার বাহির হইতে খর্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে ভূতিনীদ্বয় পদ উত্তোলন করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খর্বুর পুনরায় ঝাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশ্বরী আসিয়া খেতুর শরীরে আবির্ভূত হইল। খেতু বক্তা হইলেন, অর্থাৎ কি না খেতুর মুখ দিয়া ভূতিনী কথা কহিতে লাগিল! নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া খর্বুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে, — 'মনুষ্য ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছে, সে জন্য আমি ইহাকে কখনই ছাড়িতে পারি না, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।' খর্বুর পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি দ্বারা নাকেশ্বরীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা-ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী খেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু 'যাই যাই' বলে, তবু যায় না। 'এইবার যাই, এইবার চলিলাম' বার বার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া খর্বুর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। খর্বুর বলিলেন,—'যাবে না? বটে! আচ্ছা দেখি, এইবার যাও কি না!' এই বলিয়া তিনি একটী কুষ্মাণ্ড আনয়ন করিলেন। মন্ত্রপূত করিয়া, তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া কুমড়াটীকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন। খর্পরে কুমড়াটী রাখিয়া খর্বুর খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর কি! এমন সময় নাকেশ্বরী অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,— 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন না। আমি এখন সত্য সত্য সকল কথা বলিতেছি।'

খর্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি বলিবে বল? সত্য বল, কেন তুমি ছাড়িয়া যাইতেছ না? সত্য সত্য না বলিলে, এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।'

নাকেশ্বরী বলিল,—'আমি ছাড়িয়া গেলে কোনও ফল হইবে না। রোগী এখনি মরিয়া-যাইবে। রোগীর পরমায়ুটুকু লইয়া কচুপাতে বাঁধিয়া, আমি তাল গাছের মাথায় রাখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, মাসী আসিলে পরমায়ুটুকু বাটিয়া, চাটনী করিয়া দুই জনে খাইব। তা, পরমায়ু-সহিত কচুপাতটী বাতাসে তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়ুটুকু খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাইব যে রোগীকে আনিয়া দিব? সেই জন্য বলিতেছি যে, আমি ছাড়িয়া যাইলেই রোগী মরিয়া যাইবে।'

খর্বুর গুণিয়া গাঁথিয়া দেখিলেন যে, নাকেশ্বরী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কথা, মিথ্যা নয়। খর্বুর মনে মনে ভাবিলেন যে, 'এইবার প্রমাদ হইল। ইহার এখন উপায় কি করা যায়? পরমায়ু না থাকিলে পরমায়ু তো আর কেহ দিতে পারে না?'

অনেক চিন্তা করিয়া খর্বুর নাকেশ্বরীকে আদেশ করিলেন,—'যে ক্ষুদ্র পিপীলিকারা ইহার পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সে খুদে পিঁপড়েরা এখন কোথায়?'

নাকেশ্বরী গিয়া, তালতলায়, পাথরের ফাটলে, মাটির গর্তে, কাঠের কোঠরে, সকল স্থানে সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেও-পিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে, শুশুড়ে-পিঁপড়ে, টোপ-পিঁপড়ে যত প্রকার পিঁপড়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সকলকেই নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসি জিজ্ঞাসা করে,—'হাঁগা! খুদে-পিঁপড়েরা কোথায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?' খুদে-পিঁপড়ের তত্ত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোন্‌ঝির বিপদে মাসীও ব্যথিত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই বুড়ীর হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর মাসীর পায়ে ব্যথা হইল। তখন নাকেশ্বরীর মাসী মনে ভাবিল,—'ভাল দুঠেঙো মানুষের মাংস খাইতে আসিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি!'

অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে কানা-পিঁপড়ের সহিত নাকেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইল। কানা-পিঁপড়েকে নাকেশ্বরী খুদে-পিঁপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কানা-পিঁপড়ে বলিল,—'আমি খুদে-পিঁপড়েদের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাত হইতে মানুষের সুমিষ্ট পরমায়ুটুকু চাটিয়া-চুটিয়া খাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে-পিঁপড়েরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহবের পোষাক পরা একটী ব্যাঙ আসিয়া তাহাদিগকে কুপ কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল।'

অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া নাকেশ্বরী এই সংবাদটী খর্বুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত খর্বুর পুনরায় নাকেশ্বরীকে পাঠাইলেন। নাকেশ্বরী মনে করিল,—'ভাল কথা? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই খাটাইবে।' কিন্তু নাকেশ্বরী করে কি? কথা না শুনিলেই খর্বুর সেই কুমড়াটী বলিদান দিবেন। এদিকে তিনি কুমড়াটী কাটিবেন, আর ওদিকে নাকেশ্বরীর গলাটি দুই খানা হইয়া যাইবে।

বনে বনে, পথে পথে, পর্বতে পর্বতে, খানায় ডোবায়, নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন্ গর্তের ভিতর ব্যাঙ খাইয়া-দাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার সন্ধান ভূতিনীরা কি করিয়া পাইবে? ব্যাঙের কোনও সন্ধান হইল না। নাকেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া খর্বুরকে বলিল,— 'আমাকে মারুন আর কাটুন ব্যাঙের সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।'

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া খর্বুর পুনরায় ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি এক মুষ্টি সর্ষপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপূত করিয়া সরিষাগুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিষারা নক্ষত্রবেগে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিল, দেশ বিদেশ, গ্রাম নগর, উপত্যকা অধিত্যকা, সাগর মহাসাগর, চারিদিকে খর্বুরের সরিষা-পড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুরাতন, পঙ্কিল পুষ্করিণীর পার্শ্বে, সুশীতল গর্তের ভিতর ব্যাঙ মহাশয় মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সরিষাগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সূচের সূক্ষ্ম ধারে চর্ম-মাংস ভেদ করিয়া সরিষাগণ ব্যাঙের মস্তকে চাপিয়া বসিল। ভেকের মাথা হইতে সাহেবী টুপিটী খসিয়া পড়িল। যাতনায় ব্যাঙ মহাশয় ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরিষারা তাঁহাকে গর্তের ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অট্টালিকার

দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে সুড়ঙ্গের পথে প্রবিষ্ট করিল। অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া ব্যাঙ মহাশয় হস্ত দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন।

মশা দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া যেখানে কঙ্কাবতী ও খর্বুর বসিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কাবতী চিনিলেন যে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন যে, এ সেই কঙ্কাবতী!

ব্যাঙ বলিলেন,—'ওগো ফুটফুটে মেয়েটি! তোমার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিলাম, আর তুমি আসিয়া সকলকে আমার আধুলিটীর সন্ধান বলিয়া দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ কর নাই। ধনের গল্প গাঁট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে? বিশেষতঃ ঐ চেপ্টা গাঁট-কাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকি আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেপ্টা মহাশয়! আমি দেখিতেছি, এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কৃপা করিয়া সরিষাগুলিকে আমার মাথাটি ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।'

খর্বুর বলিলেন,—'তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন নাই। এ বালিকাটী তোমার পরিচিত। বালিকাটী কি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ যুবাটীকে দেখিতেছ, উনিই ইঁহার পতি। নাকেশ্বরী দ্বারা উনি আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেশ্বরী ওঁর পরমায়ু লইয়া তালবৃক্ষের মস্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায়ুটুকু তলায় পড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র পিপীলিকারা সেই পরমায়ু ভক্ষণ করে। তুমি সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের ভিতর হইতে সেই পিপীলিকাগুলিকে বাহির করিয়া দাও। পিপীলিকাদিগের উদর হইতে আমি পরমায়ুটুকু বাহির করিয়া কঙ্কাবতীর পতির প্রাণ রক্ষা করি। পিপীলিকাগুলিকে বাহির করিয়া দিলেই সরিষাগণ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।'

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—'এই বালিকাটি আমার পরিচিত বটে, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।'

এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গিরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেষ্টা করিলেন, তবুও বমন হইল না। অবশেষে খর্বুর তাহাকে নানাবিধ বমনকারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাঙের বমন আর কিছুতেই হইল না।

খর্বুর ভাবিলেন—'এ আবার এক নূতন বিপদ! ইহার উপায় কি করা যায়?'

খর্বুর ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন —'এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি'। চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূল-শিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; সেবন করাইলে এখনি ভেকের বমন হইবে।

মশাকে সম্বোধন কবিয়া খর্বুর কহিলেন,—'মহাশয়! এ ব্যাঙের বমন হয়, এরূপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল একমাত্র ঔষধ আছে। ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ঐ চাঁদের মূল-শিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটি মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে, নতুবা আর কিছুতেই হইবে না।'

এই কথা শুনিয়া মশা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মশা মহাশয়! খর্বুর মহারাজ! এই হতভাগিনীর জন্য আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন।' কিন্তু আপনারা কি করিবেন? এ হতভাগিনীর কপাল নিতান্তই পুড়িয়াছে। আকাশে গিয়া চাঁদের মূল-শিকড় কে কাটিয়া আনিতে পাবে? চাঁদের মূল-শিকড়ও সংগ্রহ হইবে না, পতিও আমার প্রাণ পাইবেন না। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমার জন্য বৃথা আর ক্লেশ পাইবেন না। আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি যে, আমার পতির মৃতদেহটি পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট। পতির পদ আশ্রয় করিয়া আমি এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করি। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।'

মশা বলিলেন,—'আমি অনেক দূর উড়িতে পারি সত্য। কিন্তু চাঁদ পর্যন্ত যে উড়িয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই! সেজন্য আমি দেখিতেছি যে, আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। আহা! রক্তবতী মা আমার পথপানে

চাহিয়া আছেন। রক্তবতীকে গিয়া কি বলিব?'

খর্বুর বলিলেন,—'আপনারা নিতান্ত হতাশ হইবেন না। একটি খোক্কোশের বাচ্ছার সন্ধান হয়? তাহা হইলে, তাহার পিঠে চড়িয়া অনায়াসেই আকাশে উঠিতে পারা যায়। ধাড়ী খোক্কোশ পাইলে কাজ হইবে না, ধাড়ী খোক্কোশ বাগ মানিবে না, বাচ্ছা খোক্কোশ আবশ্যক।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'এক স্থানে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, তাহার সন্ধান আমি জানি। কিন্তু খোক্কোশের বাচ্ছা তোমরা ধরিবে কি করিয়া? ধাড়ী খোক্কোশ যে তোমাদিগকে এক গালে খাইয়া ফেলিব? আচ্ছা, যেন পাকে-প্রকারে তাহাকে ধরিলে। তাহার পিঠে চড়িয়া আকাশের উপরে যায় কে? প্রাণটি হাতে করিয়া আকাশে যাইতে হইবে। আকাশে ভয়ানক সিপাহী আছে, আকাশের সে চৌকিদার; কর্ণে সে বধির! কানে সে ভাল শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকে সে বড়ই দুর্দান্ত সিপাহী। আকাশের লোক তাহার ভয়ে সব জড়সড়। আকাশের চারিদিকে সে পাহারা দিয়া বেড়ায়, তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাই ভাবিতেছি, চাঁদের মূল শিকড় কাটিয়া আনিতে আকাশে যায় কে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'সে জন্য আপনাদিগের কোনও চিন্তা নাই। যদি খোক্কোশের বাচ্ছা পাই, তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশে যাইব। আমার আর ভয় কিসের? যদি আকাশের সিপাহীর হাতে পড়ি, সে না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আর আমার সে কি করিতে পারে? পতি বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাখিব না, এ তো আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা! তবে প্রাণের ভয় আর কি জন্য করিব?'

এখন খোক্কোশের বাচ্ছা ধরাই স্থির হইল। যে পাহাড়ের ধারে, গর্তের ভিতর খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, ব্যাঙ তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন,—'কৌশল করিয়া খোক্কোশের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।'

এইরূপ স্থির হইল যে, ব্যাঙ ও খর্বুর অট্টালিকায় খেতুকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর মশা, কঙ্কাবতী ও হাতি-ঠাকুর-পো খোক্কোশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কঙ্কাবতী, খেতুর পদধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন।

মশা, কঙ্কাবতীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেমন কঙ্কাবতী। তুমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো? তোমার ভয় তো করিবে না?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভয়? আমার আবার কিসের? যদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাঁদ আপনার মূল-শিকড় রক্ষা করেন। আর দেখি, আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-খাঁড়া আছে; পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব!'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—নক্ষত্রদের বৌ

খোক্কোশের বাচ্চা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া শুনিল। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে,—'যদি এই কাজটি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটিও আমাদের হাত ছাড়া হইবে না।'

মাসী বলিল,—'বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন পৃথিবীর অর্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটি মিলিল তাও বুঝি যায়!'

নাকেশ্বরী বলিল,—'মাসি, তুমি এক কর্ম কর! তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুণখাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুনখাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়! তুমি তোমর চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুণখাম করিয়া দিলে ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।'

দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল। ঝুড়ি হুহু শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরীর মাসী চুণখাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময়ে মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটি ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটি সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কোশের গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন,—'কি হইল? আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?'

ধাড়ী-খোক্কাশ আপনার বাচ্ছা চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে! একে রাত্রি, তাতে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী-খোক্কোশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ধাড়ী-খোক্কোশ বলিল,—'হাউ মাউ খাঁউরে, মনুষ্যের গন্ধ পাঁউরে! কেরা তোরা. এদিকে আসিস?'

মশা চীৎকার করিয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুই কে?'

খোক্কোশ বলিল. — 'আমি আবার কে! আমি খোক্কোশ!'

মশা বলিলেন,—'আমরা আবার কে! আমরা ঘোক্কোশ!'

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কোশের ভয় হইল। খোক্কোশ বলিল,—'বাপ রে! তবে তো তোরা কম নয়? ক, খ, গ, ঘ আমি খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুই পৈঠা উঁচু! আচ্ছা, কেমন তোরা ঘোক্কোশ. একবার কাস, দেখি শুনি?'

মশা তখন সেই ঢাকটি ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন। সেই শব্দ শুনিয়া, খোক্কোশ বলিল,—'ওরে বাপ রে! তোদের কাসির কি শব্দ! শুনিলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কোশ বটে!'

খোক্কোশ কিন্তু সন্দিগ্ধ চিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—'আচ্ছা তোরা কেমন ঘোক্কোশ, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?'

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটি ফেলিয়া দিলেন। খোক্কোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া শেষে বলিল,—'ওরে বাপ রে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!'

তবুও কিন্তু খোক্কোশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া খোক্কোশ পুনরায় বলিল,—'আচ্ছা, তোরা যদি ঘোক্কোশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?'

মশা বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।'

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন, 'হাতীভায়া! এইবার!' এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটিকে ধরিয়া, খোক্কোশের গর্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্তে পড়িয়া হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কোশের বাচ্ছাটিকে ধরিলেন। খোক্কোশের বাচ্ছা 'চ্যাঁ-চ্যাঁ' শব্দে ডাকিয়া, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোল পাড় করিয়া ফেলিল। শুঁড়-বিশিষ্ট পর্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কোশের প্রাণ উড়িয়া গেল। খোক্কোশ ভাবিল,—'তোদের মাথার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটিকে ধরিল, ঘোক্কোশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে।' এই মনে করিয়া খোক্কোশ বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন, —'কঙ্কাবতী! তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ; চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় এইখানে আসিবে। তোমার প্রতীক্ষায় এইখানে আমরা বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে. আমরা খোক্কোশের বাচ্ছাটিকে ফিরিয়া দিব। কারণ এখনও এ স্তন্য পান করে, অতি শিশু; ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দোর্দণ্ড সিপাহীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি, সে অতি ভয়ঙ্কর দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত সিপাহী! সাবধানে আকাশে উঠিবে!'

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! আমার কিছু আশ্চর্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার

রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালো মেঘে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুভ্রবর্ণ হইয়াছে; ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয় তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য উদ্ধার করিবে।'

কঙ্কাবতী খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন; দ্রুতবেগে খোক্কোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশে চুণখাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরূপ চুণখাম করিয়া কে দিল?'

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান না। যে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুণখাম। আকাশের একধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না! সব চুণখাম। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ঘোর বিপদ! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?'

হতাশ হইয়া, আকাশের চারিধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটি সামান্য ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটি দিয়া নক্ষত্রদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটির নিকট যাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বৌ একবার লুকাইল, পুনরায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ওগো নক্ষত্রদের বৌ! তোমার কোন ভয় নাই! আমিও মেয়েমানুষ, আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন বাছা!'

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—'কে গা মেয়েটি তুমি? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট! অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক, আমি বৌমানুষ, সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি? তাতে রাত্রি কাল! একটু আস্তে কথা কও, বাছা! আমার ছেলেপিলেরা সব শুয়েছে, এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ওগো! নক্ষত্রদের বৌ! আমার নাম কঙ্কাবতী। আমি পতিহারা সতী! আমি বড় অভাগিনী। আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে, বাছা, পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা! তুমি যদি পথটি বলিয়া দাও, তো আমার বড় উপকার হয়।'

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—'পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে? এই সন্ধ্যাবেলা এক বেটী ভূতিনী-বুড়ি আসিয়া আকাশের উপর সব চুণখাম করিয়া দিয়াছে। ওই যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।'

এই কথা বলিয়া নক্ষত্রদের বৌ চুপি চুপি আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—দুর্দান্ত সিপাহী

আকাশের ভিতর গিয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশ-শাবককে একটি মেঘের ডালে বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর পদব্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণের নক্ষত্র সব ফুটিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি দূরে চাঁদ, চাকার মত আকাশের উপর বসিয়া আছেন।

কঙ্কাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাইলেন যে, তাহার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে। খন্তা কুড়ুল লইয়া এক মানবী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া চাঁদের মনে ত্রাস হইল। আর চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করিলেন, — 'কেন যে মরিতে সুন্দর হইয়াছিলাম? তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ! যদি

সুন্দর না হইতাম, তাহা হইলে কেহ আর আমার মূল-শিকড় কাটিতে আসিত না। একে তো রাহুর জ্বালায় মরি, তাহার উপর আবার যদি মানুষের উপদ্রব হয়, তাহা হইলে আর কি করিয়া বাঁচি! যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তা যে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত! গলা নাই তা আমি কি করিব? দড়ি দিই কোথা?'

নানারূপ খেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া, চাঁদ আকাশের সিপাহীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের সিপাহী সকল দিকে বীরপুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল—একটু কালা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না।

সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাহাকে সকল কথা বলিলেন।

চাঁদ তাঁহাকে বলিলেন,—'আমার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।'

সিপাহী ভাবিলেন যে, চাঁদ তাহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহীর তাই রাগ হইল।

সিপাহী বলিলেন,—'নাও! আর অত হাঁ করিতে হ'বে না। শেষকালে চিড় খাইয়া, চারিদিক্ ফাটিয়া, দুইখানা হইয়া যাবে?'

এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—'আমার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।'

সিপাহী বলিলেন,—'অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাও ডাকাতি করিবে না কি যে, অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথউ ডাকাতি কর, তো, আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে।'

চাঁদ ভাবিলেন,— 'সিপাহী-লোকের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে।'

চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—'না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাউ ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি যে, আমার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।'

সিপাহী এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

সিপাহী বলিলেন,—'তোমার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে? তা বেশ, কাটিয়া লইয়া যাইবে। তার আর কি?'

চাঁদ বলিলেন,—'তুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না?'

সিপাহী উত্তর করিলেন,—'তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার মূল-শিকড়টি কাটা যায়? তখন?'

চাঁদ বলিলেন,—'যদি তুমি এরূপ সমূহ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আকাশের মাহিনা খাও কি জন্য?'

সিপাহী উত্তর করিলেন.—'রেখে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম ছাড়িয়া দিব। পৃথিবীতে গিয়া কনেষ্টেবিলি করিয়া খাইব। আমা হেন প্রসিদ্ধ দুর্দান্ত সিপাহী পাইলে, সেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। সেখানে এমন মূল-শিকড় কাটাকাটি নাই। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাৎ তফাৎ থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু চারি জন ভাল মানুষ ধরিয়া, কাছারিতে নিয়া হাজির করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মানুষটী যদি আসিয়া পড়ে? শেষে যদি আমাকে পর্যন্ত ধরিয়া টানাটানি করে?'

এই কথা বলিয়া, দুর্দান্ত সিপাহী সেখান হইতে অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। নিরুপায় হইয়া 'যা থাকে কপালে', এই মনে করিয়া, চাঁদ আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেঘের ডালে খোক্কোশ বাঁধিয়া আকাশের মাঠ দিয়া, কঙ্কাবতী অতি দ্রুতবেগে চাঁদের দিকে ধাবমান হইলেন।

চারিদিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলের মূল-শিকড় কাটিতে পৃথিবী হইতে মনুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল! নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন-উপবনে, ক্ষেত্র-উদ্যানে, যে যেখানে ফুটিয়াছিল, সে

সেইখানে বসিয়া মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চাঁদের পালাইবার যো নাই. কারণ জগতে আলো না দিয়া পালাইলে জরিমানা হইবে. চাঁদ তাই বিরসমনে ম্লানবদনে ধীরে ধীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন, — 'এইবার তো দেখিতেছি, আমার মূল-শিকড়টি কাটা যায়! এখন আমি-শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা। এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ! দিব্য চাঁদটি. কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই।' তাহা হইলেই আমি কি করিতে পারি? কাজ নাই বাপু! আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি. মড়ার মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, 'এ মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব?' আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।'

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন—'যাঃ! চাঁদটি বা মরিয়া গেল? মূল-শিকড়টী কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল। আহা! কেমন সুন্দর চাঁদটি ছিল! কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত! সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমাকে কত গালি দিবে।'

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া, কঙ্কাবতী পুনরায় মনে মনে করিলেন, 'না চাঁদটি মরে নাই। বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে। তা ভালই হইয়াছে। কাটিতে কুটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর করাত দিয়া হাত পা কাটেন। ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনাআপনি অজ্ঞান হইয়াছে। মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টী একেবারে দুইখণ্ড করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের প্রয়োজন, ততটুকু আমি কাটিয়া লই।'

এইরূপ ভাবিয়া চারিদিক ঘুরিয়া, কঙ্কাবতী অবশেষে চাঁদের মূল-শিকড়টী দেখিতে পাইলেন। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত, চাঁদ অতি কষ্টে যাতনা সহ্য করিলেন। তার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উঃ! লাগে যে!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভয় নাই! এই হইয়া গেল।'

তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী চাঁদের মূল-শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তখন চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার শিকড় পুনরায় গজাইবে তো?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'গজাইবে বৈ কি! চিরকাল কি আর এমন থাকিবে! ইহর উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষাইয়া উঠিবে না।'

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যদি ঘা হয়?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি ভাজা ঘি দিও।'

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি বুঝি মেয়ে ডাক্তার? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ কন্ করে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আমি মেয়ে ডাক্তার নই। তবে এই বয়সে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই দুটা একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? তুমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি? কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ। এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন।'

চাঁদ বলিলেন,—'ছেলে-চাঁদ হইতে চাই না। ঘরে আমার অনেকগুলি ছেলে চাঁদ আছে। আশীর্বাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া বর্তিয়া থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে, আকাশে কত চাঁদ হয়! আকাশের চারিদিকে তখন চাঁদ উঠিবে। এখনি আমার ছেলেমেয়েগুলি বলে,—'বাবা! অমাবস্যার রাত্রিতে তুমি শ্রান্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যাবেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না? আমরা গিয়া আকাশেতে উঠি না? আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক

ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত, পথ টুকু তো আর কম নয়? তারা ছেলেমানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেন?'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার ছেলেমেয়েগুলি কত বড় হইয়াছে?'

চাঁদ উত্তর করিলেন,—'বড় মেয়েটী একখানি কাঁসির মত হইয়াছে। কেমন চক্-চকে কাঁসি! তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁসির সেরূপ রং হয় না! মেজছেলেটি একখানি খন্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে। কোলের মেয়েটি একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক, মেয়েটীর শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর যখন আকাশে কালো চাঁদ উঠিবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক-সুন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্‌চকে অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ যেন বারনিশ চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে। তা, যাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে? কিছু যে খাইতে পারি না। ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে। ভাল যদি কোনও ঔষধ থাকে, তো আমাকে দিয়া যাও।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'চাঁদ! তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন! কলিকাতায় দন্তকারেরা আছে। তোমার পোকাধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরাইয়া দিবে।'

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,—'আমার মূল-শিকড়ে ব্যথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দূর আমি যাইতে পারিব না।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।'

চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল! চাঁদ ভাবিলেন,—'যা ভয় করিয়াছিলাম তাই! কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম! চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।'

চাঁদ বলিলেন,—'আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যথা নাই। সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না। এখনও যাও, বাড়ী যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে ভাবিবে।'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'কি বলিলে? তুমি ভারি! বাপের বাড়ী থাকিতে তোমার চেয়ে বড় বড় বগীথাল আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না।'

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর আঁচলটি পাতিলেন! চাঁদটীকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি! এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানাপোনা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদনীর কান্নায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কান্নায় কঙ্কাবতীর কানের তালা লাগিল।

চাঁদনী কাঁদিতে লাগিলেন,—'ওগো আমি দুর্দান্ত সিপাহীর মুখে শুনিলাম যে, মানুষে তোমার মূল-শিকড় কাটিবে; ওগো আমি সে পোড়ারমুখী মানুষীর কি বুকে ধান ভানিয়াছি যে, সে তোমার সহিত এরূপ শত্রুতা সাধিবে! আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সে বাপভাইয়ের মাথা খাইবে।'

চাঁদের ছানাপোনাগুলি কঙ্কাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'ওগো তোমার পায়ে পড়ি। বাবার তুমি মূল-শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।'

চাঁদের ছোটমেয়েটী—যেটী পাথুরে পোকার টিপের মত, সেই মেয়েটী মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে রাগে, আর কঙ্কাবতী গালি দিয়া বলে,—'অভাগী, পোড়ারমুখী, শালা!' আবার সে কঙ্কাবতীর গায়ের চারিদিকে আঁচড়ায় কামড়ায়, আর চিম্‌টি কাটে। তার চিম্‌টির জ্বালায় কঙ্কাবতী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ওগো! ও চাঁদনী! তোমার মেয়ে সামলাও বাছা! তোমার এই ছোটোমেয়েটী চিমটি কাটিয়া আমার গায়ের ছালচামড়া তুলিয়া লইতেছে!'

চাঁদনী উত্তর করিলেন,—'হাঁ, মেয়ে সামলাবো বৈ কি? তুমি আমার সর্বনাশ করিবে, আর আমি মেয়ে সামলাবো। কেন, বাছা? তোমার আমি কি করিয়াছি, যে তুমি আমার এ সর্বনাশ করিবে? মূল-শিকড়টি কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণবধ করিবে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'না গো না! আমি তোমার পতির প্রাণ বধ করি নাই। একটুখানি শিকড়ের আমার আবশ্যক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁছিয়া লইয়াছি। অধিক রক্তও পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ? তার পর, তোমার স্বামী বলিলেন যে, 'তাঁর দাঁত নড়িতেছে।' তাই মনে করিলাম যে, কলিকাতায় লইয়া যাই, দাঁত ভাল করিয়া পুনরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কর। আর তোমার এই মেয়েটীকে বল আমায় যেন আর চিমটি না কাটে।

এই কথা শুনিয়া চাঁদনী আশ্বস্ত হইলেন। চাঁদের ছেলেপিলেদেরও কান্না থামিল।

চাঁদনী বলিলেন। 'তোমার যদি বাছা, কাজ সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি এখন 'বাড়ী যাও'। তোমার ভয়ে, আকাশ একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। সবাই সশঙ্কিত।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'আমার কাজ সারা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেখানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমন চারিদিকে সুন্দর সুন্দর সব নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে! আমি মনে করিয়াছি, কতগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে অনেক দূরে আমার খোক্কোশ বাঁধা আছে কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দূর লইয়া যাইগা? একটি ঝাকা মুটে কোথায় পাই?'

চাঁদনী বলিলেন,—'আর বাছা! তোমার ভয়ে ঘর হইতে আর কি লোক বাহির হইয়াছে, যে তুমি মুটে পাইবে? দোকানী-পসারী সব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজারহাট আজ সব বন্ধ। পথে জনপ্রাণী নাই। আমিই কেবল প্রাণের দায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।'

এই রূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটি লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ঐ লোকটীকে বলি, খোক্কোশের বাচ্চার কাছ পর্যন্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া কঙ্কাবতী তাহাকে ডাকিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ওগো শুন! একটা কথা শুন।'

কঙ্কাবতী যেই এই কথা বলিয়াছেন, আর লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। কঙ্কাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কঙ্কাবতী বলিতে লাগিলেন,—'ওগো! একটু দাঁড়াও! আমার একটা কথা শুন! তোমার কোন ভয় নাই!'

আর ভয় নাই! কঙ্কাবতী যতই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান, আর লোকটী ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—'লোকটী কি দৌড়িতেই পারে! বাতাসের মত যেন উড়িয়া যায়!'

কঙ্কাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেন না, কিন্তু দৈবক্রমে এক ঢিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে না-উঠিতে কঙ্কাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কঙ্কাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড় নাই, মাস নাই, কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘু। দুইটী অঙ্গুলিদ্বারা কঙ্কাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চক্ষুর নিকট আনিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, কেবল দুই চারিটী তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্মিত। তালপাতের হাত, তালপাতের পা, তালপাতের নাক-মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া কঙ্কাবতী অতিশয় আশ্চর্য হইলেন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কে?'

লোকটী উত্তর করিল,—'আমি আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী। আবার কে? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। আঙ্গুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার শরীর কি তালপাতা দিয়া গড়া?'

দুর্দান্ত সিপাহী বলিলেন,—'তালপাতা দিয়া গড়া হইবে না তো কি দিয়া গড়া হইবে? ইট পাথর চুণ সুরকি দিয়া রেক্তার গাঁথুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হ'বে না কি? এত দেশ বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে, আর তালপাতার সিপাহীর নাম কখনও শুননি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কে না জানে? বীরপুরুষ দেখিলেই লোকে আমার সহিত উপমা দেয়। এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূল শিকড় কাটাকাটি হইয়াছে বটে!'

কঙ্কাবতী এখন বুঝিলেন যে, ছেলেবেলা তিনি সেই তালপাতার সিপাহীর কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বাস

আকাশে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'দেখ দুর্দান্ত সিপাহী! তোমাকে আমার একটী কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে এক বোঝা নক্ষত্র আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দূর মোটটী তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।'

সিপাহী আর করেন কি? কাজেই সম্মত হইতে হইল। কঙ্কাবতীর আঁচলে আর কতটী নক্ষত্র ধরিবে? তাই কঙ্কাবতী ভাবিতে লাগিলেন,—'কি দিয়া নক্ষত্রগুলি বাঁধিয়া লই?'

সিপাহী বলিলেন,—'অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন? চল, আমরা আকাশ-বুড়ীর কাছে যাই। কদমতলায় বসিয়া চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে! তাহার কাছ হইতে একখানি গামছা চাহিয়া লই।'

কঙ্কাবতী ও সিপাহী আকাশ-বুড়ীর নিকট গিয়া একখানি গামছা চাহিলেন। অনেক বকিয়া-ঝকিয়া আকাশ-বুড়ি একখানি গামছা দিলেন। তখন কঙ্কাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুটন্ত, ফুটন্ত আধ-কুঁড়ি, আধ-ফুটন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তুললেন। সেইগুলি গামছায় বাঁধিয়া মোটটী সিপাহীর মাথায় দিলেন।

সিপাহী ভাবিলেন,—'এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্তু মুটেগিরি কখনও করিতে হয় নাই। ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ দুর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি অপমানে মরমে মরিয়া যাইতাম।'

মোটটী মাথায় করিয়া, সিপাহী আগে আগে যাইতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে খোক্কোশের বাচ্ছার নিকট আসিয়া দুইজনে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীর মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটী লইয়া তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—'এখন তুমি যাইতে পার, তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নাই।'' এই কথা বলিতে না বলিতে সিপাহী এমনি ছুট মারিলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—''তালপাতার সিপাহী কি না! তাই এত দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে!'

মোটটী লইয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশের বাচ্ছার পিঠে চড়িলেন। খোক্কোশের পিঠে চড়িয়া আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে পুনরায় অবতরণ করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ—সতী

যেখানে মশা ও হাতী কঙ্কাবতীর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলেন অবিলম্বে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শিকড় লাভে কৃতকার্য হইয়াছেন শুনিয়া, মশা ও হাতীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। খোক্কোশের বাচ্ছাটীকে পুনরায় তাহার গর্তে ছাড়িয়া মশা ও কঙ্কাবতী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও পর্বত অভ্যন্তরস্থিত সেই অট্টালিকার দিকে যাত্রা করিলেন।

অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া, কঙ্কাবতীর চাঁদের মূল-শিকড়টুকু খর্বুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। খর্বুর তাহার এক তোলা ওজন করিয়া, সাতটি গোলমরিচের সহিত অতি সাবধানে শিলে বাটিলেন। ঔষধটুকু বাটা হইলে, ব্যাঙকে তাহা সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবন করিয়া ব্যাঙের হুড় হুড় করিয়া বমন আরম্ভ হইল। পেটে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঙ বলিলেন,—'ব্যাঙাচি অবস্থায়, জলে কিল্‌কিল্ করিতে করিতে আমি যাহা কিছু খাইয়াছিলাম, তাহা পর্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে, উদরে আর আমার কিছুই নাই।'

বমনের সহিত সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। খর্বুর অতি যত্নে তাহাদিগকে বমনের ভিতর হইতে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর এক একটি পিপীলিকা লইয়া, তাহার উদর হইতে অতি সূক্ষ্ম সোন্না-দ্বারা খেতুর পরমায়ুটুকু বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত পিপীলিকাগুলি হইতে পরমায়ু বাহির করা হইলে, খর্বুর বলিলেন,—'এ কি হইল? পরমায়ু তো অধিক বাহির হইল না। এ যৎসামান্য পরমায়ুটুকু লইয়া কি হইবে? ইহাতে তো কোন ফল হইবে না?'

খর্বুর বিষণ্ণচিত্তর হইলেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কঙ্কাবতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। অদৃশ্যভাবে অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পরিতোষ লাভ করিল।

যাহা হউক, সেই যৎসামান্য পরমায়ুটুকুই লইয়া খর্বুর খেতুর নাকে নাস দিয়া দিলেন। খেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—'কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম! কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই? দেখ দেখি, কত বেলা হইয়া গিয়াছে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতাম না?'

খেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন কঙ্কাবতীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। খর্বুর, মশা ও ব্যাঙ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আর এঁরা কারা?'

কঙ্কাবতী কোন উত্তর করিলেন না।

খেতু একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—'আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না বলিয়া আমাকে নাকেশ্বরী খাইয়াছিল। কঙ্কাবতী! তুমি বুঝি ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছ? তবে আর কান্না কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাথা অল্প অল্প ব্যথা করিতেছে। আমি আর একবার শুই। কঙ্কাবতী! তুমি আমার মাথাটি একটু টিপিয়া দাও। আমার মাথা বড় বেদনা করিতেছে। অসহ্য বেদনা করিতেছে! প্রাণ বুঝি আমার বাহির হয়! ওগো! তোমরা সকলে আমার কঙ্কাবতীকে দেখিও! আমার কঙ্কাবতীকে তার মা'র কাছে দিয়া আসিও। হা ঈশ্বর!'

খেতুর মৃত্যু হইল।

ঘাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই! সকলের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কঙ্কাবতী স্থির ধীর প্রশান্ত!

অনেকক্ষণ পরে খর্বুর বলিলেন,—'এইবার সব ফুরাইল। আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও উপায় নাই। তালগাছ হইতে পতনের সময় পরমায়ুর অধিকাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিয়াছিল, কেবল অতি যৎসামান্য ভাগ পিপীলিকাতে খাইয়াছিল। সে পরমায়ুটুকুতে মনুষ্য আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে?'

এই কথা বলিয়া খর্বুর কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ব্যাঙ রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন, বাহিরে হাতী শুঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কঙ্কাবতী নীরব, কঙ্কাবতীর কান্না নাই।

অবশেষে মশা বলিলেন,—'মা, উঠ। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা যথাবিধি সৎকার করি। তাহার পর তুমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট যাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শান্ত হইবে।'

মশা, খর্বুর ও ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে বুঝাইতে লাগিলেন।

খর্বুর বলিলেন,—'সংসার অনিত্য। জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। কখন্ কে আছে, কখন কে নাই! উঠ, মা উঠ। তোমার পতির যথাবিধি সৎকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্তবতীর নিকটে গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট আমি গিয়া রাখিয়া আসিব।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়গণ! আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্য আপনারা বহুতর পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল না, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যখন এত পরিশ্রম করিলেন, তখন এক্ষণে আমার আর একটি যৎসামান্য উপকার করুন। সেইটী করিয়া আপনারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করুন। পতিপদে আমি আমার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এই যে আমার শরীর দেখিতেছেন, এ প্রাণহীন জড় দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়দেহ ভস্ম করিব।

সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন্।'

মশা বলিলেন,—'ছি মা! ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? পতিহারা হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।'

খর্বুর ও ব্যাঙ সকলেই কঙ্কাবতীকে সেইরূপ নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

নাকেশ্বরী বলিল—'মাসী!'

মাসী বলিল,—'উঁ!'

নাকেশ্বরী বলিল,—'মানুষটাকে সৎকার করিবে যে! তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই খাইব?'

মাসী বলিল, — 'হুঁ!'

নাকেশ্বরী বলিল,—'এই ছুঁড়ীর জন্যই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ীও যাতে মরে, এস তাই করি।'

এই কথা বলিয়া নাকেশ্বরী, খর্বুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবির্ভূত হইল।

নাকেশ্বরী বলিল,—'তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ? কঙ্কাবতীকে দেশে লইয়া যাইবে? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্মভূমি ভারত-ভূমির নিয়ম তোমবা জান না। লোকের এখানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর তাপেই হউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে, 'আমি পতির সঙ্গে যাইব', তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে, সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার-ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইঁহাকে ঘরে লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই; কিন্তু শুন, মশা মহাশয়! শুন খর্বুর মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কিছু তোমাদিগের মত নাস্তিক নন। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করিবেন। তখন দেখিব, পুত্রকন্যার বিবাহ দাও কোথায়?'

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কাল তাঁকে রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই খর্বুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্য সত্য কি ভারতের এই নিয়ম?'

খর্বুর উত্তর করিলেন,—'পূর্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, সত্য! কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।'

নাকেশ্বরী বলিল,—'উঠিয়া গেছে সত্য! কিন্তু আজ কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্তপ্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আজকালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।'

খর্বুর বলিলেন,— 'আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কঙ্কাবতীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হয় সেও স্বীকার। আত্মীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, তাহাতে আমি ভয় করিব না। তা বলিয়া, অনাথিনী বালিকাটী যে অসহনীয় শোকে ক্ষিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।'

মশা বলিলেন,—'আমারও ঐ মত, ভীরু কাপুরুষের মত কার্য করিতে পারিব না। আমি কঙ্কাবতীকে ঘরে লইয়া যাইব।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মানুষেরা হউক। আমি হইব না।'

নাকেশ্বরী বলিল,—'ধর্মের তোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্মে যে তোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তোমাদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইহাকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবুও ইনি ঘরে যাইতে পারিবেন

না। মুর্দাফরাশে ইহাকে লইয়া যাইবে, মুর্দাফরাশের রমণী হইয়া ইহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'এই কথা লইয়া আপনারা বৃথা তর্কবিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব, আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিতে আর আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না, যেহেতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, সতী হইতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিন। আমার আর একটী কথা আছে। আমাদিগের গ্রামের নিকট যে ঘাট আছে, সেইখানে আমাদিগকে লইয়া চলুন। যেস্থানে আমার শাশুড়ীঠাকুরাণীর চিতা হইয়াছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিব।'

কঙ্কাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অতি দুঃখের সহিত, অগত্যা এ কার্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

মশা বলিলেন,—'কঙ্কাবতী! যদি তুমি নিতান্তই এই দুষ্কর কার্য করিবে, তবে আমি আমার বাটীতে সংবাদ দিই, আমার স্ত্রীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।'

খর্বুর বলিলেন,—'আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমার আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আসুন। সহমরণের উপকরণ আনয়ন করুন, ও নাপিত, পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিন।'

ব্যাঙ বলিলেন,—'আমিও আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমাচার পাঠাই।'

বাহিরে হাতী বলিলেন,—'আমিও আমার জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে ডাকিতে পাঠাই।'

নাকেশ্বরী বলিল,—'মাসী! তবে আমরা আর বাকি থাকি কেন? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীতে যত ভূতিনী প্রেতিনী আছে, সহমরণ দেখিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। আজকাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবকযুবতী, বালকবালিকা সকল ভূতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।'

এইরূপে সকলেই আপনার আপনার আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর খেতু ও কঙ্কাবতীকে লইয়া, সকলে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় সকলে কুসুমঘাটীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী যে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে চিতা সুসজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শ্মশানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সমুদয় উপকরণ লইয়া নাপিত পুরোহিত ঢাকি ঢুলি সঙ্গে করিয়া খর্বুরের সপ্তহস্ত-পরিমিত স্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আপন আপন বালকবালিকাগণকে লইয়া সেইখানে আসিলেন। ব্যাঙ ও হস্তীর আত্মীয়বর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হইতে অসংখ্য ভূতিনী-প্রেতিনীগণও আগমন করিল। সেই শ্মশান-ঘাটে সে রাত্রিতে, মনুষ্য ও ভূত-ভূতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানাপ্রকার জীবজন্তুর সমাগম হইল। সে রাত্রিতে কুসুমঘাটীর শ্মশান-ঘাট জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কঙ্কাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রক্তবতী বলিলেন, —'পচাজল। তুমি কোথায় যাও? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি কখনই তোমাকে যাইতে দিব না।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'পচাজল! তুমি কাঁদিও না। সতী হইয়া পতি-সঙ্গে আমি স্বর্গে চলিলাম। সে কার্যে তুমি আমাকে বাঁধা দিও না। কি করিব পচাজল! মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম; এ পৃথিবীতে সুখ হইল না। পতির সহিত এখন স্বর্গে যাই। আশীর্বাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি সুখে ঘরকন্না কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও না হয়।'

এই বলিয়া কঙ্কাবতী, মশা-কন্যাকে নক্ষত্রের পুঁটলিটী বাহির করিয়া দিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভাই পচাজল! এই নক্ষত্রগুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও, আর দুই ছড়া আমার জন্য রাখ, আমার প্রয়োজন আছে।'

সকলে তখন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিণ্ডাদি যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কঙ্কাবতীর নখগুলি কাটিয়া দিল। তাহার পর কঙ্কাবতীর শরীর হইতে সমুদয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ভাঙ্গা চুড়ি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। কেন না, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে, এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।

কঙ্কাবতী হাতের নো খুলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। খর্বুরপত্নী তখন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙাসুতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিলেন। চুলের উপর থরে থরে চিরুণি সাজাইয়া দিলেন। কপাল জুড়িয়া সিন্দূর ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপ বেশভূষা হইলে, কঙ্কাবতী আচমন করিয়া, তিল জল কুশ হস্তে, পূর্বমুখে বসিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরূপ সঙ্কল্প করাইলেন;—

'অদ্য ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয় তিথিতে, ভরদ্বাজ গোত্রের আমি শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া অরুন্ধতী যেরূপ স্বর্গে মহামান্যা হইয়াছিলেন,—আমিও যেন সেইরূপ, মানুষের শরীরে যত লোম আছে, তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি। আমার পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুর-কুল যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্যন্ত যেন অপ্সরাগণ, আমাদিগের স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন সুখে থাকি। ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতা জন্য যদি পতির পাপ হইয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।'

এইরূপে পুরোহিত কঙ্কাবতীকে সঙ্কল্প করাইলেন। তাহার পর সূর্যার্ঘ দিয়া দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ এই;—

'অষ্ট-লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।'

লোকপালকদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কঙ্কাবতী আঁচলে খই, খণ্ডের পরিবর্তে বাতাসা ও কড়ি লইয়া সাতবার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর সেই খই-কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালকবালিকাগণ হুড়াহুড়ি করিয়া খই-কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেন না, এই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে একজন সতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দুর চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধূ নিতান্ত শিশু, এখনও পতিভক্তি তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাহার কপালে এই সিন্দুর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতি-পরায়ণা হইবে।

চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কঙ্কাবতীকে ঋঙ্মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কঙ্কাবতী, রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা খেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর স্বামীর বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক্ হইতে সকলে ঝুপঝাপ করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢাক-ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আকাশ-প্রমাণ হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল।

কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন! অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা!!

পরিশেষ

অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তি-দায়িনী নিদ্রা!

বৈদ্য বলিলেন,—'এই যে নিদ্রাটী দেখিতেছেন, ইহা সুনিদ্রা। বিকারের ঘোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে। এক্ষণে বাড়ীতে যেন শব্দ হয় না! নিদ্রাটী যেন ভঙ্গ হয় না।'

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈতন্য হইয়া রোগী নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিপীলিকার পদশব্দটী পর্যন্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক একবার কেবল কন্যার নিকট নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন, রীতিমত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না?

আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কন্যার নিকট এইরূপে বসিয়া আছেন। প্রাণসম কন্যাকে লইয়া যমের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনায় কন্যা যখন উঠিয়া বসেন, মা তখন আস্তে আস্তে পুনরায় তাঁহাকে শয়ন করান। বিকারের প্রলাপে কন্যা যখন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তখন তাঁকে চুপ করিতে বলেন। সুধাময় মার বাক্যে শুনিয়া বিকারের আগুনও কিছুক্ষণের নিমিত্ত নির্বাণ হয়।

কন্যা নিদ্রিত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বহুদিন অনাহারে, প্রবল দুরন্ত জ্বরে, ঘোরতর বিকারে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংসার সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপূর্ব রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তবুও রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়া মার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠদ্বয় একবার ঈষৎ নড়িল। অপরিস্ফুট স্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মস্তক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না।

আবার ওষ্ঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এইবার সে কথা বুঝিতে পারিলেন।

মা বলিলেন,—'খেতু খেতু করিয়াই বাছা আমার সারা হইল। আজ কয়দিন মুখে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চারি হাত এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি যায়।'

মার সুমধুর কণ্ঠস্বর কন্যার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বিস্মিতবদনে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন,—'বিকার সম্পূর্ণরূপে এখনও কাটে নাই। চক্ষুতে এখনও সুদৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।'

ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে চিনিতে পার?'

কঙ্কাবতী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—'পারি, তুমি বড় দিদি!'

ভগিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইনি কে বল দেখি?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মা!'

তনু রায় ঘরের ভিতর আসিলেন। তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কঙ্কাবতী! আজ কেমন আছ মা?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ভাল আছি বাবা!'

তনু রায় একটু কাছে বসিলেন। স্নেহের সহিত কন্যার গায়ে মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'মা, ভগিনী, পিতা সকলেই দেখিতেছি আমার সহিত স্বর্গে আসিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতার স্নেহ কখনও পাই নাই। আজ স্বর্গে আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদের যেরূপ বাড়ী, আমার যেরূপ ঘর ছিল, স্বর্গেও দেখিতেছি সেইরূপ। কিন্তু যাঁহার সহিত সহমরণ যাইলাম, তিনি কোথায়?'

অনেকক্ষণ কঙ্কাবতী তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি আসিলেন না।

অবশেষে কঙ্কাবতী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা তিনি কোথায়?'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তিনি কে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'সেই যিনি বাঘ হইয়াছিলেন।'

মা বলিলেন,—'এখনও ঘোর বিকার রহিয়াছে, এখনও প্রলাপ রহিয়াছে।'

মা'র কথা শুনিয়া কঙ্কাবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শরীর তাঁহার নিতান্ত দুর্বল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অল্প অল্প করিয়া তাঁহার পূর্বকথা সব স্মরণপথে আসিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা! আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল?'

মা বলিলেন,—'হাঁ বাছা! আজ বাইশ দিন তুমি শয্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে, সে আশা ছিল না।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মা! আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটী আমার মনে এরূপ গাঁথা রহিয়াছে যে, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী স্বপ্ন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই মা তোমাকে গুটীকত কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা মা! জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সে কথা সত্য?'

মা বলিলেন,—'সে কথা সত্য। তাই লইয়াই তো আমাদের যত বিপদ্!'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা! বরফ লইয়া কি দলাদলি হইয়াছিল, সে কথা কি সত্য?'

মা উত্তর করিলেন,—'হাঁ বাছা! সে কথাও সত্য। সেই কথা লইয়া পাড়ার লোকে খেতুর মাকে কত অপমান করিয়াছিল।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তিনি এখন কোথায় মা?'

মা বলিলেন,—'তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এইখানেই থাকেন। আমার চেয়েও তিনি তোমাকে ভালোবাসেন। তাঁর হাতে তোমাকে একবার সঁপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার সকল দুঃখ যায়। কর্তার মত হইয়াছে, সকলের মত হইয়াছে, এখন তুমি ভাল হইলেই হয়।'

কঙ্কাবতী বুঝিলেন যে, তবে খেতুর মার মৃত্যু হয় নাই, সে কথাটী স্বপ্ন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, না মা?'

মা বলিলেন,—'এই সময় তোমার জ্বর হয়। তুমি একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়। তোমার ঘোরতর জ্বর-বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিয়া একখানি নৌকার উপর চড়ি, না মা?'

মা বলিলেন,—'বালাই! তুমি নৌকায় চড়িবে কেন মা? সেই অবধি তুমি শয্যাগত।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মা! কত যে কি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা আর তোমায় কি বলিব! সে সব কথা মনে হইলে, হাসিও পায়, কান্নাও পায়। স্বপ্নে দেখিলাম কি মা, যে, গায়ের জ্বালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর একখানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাখানি আমার ডুবিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছুদিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। সেখান হইতে শ্মশানঘাটে যাইলাম। তাহার পর পুনরায় বাড়ী আসিলাম। এক বৎসর পরে আমাদের বাটীতে একটি বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে যাইলাম। তার পর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তারপর মা আকাশে উঠিলাম, কত কি করিলাম, কত কি দেখিলাম, স্বপ্নটি যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! সে দলাদলির কি হইল?'

মা উত্তর করিলেন,—'সে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়াছে। যখন তোমার সমূহ পীড়া, যখন তুমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি, সেই সময় জনার্দন চৌধুরীর একটি পৌত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল। জনার্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গোবর্ধন শিরোমণিরও সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে তো তোমাকে লইয়া সমূহ বিপদ। জনার্দন চৌধুরীর সুমতি হইল। তিনি রামহরিকে আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দন চৌধুরী অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর রামহরি নিরঞ্জনকে ডাকিয়া আনিলেন। রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্তাটি ও খেতু সকলে মিলিয়া জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে যাইলেন। জনার্দন চৌধুরী বলিলেন,—'আমি পাগল হইয়াছিলাম যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

নিরঞ্জনকে আমি দেশত্যাগী করিয়াছি, খেতু বালক, তাহার প্রতি আমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া ষাঁড়েশ্বর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণাপন্ন হইয়া আছেন। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই দারুণ শোক পাইতে হইল। এঁর কন্যাটীরও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি ফিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। খেতুকে অনেক আশীর্বাদ করিয়া জনার্দন চৌধুরী সান্ত্বনা করিলেন। আমাদের কর্তাটীও আর সে মানুষ নাই। এক্ষণে তাঁহার মনে স্নেহ-মায়া দয়া-ধর্ম হইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমাদের দাদাও এখন আর সেরূপ নাই। মাকে যেরূপ আস্থা-ভক্তি করিতে হয়, সুপুত্রের মত তোমার দাদাও এক্ষণে আমাকে আস্থা-ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় তোমার দাদা অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তুমি ভাল হইলে খেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর এ কথার অন্যথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় খেতু, খেতুর মা, রামহরি, সীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় দুর্বল। পুনরায় অসুখ হইতে পারে।'

কঙ্কাবতী অনেক দিন দুর্বল রহিলেন। ভাল হইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্বদা বসিতেন। স্বপ্ন-কথা তিনি সীতার নিকট সমুদয় গল্প করিলেন। সীতা মাকে বলিলেন। বৌদিদি খেতুকে বলিলেন। এইরূপে কঙ্কাবতীর আশ্চর্য স্বপ্নকথা পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শুনিলেন। স্বপ্ন-কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কঙ্কাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান হইল।

সীতা বলিলেন,—'সমুদয় নক্ষত্রগুলি তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্য একটিও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভালবাস না, তুমি তোমার পচাজলকে ভালবাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।'

কঙ্কাবতী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্বের ন্যায় পুনরায় সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া তিনি খেতুর সম্মুখে একটু একটু বাহির হইতেন। একদিন খেতু কঙ্কাবতীদের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেইখানে একটি মশা উড়িতেছিল। খেতু সেই মশাটীকে ধরিয়া কঙ্কাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেখ দেখি কঙ্কাবতী! এই মশাটী তো তোমার 'পচাজল' নয়? আহা! রক্তবতী আজ অনেক দিন তাহার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই সে হয় তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।'

লজ্জায় কঙ্কাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্মুখে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন একদিন খেতুকে বলিলেন,—'খেতু! কঙ্কাবতীর অদ্ভুত স্বপ্নকথা আমি শুনিয়াছি। কি আশ্চর্য স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া তুমি উপহাস করিও না। স্বপ্ন,—কি নয়? তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অপূর্ব মায়া কিছুই বুঝিতে পারি না। সামান্য একটি পদার্থের কথাই আমরা ভালরূপ অবগত নহি। এই দেখ, আমার হাতে এখন যে পুস্তকখানি রহিয়াছে, প্রকৃত ইহা কি, তাহার কিছুই জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কতকগুলি গুণ অনুভব হয়। চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থূলতা ও বর্ণ আছে, ত্বকের দ্বারা জানিতে পারি যে, ইহার কাঠিন্য আছে, নাসিকা দ্বারা ইহার ঘ্রাণ ও জিহ্বার দ্বারা ইহার স্বাদ অনুভব করি। প্রকৃত পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পাই না, যাহাকে পুস্তকের গুণ বলি, তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সে গুণগুলি পুস্তকের, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের? আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়সমুদয় অন্যরূপ গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ আবার অন্য রূপ ধারণ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। যদি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র আমার চক্ষুর গঠন পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তকখানিই আবার আমার চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম তো পুস্তকখানি দেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অনুভব করি। আবার বলিতে গেলে সেই গুণগুলি পুস্তকের নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের। তবে পুস্তক রহিল কোথা? কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া, স্বপ্ন-সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি। সে জন্য কঙ্কাবতীর স্বপ্নকে আমরা উপহাস করিব কেন?

সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়-কল্পিত। দুই জগতে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ নাই। কঙ্কাবতী যাহা দেখিয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, যাহা কখনও চিন্তা করিয়াছ, সেই সমুদয় লইয়া একটি স্বপ্ন-জগৎ নির্মিত হইয়াছিল। স্বপ্নের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল স্থানেই কঙ্কাবতী বর্তমান। কঙ্কাবতী কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, তাহা ছাড়া স্বপ্নে আর কিছুই নাই। কঙ্কাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ ভ্রমও দেখিতে পাই। হাতীদিগের মত মশাদিগের নাক পরিবর্ধিত হইয়া শুঁড় হয় না, মশাদিগের দুই চুল বাড়িয়া শুঁড় হয়। আবার অন্য স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনাদেবীও কঙ্কাবতীর সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক, স্বপ্নটী অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে। আমি আশ্চর্য হই, কঙ্কাবতী সেই মশাদিগের সংস্কৃত বচনটী কি করিয়া রচনা করিল?'

খেতু হাসিয়া বলিলেন,—'একবার পরিহাসচ্ছলে আমি ঐ বচনটী রচনা করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে কাগজখানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয়, এই কাগজখানি দেখিয়া থাকিবে।'

কঙ্কাবতী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিলে, শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, খেতু ও কঙ্কাবতীর শুভ-বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। ঘোরতর দুঃখের পর এই কার্য সুসম্পন্ন হইল, সে জন্য সপ্তগ্রাম সমাজের লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ জনার্দন চৌধুরী পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়স ও কফের ধাত, কিন্তু সে জন্য তিনি কিছু মাত্র উপেক্ষা করেন নাই। বিবাহের দিন সমস্ত রাত্রি তিনি তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। চুপি চুপি তিনি কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়, পরিহাস-ছলে সকলকে তিনি বলিলেন,—'বর যে একেলা 'বরখ' খাইয়া শরীর সুশীতল করিবে, তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর যৎসামান্য স্নিগ্ধ করিব।'

দেশের লোক, যাঁহারা কখনও বরফ দেখেন নাই, আজ বরফ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। আগ্রহের সহিত সকলেই সুস্নিগ্ধ বরফ-জল পান করিলেন। বাড়ীতে দেখাইবার জন্য অনেকেই অল্পস্বল্প কাঁচা বরফ লইয়া গেলেন।

শূদ্রভোজনের সময় গদাধর ঘোষ তিন লোটা বরফজল পান করিলেন। আর প্রায় এক সের সেই করাতের মত কর্তনশীল 'বরখ' দন্ত দ্বারা চিবাইয়া খাইলেন।

কঙ্কাবতীর মা যখন কঙ্কাবতীকে খেতুর মার হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন,—'দিদি। এই নাও, তোমার কঙ্কাবতী নাও'' তখন দুই জনের আহ্লাদ রাখিতে পৃথিবীতে কি আর স্থান হইল? মনের আনন্দে তখন খেতুর মা কি পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে লন নাই? বরণের সময় লজ্জায় খেতু কি ঘাড় হেঁট করিয়াছিলেন না? কলাবৌয়ের মত কঙ্কাবতীর কি তখন এক হাত ঘোমটা ছিল না? তা দেখিয়া পাড়ার একটি শিশু ছেলে কি সেই ঘোমটার ভিতর মুখ দিয়া 'টুঃ' দেয় নাই? এ সব কথার আর উত্তর দিবার আবশ্যক নাই।

যে সময় বরণ হইতেছিল, সেই সময় রামহরির স্ত্রী, খেতুর বৌদিদি কি করিয়াছিলেন, তা জানেন? অতি উত্তম করিয়া খেতুর কানটী তিনি মলিয়া দিয়াছিলেন।

কান মলা খাইয়া খেতু কি বলিলেন, তা জানেন? খেতু বলিলেন,—'যাও বৌ-দিদি, ছি!'

পাড়ার স্ত্রীগণ তখন কি করিলেন, তা শুনিয়াছেন? কমলের স্ত্রী ঠান্‌দিদি বলিলেন, —'শালা 'বরখ' খায়! ওলো, ও সীতার মা, শালার কান দুইটা একেবারে ছিঁড়িয়া দে।'

তাহার পর কি হইল? তাহার পর খেতুর অনেক টাকা হইল। সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। খেতুর অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। তনু রায় তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিতেন। পাড়ার বালকবালিকারা তাঁর দৌহিত্রদিগকে মারিলে তাহাদের ঠাকুরমার সহিত তনু রায় হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, ঝগড়া করিতেন।

তাহার পর? বার বার ''তাহার পর তাহার পর'' করিলে চলিবে না। দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই মূল্য দেয় কে? তাহার ঠিক নাই, কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

তাহার পর কি হইল? তাহার পর আমার গল্পটী ফুরাইল, নোটে গাছটীর কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহাই ঘটিল। সেই ঘটনা লইয়া কত অভিযোগ কত অনুযোগ উপস্থিত হইল।

প রি শি ষ্ট

ত্রৈলোক্য-সাহিত্য সমালোচনা

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম উপন্যাস *কঙ্কাবতী*-র একটি অনবদ্য সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে *সাধনা* পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের মত জহুরির চিনতে ভুল হয়নি। বাংলা শিশুসাহিত্যে 'অন্য' রসের এক বলিষ্ঠ লেখকের যে আবির্ভাব ঘটেছে তা তিনি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। সাহিত্যের চিরাচরিত আঙিনায় সম্পূর্ণ নতুন এই উপন্যাসটি তাঁর সাধুবাদ কুড়িয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে বিশ শতকের প্রথমে ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে বাংলার রসবেত্তারা সম্পূর্ণ নীরব, পত্র-পত্রিকা বা বই আকারে তাঁকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চোখে পড়ে না।

এক *কঙ্কাবতী* ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের আর সব বইপত্র বাজারে বেমালুম উধাও। 'বঙ্গবাসী' সংস্করণেই ত্রৈলোক্যনাথ জ্বলছিলেন টিমটিম করে। বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তাঁকে নিয়ে যথাযথ চর্চা শুরু হয় অনেক পরে, ১৯৪০-এর দশকে। হয়তো এসময়ে রসসাহিত্যে ত্রৈলোক্য-পন্থী ধারার সজীবতা অন্যতম কারণ। পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু বা একটু পরে সম্বুদ্ধ ওরফে অমূল্যকুমার দাশগুপ্তের ব্যঙ্গরসের তীব্র আমেজ সাহিত্যের আসর জমিয়ে তোলে। ত্রৈলোক্যনাথকে ফিরে পড়ার প্রয়োজনও অনুভূত হয়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে *কঙ্কাবতী* নিয়ে গবেষণা করেছেন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ত্রৈলোক্যনাথের সমগ্র সাহিত্য নিয়ে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ লিখলেন প্রমথনাথ বিশী। সেখানে প্রমথনাথ সরাসরি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগমনকে ত্রৈলোক্যনাথের বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাবার অন্যতম কারণ হিসেবেই দেখেছেন। ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনা রয়েছে সজনীকান্ত দাশের লেখায়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের এই লেখাটিতে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে শুনিয়েছেন ত্রৈলোক্য-কাহিনি। প্রিয় উপন্যাস *কঙ্কাবতী* পড়তে পড়তে একসময় ঘুমিয়ে পড়েন সজনীকান্ত। স্বপ্নে দেখা দিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে সজনীকান্ত শুনলেন ত্রৈলোক্যনাথের নিজের কথা, বইয়ের জগৎ, তাঁর বিস্মৃতির হালহকিকত। ১৯৫০-এর দশক থেকে ত্রৈলোক্যনাথ আবার বাংলা সাহিত্যে কলকে পেলেন। *কঙ্কাবতী*-র নতুন নতুন সংস্করণ, গ্রন্থমেলা প্রকাশিত ২ খণ্ডে ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলি এল হাতের নাগালে। পরিমল গোস্বামী থেকে হাল আমলের ইন্দ্র মিত্র পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আলোচনা অব্যাহত।

বর্তমান অংশে ত্রৈলোক্য-সাহিত্য সমালোচনার ধারার উপযুক্ত তিনটি লেখা পেশ করা হল। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ বিশী ও সজনীকান্ত দাশ-এর রচনা তিনটে মিলিয়ে পড়লে একদা বাংলা সাহিত্যের ব্রাত্য লেখককে বোঝা সহজ হতে পারে এমন আশাই সংগত।

কঙ্কাবতীর সমালোচনা *
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানেব দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তি-মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটি গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই সমস্ত ত্রুটী মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ

* সাধনা, ২/১, ফাল্গুন ১২৯৯, পৃ. ৩৫৭-৩৬০।

আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধূলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এই জন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। চার্লস ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কি? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কি, লক্ষ্য কি? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙে মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভ বিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্ব কথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটী সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোন দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়-জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় *
(১৮৪৭-১৯১৯)
প্রমথনাথ বিশী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বড়ই বিস্ময়ের কথা। বসুমতী গ্রন্থাবলী-সিরিজ ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় না।[১] বসুমতী গ্রন্থাবলীও সম্পূর্ণ নহে। তাঁহার ইংরেজি রচনা ভারতীয় শিল্পের পরিচয়-গ্রন্থাবলী বোধ করি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী গ্রন্থখানার কথা কোনো কোনো পাঠকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সে অনেকটা কিংবদন্তীর মত, পঠিত-অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের একজন major বা মহৎ লেখকের এমন অবলুপ্তি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের হেতু।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা satirist। সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে স্যাটায়ার বা স্যাটায়ারিস্টের অভাব নাই। মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যিকের রচনায় কিছু-না-কিছু স্যাটায়ার আছে, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্যঙ্গসাহিত্যিকের দৃষ্টি নয়; ব্যঙ্গসাহিত্যিক যে-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিয়া থাকেন সে-দৃষ্টিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নন, সে-দৃষ্টি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গের বক্রদৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বিশুদ্ধ ও নিছক ব্যঙ্গরচনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এখন একজন বিস্মৃতপ্রায় লেখকের পক্ষ হইতে এত বড় দাবির উত্থাপন অনেকের কাছেই বিস্ময়কর লাগিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে স্মৃতি ও বিস্মৃতি, খ্যাতি ও অবলুপ্তি বিচারের অপেক্ষা রুচির উপরেই বেশি নির্ভর করে; আর রুচির ন্যায় পিচ্ছিল ও চঞ্চল বৃত্তি অল্পই আছে, কাজেই ত্রৈলোক্যনাথের অবলুপ্তিতে বিস্মিত না হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। বিচারান্তে যদি প্রমাণ হয় আমরা তাঁহার পক্ষ হইতে যে দাবি উত্থাপন করিলাম তাহা সত্য, তবে প্রসন্নমনে বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গরচনার শ্রেষ্ঠ আসনখানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই সংগত। রচনার পরিমাণ ও গুণ এই দুই দিকের বিচারেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তদপেক্ষা বড় কথা এই যে, ব্যঙ্গশিল্পীর সম্পূর্ণ সহজাত বক্রদৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন. এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে তিনি একাই। অপর যাঁহারা ব্যঙ্গরচনা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশক্ষেত্রেই *tour de force*, স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নহে।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনের ঘটনা ও ভাবনার ধারা না বুঝিলে তাঁহার সাহিত্য বোঝা দুর্ঘট হইবে। তাঁহার বাল্যকালের ও প্রথমযৌবনের দুঃখদারিদ্র্য, সেই দুঃখদারিদ্র্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার মনুষ্যত্ব, অপরের দুঃখদুর্দশার প্রতি তাঁহার সমবেদনাপূর্ণ আত্মীয়তা—এ সমস্তই একাধারে তাঁহার জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ। একটিকে জানিলে তবে

১

* বাংলার লেখক, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ১৬-৩৬।

১ সম্প্রতি শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'কঙ্কাবতী' পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে

অপরটি বুঝিয়া ওঠা সহজ। তার পরে কর্মজীবনে দেশের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও অসহায় ভাব দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যেমন করিয়া পারেন, আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার কর্মজীবন, দেশীয় শিল্প প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের ইতিহাস রচনা, পরিণত বয়সে আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে বিলাতযাত্রা—সমস্তই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার অংশ। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবনকর্মেরই একটা প্রক্ষেপ মাত্র, তাঁহার অবসরজীবন তাঁহার কর্মজীবনের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্মে ও অবসরে, ঘটনায় ও ভাবনায় এ রকম একপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলাদেশে সত্যই বিরল। ব্যক্তিত্বের বিচারে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বাংলাদেশেও তাঁহার মত নিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখন হইতে এক শতাব্দী পূর্বে, ১২৫৪ (১৮৪৭) সালের ৬ শ্রাবণ, ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল। কতকটা সেই কারণে, কতকটা সেকালের নূতন-আমদানি ম্যালেরিয়ার জন্য, আর অল্প বয়সেই পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির ফলে তাঁহার ইস্কুলের লেখাপড়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয়-জাত জ্ঞানলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর নিরুদ্দেশ সংসারে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তখন হইতে অজানা পৃথিবীর অনাত্মীয় পথঘাটই তাঁহার প্রকৃত বিদ্যালয় হইয়া উঠিল।

১৮৬৫ সালে পদব্রজে তিনি মানভূম-পুরুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠারোর বেশি নহে। পথের কষ্ট অবর্ণনীয়। তার পরে ১৮৬৮ সালে তিনি কটক জেলায় পুলিশ-দারোগার সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করিলেন। মাঝখানের তিন বৎসর তাঁহার জীবনের দুর্বহ দুঃখকষ্ট ও খণ্ডিত চাকুরির ইতিহাস। এই তিন বৎসরে তিনি বীরভূমের দুইটি ইস্কুলে আর পাবনা জেলার সাজাদপুরের একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এই তিন বৎসর পথে-ঘাটে যে দুঃখকষ্ট তিনি পাইয়াছেন তাহার প্রধান কারণ তাঁহার অনমনীয় আত্মসম্মানবোধ। দীর্ঘ বিদেশযাত্রায় বাহির হইতেছেন, হাতে একটিও পয়সা নাই, অথচ পরমাত্মীয়ের নিকটেও টাকাপয়সা চাহিবেন না। এমন লোকের পক্ষে অপরিচিত স্থানে ক্লেশ ছাড়া আর কি জুটিবে।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—

আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে বর্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটি-ইন্সপেক্‌টার অব্ স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাস্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন, সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন, কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ি ফিরিয়া আসিয়া বর্ধমানের দিকে চলিলাম। পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়িতে কোনোরূপ শুভকার্য হইয়াছে, ইহাদের বাড়িতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথমজীবনে অবিরল। বাল্যকালে তিনি দরিদ্র ছিলেন, দুরন্ত ছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁহার বিদ্যাসাগরী প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ। এই শেষোক্ত গুণটি তাঁহার চরিত্রে অতিমাত্রায় না থাকিলে শেষপর্যন্ত তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

আর-একবারের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—

সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর শানবাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি তো কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভালো। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না, একটা তেঁতুলগাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা বারোটার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথমজীবন এইরূপ শোচনীয় অভিজ্ঞতায় পূর্ণ— কিন্তু কখনোই তিনি আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেন নাই।

ইহার পরে যখন তিনি উখড়ায় দ্বিতীয়-শিক্ষকের কার্য করিতেছেন, তখন সেখানে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্ষুধার কঙ্কালসার মূর্তি চারি দিকে। অপরের ক্ষুধার সঙ্গে নিজের ক্ষুধাও মিশিল। দেশের শিশুভাইদের জন্য টাকা বাঁচাইতে গিয়া অনেক দিনই তাঁহাকে একান্ন, কখনো-কখনো বা সারাদিন অনাহারে থাকিতে হইত। ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলে শীতল জল পান করিয়া শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ করিতেন। সেই সময়ে দ্বিবিধ ক্ষুধার অশ্রু-সরস্বতীর তীরে বসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা-কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্তত অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন; বড়জোর নাহয় ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবদুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে?

ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞাই তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাঁহার কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনকে এই একটি মেরুদণ্ডই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। কর্মের দ্বারা যতদিন সম্ভব এই প্রতিজ্ঞা-পালনে তিনি তৎপর ছিলেন, কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিজ্ঞা-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁহার সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাঁহার প্রতিজ্ঞা, এবং প্রতিজ্ঞার পটভূমিস্বরূপ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথমে বুঝিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়াই এত বিস্তারিতভাবে তাঁহার জীবনের এই অংশটিকে ব্যাখ্যা করিতে হইল।

সরকারি চাকুরিতে ঢুকিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দুইজন উদার ও উন্নতমনা ইংরেজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্যর উইলিয়াম হাণ্টার ও স্যর এডওয়ার্ড বক্। ইহাদের সাহায্যে ও নিজের কর্মকুশলতায় তিনি ক্রমে ক্রমে গবর্মেন্টের স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ও কৃষিবাণিজ্য বিভাগে দায়িত্বসম্পন্ন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রাখিতেন। এই সময়ে দেশের শিল্পপ্রসারের জন্য তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন। বড় বড় রেলস্টেসনে ও হোটেলে দেশীয় শিল্পবস্তু রাখিয়া বিক্রয় করিবার যে ব্যবস্থা এখন চলিত আছে তাহা তাঁহারই প্রবর্তিত। ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিয়া তদ্দারা লোকের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে, তিনি গবর্মেণ্টকে এই প্রস্তাবটি দেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হওয়াতে বহু সহস্র লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যায়। অতঃপর তিনি রাজস্ববিভাগে বদলি হন।

১৮৮৬ সালে বিলাতে শিল্পপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়। দেশীয় শিল্পপ্রসারে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় তিনি সামাজিক সংস্কারের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিলাতযাত্রা করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার *Visit to*

Europe গ্রন্থে লিখিত আছে।

সরকারি চাকুরির শেষ কয়েক বছর তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি ১৮৯৬ সালে পেনসন লন।

১৯১৯এর নভেম্বর মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার প্রকৃত সাহিত্যজীবন সরকারি চাকুরি হইতে অবসর লইবার পরেই আরম্ভ হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী দ্বিভাষিক, ইংরেজি ও বাংলা।

ইংরেজি গ্রন্থগুলি ভারতীয় শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যাদির বর্ণনা ও ইতিহাস। তাঁহার বাংলা রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান ও নীতিবিষয়ক গ্রন্থ; তিনি ও তাঁহার অগ্রজ একযোগে বিশ্বকোষ নামে অভিধানগ্রন্থ-রচনার সূত্রপাত করেন; তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তাঁহার রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাবলী।

বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য-গ্রন্থাবলীই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে তাঁহার ইংরেজি ও বাংলা সমুদয় গ্রন্থই একই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত—দেশের কল্যাণসাধন। তাঁহার প্রথমজীবনের প্রতিজ্ঞার কথা কি ভাবে তিনি বিস্মৃত হইবেন?

২

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অন্য শ্রেণীর সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে। অন্য শিল্পের মৌলিক প্রেরণা যাহাই হোক, মূলটা গুপ্ত থাকে; কিন্তু ব্যঙ্গের মূলটা যে শুধু মুখ্য তাহাই নয়, মূলটাকে অনেক সময়েই গোপন রাখা চলে না। উপমার ভাষায় ব্যঙ্গ যেন মূলা; মূলটাই এখানে মুখ্য, সমস্ত গাছের লক্ষ্য ওই মূলটাকে পুষ্ট করিয়া তোলা। ইহাই ব্যঙ্গের প্রধান গুণ, আবার এইখানেই তাহার গুণের সীমা। ব্যঙ্গ অত্যুচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, কিন্তু কোনো মতেই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্যে গণ্য হইতে পারে না।

ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক শিল্প, অর্থাৎ ইহাকে একপ্রকার প্রচারসাহিত্য বলা যাইতে পারে। মনুষ্যত্বের অনুকূলে ব্যঙ্গ চিরকাল প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে লোকটা স্বেচ্ছাকৃত নকিব হইয়া তারস্বরে তাহার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে তাহাকে দ্বারের কাছেই রাখিয়া দেয়, আর যে-কবিতা তাহার কানে-কানে স্বর্গীয় প্রলাপবাণী ঢালিতে থাকে, সাংসারিক প্রয়োজনসাধনে যে-প্রলাপের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, সেই স্বর্গীয় প্রলাপবাদিনীকে অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসায়। সকল দেশে সকল কালেই কবিতার স্থান ব্যঙ্গের অনেক ঊর্ধ্বে।

ব্যঙ্গসাহিত্যিকগণ তাঁহাদের শিল্পের এই ন্যূনতার কথা জানেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা প্রধানত সংসারের মঙ্গলসাধন করিতে চান। মূলত তাঁহারা কর্মী, কিন্তু কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে বলিয়াই যেন শিল্পের মাধ্যমে তাঁহাদের কর্মপ্রবণ চিত্ত আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ব্যঙ্গশিল্প সাহিত্যিকের কর্মশক্তিরই যেন একটা প্রক্ষেপ। এইজন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিকদের অনেকেই কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইলে হয়তো তাঁহারা আর শিল্পমাধ্যমের প্রয়োগে অগ্রসর হইতেন না। আপাতত ভল্‌টেয়ার ও সুইফ্‌টের নাম মনে পড়িতেছে। ভল্‌টেয়ারের মত কর্মকুশলতা খুব অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। শুধু সাহিত্যিক কেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁহার জুড়ি মেলা সহজ নয়। পরবর্তী কালে ধনোপার্জনে ও ব্যবসায়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী যে সার্থক প্রবণতা দেখাইয়াছে, ভল্‌টেয়ার তাহার আদর্শস্থল। তাঁহাকে প্রথম সার্থক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। অর্থোপার্জনে তাঁহার যে কেবল কুশলতা ছিল তাহা নয়, পন্থার ভালোমন্দ বিচারেরও অভাব তাঁহার ছিল। তৎকালে যুদ্ধের বাজারে টাকা খাটাইয়া, সব সময়ে সদুপায়ে নয়, তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবারের যুদ্ধের বাজারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না বলিয়া খুব সম্ভবত তাঁহার মধ্যেকার ব্যবসায়ীটা পরলোকে বসিয়া বুক চাপড়াইয়া মরিতেছে। ভল্‌টেয়ারের আর্থিক-

দুর্নীতিপরায়ণতার উল্লেখের জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা নয়, তাঁহার কর্মকুশলতার বর্ণনার জন্য মাত্র। সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে কর্মীপুরুষ ছিলেন তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্যঙ্গশিল্পের উদ্ভবের কারণ কি? সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষগুণের সমন্বয়ের ফলেই ব্যঙ্গশিল্পের, তথা সমস্ত শিল্পেরই, উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষের সমাজে এক-একটা যুগ আসে, ব্যঙ্গরচনার যাহা অনুকূল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল এইরকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ছিলেন ভলটেয়ার ও সুইফট্। সে যুগে কবির অভাব ছিল না, কিন্তু ব্যঙ্গই ছিল তখনকার প্রধান শিল্প। ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ দুই যতই ভিন্নশাখাশ্রয়ী হোক-না কেন, এক জায়গায় মিল আছে। দুইয়েরই অন্যতম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার ও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস একই শাখার ফল, একই রসে পুষ্ট। বাংলা সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের সঙ্গে ওদেশের অষ্টাদশ শতকের কার্যকারণের ঐক্য থাকা সম্ভব নয়, তৎসত্ত্বেও দেখি অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন উঁচুদরের ব্যঙ্গলেখক। এ কেমন করিয়া হইল? তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি একই হাওয়া বহিতেছিল?

এ যেমন গেল যুগের গুণ, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ আছে। সংসার ভালোয়-মন্দয় জড়িত। কোনো-কোনো লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্বভাবতই ভালোর দিকে, কাহারও আবার মন্দর দিকে। সংসারের ভালো দেখিয়া কেহ বা উল্লসিত হন, মন্দটা দেখিয়া কেহ বা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন। আর ভালো-মন্দকে সমান ভাবে দেখিবার সৌভাগ্য ও শক্তি মানুষের কদাচিৎ দেখা যায়, যে দেখিতে পারে সে শেক্স্পীয়ার হয়।

বুঝিলাম যে বিশিষ্ট কালগুণ আছে, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তিগুণ আছে। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয় হয় কিরূপে? কাকতালীয় না কার্যকারণসম্ভূত? ভালো-মন্দ সব সময়েই আছে, তবে এক-একটা সময়ে এক-একটা দিক উগ্রতর হইয়া ওঠে, আর এমন হইবার পিছনে পূর্বগামী অনেক কার্যকারণের ধাক্কা থাকে। সাধারণত দেখা যায়, কোনো-একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসানকালই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়। রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে ভলটেয়ার, বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদনার পরে বিদ্যাসুন্দর; বিদ্যাসুন্দর রাধাকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র।

জগতের কল্যাণরূপ যেসব শিল্পীর চোখে পড়ে তাহারা জগতের কবিশ্রেষ্ঠ হয়। গোটে আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, ইঁহারা কখনো-কখনো স্যাটায়ার-রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, দৃষ্টিভঙ্গী ও যুগধর্ম দুইই প্রতিকূল। শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ একই কারণে বারংবার ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

ভলটেয়ার তৎকালীন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ব্যঙ্গ-পুস্তিকার বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসি তাঁহার ক্রোধের চেয়েও মারাত্মক। মানবজীবনের দুঃখের লবণাম্বুরাশির দ্বীপমালার ভ্রান্ত পথিক ইউলিসিসের মত ভলটেয়ার গৃহে ফিরিয়া দেখেন যে মানুষের শুভবুদ্ধিকে মূঢ় প্রণয়ীর দল ঘিরিয়া ধরিয়াছে। তখন তাঁহার ধনুক হইতে যে *Candide*-শর নিক্ষিপ্ত হইল তাহা আজিও মূঢ়তার সপ্ততাল ভেদ করিতে করিতেই চলিয়াছে। ভলটেয়ার কখনো ভোলেন নাই যে ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক, এবং নিজের উদ্দেশ্যের মূল সম্বন্ধেও তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন যে ধর্মান্ধতা ও মূঢ়বুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যঙ্গরসিকের সহজাত দৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন। তিনি কি চাহিতেন তিনি জানিতেন। তিনি জানিতেন মানুষ বড়ই হৃদয়হীন, বড়ই নৃশংস। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ছাড়া আর-কিছু বড় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। পৃথিবী যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে না তাহা তিনি জানিতেন। তবে মানুষে আর-একটু যদি হৃদয়বান্ হয়, আর-একটু পরার্থপর হয়, আর-একটু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তবে সংসারের দু-একটি কণ্টক উৎপাটিত হইয়া স্থানটা আর-একটু ভদ্ররকম ও বাসোপযোগী হয়। ইহাই তো যথেষ্ট। ইহার বেশি আর-কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাই তদধিক তিনি কিছু চাহিতেন না। ভলটেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ধর্মান্ধতা ও বুদ্ধির মূঢ়তা, ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে তেমনি হৃদয়হীনতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। এই দুটির কবল হইতে মানুষ আর-একটু মুক্ত হোক, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুখানি সজাগ করিয়া তোলাই তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

মানুষ কেবল যে মানুষের প্রতি হৃদয়বান্ হইবে মাত্র তাহাই নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাহার ব্যবহার সদয়তর

হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষে যে নৃশংস আচরণ করে ইহা তাঁহাকে বড় বাজিত। মূঢ় পশুদের প্রতি এমন করুণা অল্প বাঙালি সাহিত্যিকের রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গড়গড়িমহাশয় কলিকাতায় গিয়া তাহার গুরুদেবের কশাইবৃত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাহার গুরুদেবের পাঁঠার বেনামে ছাগল বধের কৌশল বর্ণিত হইতেছে—

তাহার পর তাহার [ছাগলটির] মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা, আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম।

আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ঠাকুর মহাশয়, করেন কি! উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।' ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, 'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা কম্পিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে বসিয়াছি বাবা। দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।' আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে। মাথার উপরে কি ভগবান নাই?

নৃশংসভাবে নিহত সেই অসহায় দুর্বল পশুটির দৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। সেই দৃষ্টি বারংবার পাঠককে ডাকিয়া বলে, আর কিছু নয়, তোমরা ওই অতিরিক্ত দুই আনার লোভ বর্জন করো। আমার ছাল যদি একান্তই চাও, অন্তত আগে আমাকে বধ করিয়া লও। মানুষের কাছে ত্রৈলোক্যনাথের আশা অতি যৎসামান্য. পশুবধ যদি নিতান্তই বর্জন করিতে না পার ব্যাপারটাকে যত অল্প সম্ভব নৃশংস করো। ষোলো আনার লোভ পরিত্যাগ যদি সম্ভব না হয় অতিরিক্ত দুই আনার লোভ পরিত্যাগ করো, তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে না।

পশুপক্ষী এবং মানবসমাজের অন্তর্গত অসহায় দুর্বলের প্রতি করুণা ত্রৈলোক্যনাথের রচনার প্রধানতম সম্পদ। ভল্‌টেয়ারের হাসি শীতের তীব্র বাতাসের মত জলকণাশূন্য, তাহা হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি শরতের প্রথম উত্তরের হাওয়া, তাহাতে শিশিরের স্পর্শ আছে।

এই জীবনদর্শন-প্রকাশের বাহন তাঁহার হাসি এবং তাঁহার ভাষা। তাঁহার ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পদ ও অলৌকিক মহিমা আশা করা বৃথা। এই ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য শরবৎ ঋজুগতি। ঋজুতাই ব্যঙ্গের প্রধান সম্পদ। ভাষা যদি ঋজু না হয় তবে ব্যঙ্গের প্রচণ্ডতার অনেকটাই মাঝপথে নষ্ট হইয়া যায়। অনাড়ম্বর সরল ভাষার মাধ্যম ব্যঙ্গের তীব্রতাকে একটুও নষ্ট হইতে দেয় না। আর এই অনাড়ম্বর ভাষার মেরুদণ্ড লেখকের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি। তাঁহার চারি দিকে যাহা ঘটিতেছে তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তির আতস-কাঁচের ভিতর দিয়া তাহাকে তীব্রতর ভাবে রূপদানের ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তি ও তাহার বাহনস্বরূপ অনাড়ম্বর ভাষার উদাহরণ পাপের পরিণাম (১৯০৮) গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

খাঁদা ভূত রাত্রে বিকট শব্দ করিতেছে হু হু হু হু। তেঁতুলগাছ হইতে যাই এই শব্দ উত্থিত হইল আর চারি দিকে হ্যাক্কা-হুয়া হ্যাক্কা-হুয়া-হুঃ শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃষ্টিবাদল না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে একবার তাহারা এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল

হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া ভিজিতেছিল। কক্‌-কক্‌ রবে তাহারও চারি দিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্‌-সন্‌ রবে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেঁচকগণ হুট্‌-হুট্‌ রবে রায়মহাশয়ের অট্টালিকাগাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে কুকুরগুলা ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইলে যেই সেই তেঁতুলগাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ-পদদ্বয়ের উপরে ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া দূর হইতে তেঁতুলগাছের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ংকর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পরে আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

পশুপক্ষীর ব্যবহারের এই চিত্র বাস্তবতায় উজ্জ্বল। সহৃদয়তার দৃষ্টিতে পশুপক্ষীর জগৎকে যে দেখিয়াছে কেবল তাহার পক্ষেই এইরূপ পর্যবেক্ষণ সম্ভব।

পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন ত্রৈলোক্যনাথের প্রচুর পরিমাণে ছিল কল্পনাশক্তি তেমন ছিল না। বস্তুত দিব্য কল্পনাশক্তির যেন তাঁহার কিছু অভাব ছিল। আর কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য ব্যতীত কেহই শিল্পের চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠব্যঙ্গশিল্পীরও প্রচুর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সত্য বলিতে কি, অনেক সময়েই দেখা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীগণ উঁচুদরের কবিও বটে— যেমন মলিয়ের, অ্যারিস্টফেনিস এবং হায়্‌নে। এই কল্পনাশক্তির অভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পীদের অন্যতম হইতে পারেন নাই, শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যঙ্গশিল্পী মাত্র হইয়া আছেন। তাঁহার ভূত ও মানুষ (১৮৯৬) গ্রন্থের প্রথম গল্প বাঙাল নিধিরাম কোনো কোনো স্থানে হুগোর *Toilers of the Sea* র অনুক্রমণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা লেখকের অভিপ্রেত কি না জানি না। কিন্তু এ দাবি করা উচিত নয়। বাঙাল নিধিরামে সহৃদয়তাগুণ আছে, পর্যবেক্ষণশক্তির অভাব নাই, গল্প বলিবার ক্ষমতাও অসাধারণ, কিন্তু হুগোর কাব্য-উপন্যাসের এবং তাঁহার সমস্ত রচনারই যাহা প্রধান গুণ সেই অলৌকিক কল্পনাশক্তি কোথায়? হুগোর যে কল্পনার নিকটে সমুদ্রও গোষ্পদ, সেই কল্পনা কোথায়? হুগোর কল্পনা ও ভাষার কোটালের বন্যা না থাকিলে তাঁহার কাব্যের (*Toilers of the Sea* কাব্য ছাড়া আর কি?) অনুসরণ করিবার আশা বৃথা। যে গুণে হুগোর মহত্ত্ব, সেই গুণেই ত্রৈলোক্যনাথের দীনতা; কাজেই হুগোকে অনুসরণ করিবার শক্তি তাঁহার স্বল্পতম। বরঞ্চ তিনি ভল্‌টেয়ার বা সুইফ্‌টের কোনো গ্রন্থের ভাবানুসরণ করিলে আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গদৃষ্টি, জীবনদর্শন, বিশেষ শক্তি ও বিশেষ শক্তির অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এবার তাঁহার শিল্পের টেকনিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

৩

ত্রৈলোক্যনাথ গল্প বলিবার সহজাত শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই শক্তি অতিশয় বিরল। গল্প অনেকেই লেখেন, কিন্তু গল্প বলিবার ভঙ্গি সাহিত্য হইতে প্রায় লোপ পাইবার মুখে। সাহিত্য লিখিত-আকার ধারণ করিবার পূর্বে গল্প বলিবার ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা লুপ্তপ্রায়। এখন আমরা গল্প পড়ি, গল্প শুনি না। ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মধ্যে গল্প বলিবার আদিম-শক্তি বিদ্যমান। সে গল্পও আবার বাংলায় যাহাকে আষাঢ়ে গল্প বলে। এ শক্তি বাংলা সাহিত্যে অতি বিরল বলিলেও চলে।

আরব্যোপন্যাস এখন লিখিত-আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথনগুণ এখনো যেন ধ্বনিত। ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না, অদৃশ্য কথক বলিয়া যাইতেছে, আমরা শুনিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আরও একটি কারণে আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করিতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের টেকনিক বস্তুত আরব্যোপন্যাসের টেকনিক। এই অমর কাব্য উপন্যাস নয়, আবার গল্পও নয়— অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আর-একটি গল্প গ্রন্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই গল্পের শৃঙ্খল। কঙ্কাবতী (১৮৯২), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ফোকলা

দিগম্বর (১৯০১) ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব রচনাই গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। ডমরু-চরিত (১৯২৩), মজার গল্প (১৯০৬), মুক্তামালা (১৯০২) এমন কি ভূত ও মানুষ-এর লুল্লু সবই গল্পসমষ্টি। এগুলি উপন্যাসও নয় ছোট গল্পও নয়, একটি কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলি গল্পের সমষ্টি মাত্র। একটা শক্ত কাঠামোর মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে ঘনীভূত করিয়া আঁটিয়া দিলে কথনগুণ অনেক পরিমাণে লোপ পায়। সে চেষ্টা লেখক করেন নাই। শিথিলপিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহুতর গল্পকে সন্নিবেশ করিয়া রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ সামান্য গুণ নয়।

তাঁহার রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়িবে। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের উপাদান ভূতপ্রেত, দেত্যদানো। স্বপ্ন বা তজ্জাতীয় অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা তাঁহার অন্যতম প্রকাশপন্থা। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভুতুড়ে গল্পের লেখক বলিয়া সংক্ষেপে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তাঁহার উপাদান ভূতপ্রেত, কিন্তু কেবল ভুতুড়ে গল্প বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

সুইফ্‌ট্ গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রব্‌ডিংনাগের অবতারণা করিয়াছেন। কি জন্য? মানবচরিত্রের অসংগতি প্রদর্শনই তাঁহার লক্ষ্য। এই অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের সৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিসামর্থ্যের নিরর্থকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূতপ্রেতের আবির্ভাব; মানুষের খেয়ালখুশি ও কল্পনাকে যথেচ্ছ দৌড় দিবার উদ্দেশ্যেই বাস্তববন্ধনবর্জিত স্বপ্নপ্রসঙ্গের অবতারণা।

মানুষের অসংগতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের সহিত মানবসমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহু প্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।

লুল্লু গল্পে একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া গল্পের নায়ক আমীর তাহাকে বশ করিয়া ফেলে। আমীর বলিতেছে, মানুষ-সম্পাদকের গালিতে আর খবরের কাগজ আগের মতন বিকায় না, এখন ভূত-সম্পাদক হইয়া ভূতের গালি প্রয়োগ করিলে কাগজ বিকাইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ভূতে ও মানুষে এই যে অসংগতি, এবং এই অসংগতিজাত ব্যঙ্গ, ইহা আর কি ভাবে ফুটানো যাইত!

আর-এক স্থলে তিনি বাংলা থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে শবসাধনার উল্লেখ করিয়াছেন। শবসাধক আর-সব বিভীষিকাকে জয় করিতে সমর্থ হইল কিন্তু ভৌতিক সত্তা থিয়েটারের বীরের ভঙ্গিতে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করা মাত্র সে শবাসন ছাড়িয়া পলায়ন করিল, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ইহা এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে আর কেমন করিয়া দেখানো যাইত?

ঠিক এই একই উদ্দেশ্যে স্বপ্নপ্রসঙ্গেরও অবতারণা তাঁহার রচনায়। কঙ্কাবতীর স্বপ্ন, ভূত ও মানুষ গ্রন্থের বীরবালা গল্পে নায়কের মূর্ছা তাঁহার বক্তব্যপ্রকাশের সমীচীনতম পন্থা। ত্রৈলোক্যনাথ যদি বাস্তবপন্থার লেখক হইতেন তবে এসব দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পে এগুলি দোষ তো নয়ই বরঞ্চ এইগুলিই সর্বজনস্বীকৃত বহুসমাদৃত চিরকালীন প্রকাশভঙ্গি।

ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কঙ্কাবতী সবচেয়ে জনপ্রিয়। বাংলাদেশের বহুপ্রচলিত একটি জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসাকারে সামাজিক ব্যঙ্গের এই ঊর্ণাতন্তু রচিত। ভূতপ্রেত ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি লেখকের প্রিয় টেকনিক ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কঙ্কাবতীর রোগশয্যায় স্বপ্ন ও প্রলাপই পরবর্তী কাহিনীর বৃহত্তর অংশের বাহন। ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী বলিয়া মনে হইলেও ইহা মূলত সামাজিক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও ডন্‌কুইক্‌সটের অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির মত এই শ্লেষপূর্ণ চমকপ্রদ গ্রন্থ একাধারে বালক ও বয়স্ক দুই শ্রেণীর পাঠকেরই প্রিয়।

পাপের পরিণাম ও ফোকলা দিগম্বরে গল্পের জাল বুনিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পাপের পরিণাম

স্পষ্টত নীতিকথাপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এমন স্থলে গ্রন্থ প্রায়ই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখকের শিল্পকৌশল গ্রন্থখানাকে আশ্চর্যরকমের সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

বীরবালা একখানা রূপক-কাহিনী। খুব সম্ভবত ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন গৌরব, ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের যোগস্থাপন প্রভৃতিই কাহিনীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।

কিন্তু লেখকের বিশিষ্টতম শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে ডমরু-চরিত, ভূত ও মানুষ গ্রন্থের লুল্লু ও নয়নচাঁদের ব্যবসা, এবং মুক্তা-মালার কোনো কোনো গল্পে।

ডমরুধর ও নয়নচাঁদ তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি, আর শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের আসরেও তাহাদের জুড়ি মেলা ভার। ইহাদের বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে আস্ত বই দুখানাই উদ্ধার করিয়া দিতে হয়; তাহার চেয়ে বই দুখানা পড়িয়া লইবার ভার পাঠকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো।

৪

ত্রৈলোক্যনাথের মত বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ লেখকের অবলুপ্তির কারণ কি। কারণ যাহাই হোক, ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। ঠিক এই সময়েই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। শরৎসাহিত্যের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তা যে ত্রৈলোক্যনাথের বিস্মৃতির একটি কারণ তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ঠিক এই একই কারণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সাধারণ পাঠকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অথচ ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতই অসাধারণ। তবে এমন কেন হইল? শরৎসাহিত্যের সর্বজনবোধ্যতা, সহজসম্বেদ, ভাষার উজ্জ্বলতা ও ঈষৎলঘু ভাবালুতার নিকটে পূর্বোল্লিখিত লেখকদ্বয়ের ব্যঙ্গ রঙ্গ ও কশাঘাত, উদ্দেশ্যমূলক হাসি এবং বুদ্ধির প্রতি আবেদন পরাজিত হইয়াছে। অশ্রুর নিকটে হাসির পরাজয়, ভাবালুতার আবেদনের নিকটে বুদ্ধির পরাজয়। ইহা স্বাভাবিক হইলেও যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। বাঙালি পাঠকের কাছে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের আবেদনই অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, শরৎসাহিত্যের জনপ্রিয়তা তাহারই একটি প্রকাশ। ত্রৈলোক্যনাথ বিস্মৃতপ্রায় হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট রচনানীতি লুপ্ত হয় নাই। পরশুরাম ও আধুনিকতর কোনো কোনো লেখকের ব্যঙ্গরচনায় তাঁহারই ধারা প্রবাহিত। কাজেই তাঁহার প্রতিভা বন্ধ্যা নহে, পরবর্তী অনেক রচনার জননী।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমারের রচনায় চিরকালীন বস্তুর অভাব হয় নাই। কাজেই তাঁহাদের ক্ষণিক অবলুপ্তি স্থায়ী নশ্বরতা নহে। তাঁহাদের রচনার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এখন উদ্‌যোগী প্রকাশকগণ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর সহজলভ্য নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলে এই আবির্ভাবের স্পৃহনীয় আনুকূল্য করিবেন। তাঁহাদেরও ক্ষতি হইবে না, আবার বাঙালি পাঠকগণও লাভবান হইবেন।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প

শ্রীসজনীকান্ত দাস

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাতে কয়দিন সর্দিজ্বরে শয্যাশায়ী ছিলাম; এই অবস্থায় কিছুই ভাল লাগে না, ভুতুড়ে ও ডিটেকটিভ গল্প পড়া ছাড়া। আজকালকার অতি-বৈজ্ঞানিক খেল্-সমন্বিত অর্থাৎ ডুবো-জাহাজ উড়ো-জাহাজ মার্কা ডিটেকটিভ গল্প আমার পছন্দ নয়, আমি এখনও পুরাতন "কেশরঞ্জনের উপহার" এবং পাঁচকড়ি দের রোমাণ্টিক ডিটেকটিভ গল্পের পক্ষপাতী; রোমহর্ষক বা রোমাঞ্চকারী গল্পের চাইতে স্বেদ-কম্প-পুলক-অশ্রুপ্লাবিত রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত প্রেমের গোয়েন্দা কাহিনী আমার বেশী প্রিয়। তেমন কোনও বই হাতের কাছে না পাইয়া ভুতুড়ে গল্পের শরণাপন্ন হইতে হইল। বাংলা ভাষায় ভুতুড়ে গল্প মানেই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'মজার গল্প' এবং 'ডমরু-চরিত'। প্রাচীন রূপকথার আশ্রয় ছাড়া ভূতের গল্প যাঁহারাই লিখিয়াছেন তাঁহারাই ত্রৈলোকানাথকে বেমালুম মারিয়া দিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার যতটুকু খ্যাতি বা অখ্যাতি সমস্তটাই ভূতের গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'কঙ্কাবতী' হাতের কাছেই ছিল, পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথের সম্বন্ধে কিছু গবেষণামূলক চিন্তা মনে উদিত হইল, তাহা এই :—

বহুকাল পূর্বে পুরাতন 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় (১২৯৮-১৩০৫ বঙ্গাব্দ) ত্রৈলোকানাথের 'লুল্লু' প্রভৃতি গল্প পড়িয়াছিলাম। পরে কলিকাতার ফুটপাত হইতে 'বঙ্গবাসী' আপিস কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র 'কঙ্কাবতী' এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পড়িয়া ভূতের গল্প বলিয়া মনে হয় নাই; সাধারণ মানব জীবনেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী। নায়িকা কঙ্কাবতী অসুখে অজ্ঞান হইয়া তাঁহার আবালাশ্রুত ভুতুড়ে গল্পের ভূতদের সঙ্গেই নিজেকে এবং প্রিয়পরিজনকে জড়াইয়া একটা বিরাট স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বইয়ের ভূত কোনটাই আসল ভূত নয়, কঙ্কাবতীর কল্পনা-রাজ্যের ভূত। ইহাদের সাহায্যে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার গল্পটিকে এক অনিবার্য কল্যাণকর পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ত্রৈলোকানাথের অপূর্ব বর্ণনাকৌশলে কল্পনার ভূতেরা সত্যকার ভূত হইয়া উঠিয়া পাঠকের মনকে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, বইটির ছবিগুলি কে আঁকিয়াছিলেন জানি না, ছবির গুণেও ভূতেদের আর ভুলিবার উপায় ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'সাধনা' মাসিকপত্রে 'কঙ্কাবতী'র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়া 'কঙ্কাবতী'কে বাংলাসাহিত্যে স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা একটু উদ্ধৃত করিতেছি:

"এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্যসারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ

* দেবালয়, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ ৩০৫-৩১৪

বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।...

"...আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালকবালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।"

একটা মজার কথা জানিয়া রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথের চাইতে ত্রৈলোক্যনাথ পুরা চৌদ্দ বৎসরের বড়। ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন চব্বিশপরগণা শ্যামনগর-ভাটপাড়ার সন্নিকট রাহুতা গ্রামে ১২৫৪ (১৮৪৭) সালের ৬ই শ্রাবণ আর রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় বুড়া বয়সে বাংলা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং গোড়াতেই 'কঙ্কাবতী' লিখিয়া বসেন। ১২৯৯ সালে 'কঙ্কাবতী' পুস্তকাকারে বাহির হয়, ইহাই ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ততদিনে ৩১ খানি বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা পাকাপোক্ত লেখক, সুতরাং বয়সে বড় নবাগতকে পিঠ চাপড়াইবার অধিকারী।

'কঙ্কাবতী'র গুণে আকৃষ্ট হইয়া বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী (দুই খণ্ড) পড়িলাম। গ্রন্থাবলীতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি স্থান পায় নাই, 'ময়না কোথায়!' উপন্যাসটিও গ্রন্থাবলীতে ছিল না; 'জন্মভূমি' ও অন্যত্র প্রকাশিত দুই-চারিটি গল্পও ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছিল। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখনই ত্রৈলোক্যনাথের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সমস্ত রচনাই সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেটিও পড়িয়াছিলাম। মোটের উপর ত্রৈলোক্যনাথ আমার এক রকম আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন। তবে প্রায় পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে ধারণা অনেকটা ফিকা হইয়া আসিয়াছিল।

যাহা হউক, নিরুপায় হইয়া 'কঙ্কাবতী' পড়িতে লাগিলাম। কুসুমঘাটী গ্রামের মেয়ে-বেচা তনু রায়ের তৃতীয়া কন্যা কঙ্কাবতী এবং প্রতিবেশী বিধবা এক ব্রাহ্মণীর পুত্র খেতুর আশৈশব পরস্পর ভালবাসা জন্মিয়াছিল। খেতুর মা ও কঙ্কাবতীর মা দুজনেরই ছেলেমেয়ের বিবাহে সম্মতি ছিল, কিন্তু তনু রায়ের মতলব হইল অশীতিপর বৃদ্ধ সদ্য-বিপত্নীক গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরীকে মেয়ে বেচিয়া এক কাঁড়ি টাকা হস্তগত করিবেন। খেতু বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইল, তনু রায়কে এবং শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জনার্দন চৌধুরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বিপদ গণিয়া তনু রায় ও জনার্দন চৌধুরী ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতায় সাহেবদের কলে প্রস্তুত বরফ খাওয়ার অপরাধে খেতুকে ধর্মে পতিত ঘোষণা করিয়া একঘরে করিলেন। খেতুর উপর নানারূপ অত্যাচার চলিতে লাগিল। খেতু মাকে লইয়া দেশত্যাগী হইতে মনস্থ করিল, কিন্তু কঙ্কাবতীর বিবাহ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। এদিকে আশাভঙ্গে মনঃকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় বিবাহের সাত দিন পূর্বেই কঙ্কাবতীর জ্বর হইল, একেবারে ঘোর জ্বর-বিকার। যেদিন বিবাহ হইবার কথা সেদিন তাহার "জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। লোক চিনিতে পারেন না, কঙ্কাবতী এখন যান, তখন যান।"

গল্পের এই অবধি মোট ২৮৪ পৃষ্ঠার বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠা শেষ হইল, ইহার পর ২৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত কঙ্কাবতীর বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন; মাছ কাঁকড়া ব্যাঙ বাঘ স্কেলিটন হাড় ভূত মশা চাঁদ সকলেই মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কাবতীকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, খেতু, খেতুর মা এবং কঙ্কাবতীর মা-বাবা ভাইবোন, এমন কি গ্রাম-সমাজের সকলেই বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ; "পরিশেষে" ১২ পৃষ্ঠায় কঙ্কাবতীর জ্বর-বিকার ছাড়িয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

"কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল?

মা বলিলেন—হাঁ বাছা! আজ বাইশ দিন তুমি শয্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে সে আশা ছিল না।

কঙ্কাবতী বলিলেন—মা! আমি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটি আমার মনে এরূপ গাঁথা রহিয়াছে যে, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা আসিতেছে।... স্বপ্নে দেখিলাম কি মা, যে গায়ের

জ্বালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর একখানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাখানি আমার ডুবিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাহাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছুদিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। সেখান হইতে শ্মশান-ঘাটে যাইলাম। তাহার পর পুনরায় বাড়ী আসিলাম। এক বৎসর পর আমাদের বাড়ীতে একটী বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে যাইলাম। তারপর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। স্বপ্নটা যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! সে দলাদলির কি হইল?

মা উত্তর করিলেন,—সে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়াছে।... তুমি ভাল হইলে খেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর এ কথার অন্যথা হইবে না।"

শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল, পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়-জয়কার।

দীর্ঘ বইখানি একটানা পড়িয়া ক্লান্তি আসিয়াছিল। আমি বিছানা আশ্রয় করিয়া চোখ বুজিলাম। হয়তো একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল। হঠাৎ কাশির শব্দে চমকিয়া জাগিয়া বসিলাম। অবাক কাণ্ড! ঘরের মেঝেতে একটা চেয়ার ছিল—বলা নাই কহা নাই, পক্কশ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তাহাতে বসিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কাশিতেছেন, মৃদু মৃদু হাসিতেছেনও। আমি একটু বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, কে আপনি? কি চান?

বৃদ্ধ বলিলেন, আমি তো কিছুই চাই না। তুমিই আমাকে স্মরণ করিতেছিলে, তাই আসিলাম। আমি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, তিনিই বটেন। ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্বাদ করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি মেঝের উপরেই তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম। 'কঙ্কাবতী'খানা কোলের উপর রাখিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, দেখ, তোমরা সবাই আমাকে ভুল বুঝিয়াছ। আমি বালক মনোরঞ্জক গল্প লিখিবার জন্য কলম ধরি নাই। আমি এই সত্যটাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সততা ও সুনীতিই মানুষের একমাত্র রক্ষাকবচ, সংসারে ও সমাজে বাস করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করিতে করিতে যে সাধ্যমত পরের উপকার করিবে, তাহার মার নাই। যাহার স্বার্থবুদ্ধি প্রবল সে কখনও ন্যায়ের পথে এবং সত্যের পথে চলিতে পারে না। পরোপকার-প্রবৃত্তি যাহার হৃদয়ে আছে তাহার ন্যায় এবং সত্যও আছে। এই পথে যে চলিবে তাহাকে শুধু পরকালের ভরসাতেই থাকিতে হইবে না, ইহজীবনেই সে সৎকর্মের ফলভোগী হইবে। যে স্বার্থান্ধ পাপী, পরের অকল্যাণ করিয়াই যাহার সুখ, যে সংসারে সমাজে বাস করিয়া শুধু আত্মসুখই অন্বেষণ করিয়া থাকে, ইহলোকেই তাহার পরিণাম ভয়াবহ। আমার দীর্ঘ সুখদুঃখময় বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই সত্য প্রচার করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম; শুধু মানুষের কাহিনী বলিয়া এই কথা বুঝানো কঠিন হইত বলিয়াই আজগুবি ভূতপ্রেত দৈত্যদানব পশুপক্ষীর সাহায্য আমাকে লইতে হইয়াছিল। আমি নিছক ভুতুড়ে গল্প বলিবার জন্য 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'র শরণাপন্ন হই নাই। তোমরা ভুল করিয়া আমাকে শিশু-সাহিত্যিকের পর্যায়েই ফেলিয়া রাখিলে, আর জীবন দর্শনকে জীবনে কাজে লাগাইলে না।

ত্রৈলোক্যনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। আমার মন ব্যথিত হইল। তাঁহাকে অনামনস্ক করিবার জন্য বলিলাম, দেখুন, অপরাধ আমাদের নয়। কবে সেই ১৩০৪ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণের (৭ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা) 'জন্মভূমি' পত্রিকায় আপনার বাল্যশিক্ষা ও কর্মময় জীবনের একটা খসড়া আপনি স্বয়ং লিখিয়া হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক নিবন্ধ "বাঙ্গালা ভাষার লেখকে" ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহাই ১৩১১ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' নামীয় পুস্তকে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার অধিক কিছু তো আর আপনার সম্বন্ধে লেখা হয় নাই। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় আপনার জীবনী লিখিতে গিয়া সেইটাই উদ্ধৃত করিয়া কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যও আপনার 'কঙ্কাবতী'র উপর থীসিস লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও আপনার কথা কিছুই লিখেন নাই। আপনি লোকলোচনের

এমনই অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছেন যে, প্রবীণ অধ্যাপকের বিপুলকায় বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধীয় সমালোচনা পুস্তক হইতে বেমালুম বাদ পড়িয়াছেন। আপনার বইগুলিও আর পাওয়া যায় না; কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে অথবা হাতিবাগান বাজারের মধ্যে 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে ছাপা আপনার দুই একখানি বই ক্বচিৎ কখনও দেখা যায় বটে। কিন্তু আপনার নামের সঙ্গে বর্তমানে পরিচয় না থাকাতে এ যুগের সংগ্রাহকদের নজরে সেগুলি পড়ে না। সবাই মিলিয়া একটু ভুয়া রব তুলিয়া দিয়াছেন, আপনি আজগুবি ভুতুড়ে গল্প লিখিতেন। সুতরাং আমরা যদি আপনার সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করি, আমাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি?

ত্রৈলোক্যনাথ ম্লান হাসিয়া বলিলনে, না না, তোমাদের দোষ কি, দোষ আমার অদৃষ্টের। 'কঙ্কাবতী' 'ডমরু-চরিত' ছাড়া আমি 'ফোক্‌লা দিগম্বর' 'পাপের পরিণাম' ও 'ময়না কোথায়'ও তো লিখিয়াছিলাম। ন্যায় ও সত্য আশ্রয়ী লোকেদের এগুলিতে অনেক আশার কথা আছে। যাহারা স্বভাবতই অথবা বিকৃত শিক্ষার দোষে পরের অহিত করিতে চায় তাহারা আমার লেখায় পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখিলে সাবধান হইতে পারে। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও পারিবারিক মানুষের সংস্কার, তাহাকে প্রতিবাসী ও দেশবাসীর প্রতি দরদসম্পন্ন করা; পরের হিত করিবার জন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নির্দেশ আমার লেখায় আছে। সত্য বটে সামাজিক কুসংস্কার দূর করা আমার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, সৌভাগ্যের বিষয় কালধর্মে ও শিক্ষার গুণে সামাজিক বহু অন্ধতা, জড়তা ও বিধি-নিষেধ তোমরা অতিক্রম করিয়াছ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক মন তোমরা এখনও লাভ কর নাই। দেখ, এক কাজ করিতে পার? তাহাতে তোমাদেরই উপকার হইবে।

আমি সোৎসাহে বলিলাম, বলুন।

ত্রৈলোক্যনাথ পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, আমি বিজ্ঞান, কৃষি, প্রাণী-তত্ত্ব ও কারুশিল্প বিষয়ে অনেকগুলি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেগুলি হারাইয়া গিয়াছে। কাহারও দেখিবার উপায় নাই। সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'তে যেগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার উদ্ধার আর সম্ভব নয়; কিনত্ু 'জন্মভূমি' মাসিকে যেগুলি বাহির হইয়াছিল সেগুলি তো সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়া দিতে পার। তোমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'জন্মভূমি'র পুরাতন সংখ্যাগুলি আছে। এগুলি ছাপিলে এখনও দেশের হিত হইবে। আমি একটা তালিকা করিয়া রাখিয়াছিলাম। শোন—

'জন্মভূমি'	১ম বৎসর (১২৯৭-৯৮)	ভারতে সুবর্ণ--পৃষ্ঠা	৩৩—৪৩
		লৌহ (১)	৮৩—৯৪
		ঐ (২)	১২৯—১৪০
		ঐ (৩)	২১৫—২১৯
		ঐ (৪)	২৩৭—২৫২
		ইস্পাত	৩৩৩—৩৩৬
		বিড়াল	৩৭১—৩৮৪
ঐ	২য় বৎসর (১২৯৮—৯৯)	পশম (১)	৯৮—১০৬
		এরণ্ড বা রেড়ি	২৪৫—২৫৬
		গজ দন্ত	৩১৬—৩২২
		পশম (২)	৩৭২—৩৭৫
		পাথুরে কয়লা (১)	৪৩২—৪৩৬
		ঐ (২)	৫৩৭—৫৪৩
		ঐ (৩)	৬০৭—৬১২
ঐ	৩য় বৎসর (১২৯৯—১৩০০)	পাথুরে কয়লা (৪)	৩৩—৪৬

		সেফটি ল্যাম্প	৩৯৩—৪০৩
ঐ	৪র্থ বৎসর (১৩০০—১৩০১)	গ্যাস	১—১০
		গুটি কত ধাতু	৯১—৯৪
		নূতন বৃক্ষ	২৬৭—২৭০
		বায়ু	৪২৬—৪২৭
		সুগন্ধ	৫৬৫—৫৭২
		এড়ি রেশম	৭৬৫—৭৭০
ঐ	৫ম বৎসর (১৩০১—১৩০২)	নূতন কথা (১)	৪৬৯—৪৭১
		ঐ	৫৭২—৫৭৪
		ঐ	৬২৪—৬২৮

ইহা ছাড়া শিশুপাঠ্য 'সখা' ও 'সখা ও সাথী' পত্রিকাতেও আমার কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এইগুলি যদি পুস্তকাকারে প্রচারিত হইত আমি তৃপ্তি পাইতাম। দেশের কাজও হইত।

প্রবন্ধের পুস্তকের বাজার যেরূপ মন্দা আমি কোনও উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। বুদ্ধিমান ত্রৈলোক্যনাথ বুঝিলেন, ও প্রসঙ্গ আর তুলিলেন না। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, আমার উপন্যাস গল্পগুলি তোমার কেমন লাগে?

বলিলাম, চমৎকার, তবে এ যুগের পাঠকেরা আপনাকে বড্ড বেশি নীতিবাগীশ বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, আপনার উদ্দেশ্য এত প্রকট হইয়া দাঁড়ায় যে, আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়। 'ময়না কোথায়?' উপন্যাসের নরোত্তম মাশচটক ও তদীয় গৃহিণীকে আপনি পরিণামে কি ঘোর শাস্তিই না দিয়াছেন! হাসির প্রলেপ আছে বলিয়া 'ফোক্‌লা দিগম্বরে'র ভীষণ পরিণতি সহ্য হয় কিন্তু 'পাপের পরিণামে'র নাককাটা সন্ন্যাসীর কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। এ যুগের পাঠকেরা নিয়তিকে অতখানি অমোঘও মনে করে না, অতখানি নির্দয়তাও বরদাস্ত করে না। কাজেই আপনি কঙ্কাবতীর ভুতুড়ে স্বপ্ন এবং ডমরুধরের আজগুবি কাহিনীরই লেখক হইয়া রহিলেন। আপনার জন্য আমার দুঃখ হয়।

ঋষিকল্প ত্রৈলোক্যনাথ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, আমার জন্য দুঃখ করিও না বৎস। আমি সুখদুঃখের অতীত লোকে বর্তমানে অবস্থান করিতেছি। জীবনে যে কর্মে আমার অধিকার ছিল তাহাই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছিলাম। ফলের প্রত্যাশী হই নাই। আমার জীবন তো বিফল নহে। যে সকল সংস্কার আমি চাহিয়াছিলাম তাহার সকলগুলিই তো সাধিত হইয়াছে। যে সাহিত্য আমি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার সকলগুলিই তো সাধিত হইয়াছে। যে সাহিত্য আমি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আজ অনেকের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, বিজ্ঞানে কৃষিতে বাঙালীর মতি হইয়াছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, নামেব জয়ধ্বনি নাই থাকিল।

আমি হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম, তবে কি আপনার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে?

—না বৎস, একা ইচ্ছাময় ভগবান ছাড়া কোনও দেহধারী মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। আমার অতীত জীবনের একটু রহস্য তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করিতেছি, তাহা হইতেই বুঝিবে আমার মনস্কামনা কি ছিল।

১৮৭৫ সনে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব আমাকে প্রথম বিলাত লইয়া যাইবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'জাতি যাইবে' একারণে আমি সম্মত হইলাম না। ১৮৮২ সনে বিলাত লইয়া যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাকে পুনর্বাব বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। সেবারও সম্মত হইলাম না। ১৮৮৫ সনের ১৬ই নভেম্বর রাত্রিকালে বোম্বাই নগরে সমুদ্রকূলে মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে একখানি পাথরের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ঘোর নিশীথকাল, গভীর অন্ধকার, ঘন ঘন সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে পৃথিবী আলোড়িত হইতেছিল। স্বদেশের হিতের

নিমিত্ত তখন বিলাত যাত্রা স্থির হইল। কি করিয়া স্থির হইল, সে কথার আবশ্যক নাই। বিদ্যালয়ে আমি লেখাপড়া কিছুমাত্র শিখি নাই, কিন্তু তখন হইতে নানা বিদ্যা আমার প্রত্যক্ষ হইল, বিশ্বজগতের নানা রহস্য আমার নয়নগোচর হইল। বিলাতে যাইলে মহারাণী প্রভৃতি আমার যথোচিত সম্মান কবিযাছিলেন। যাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষে লোকে রাজা মহারাজা হইতে পারে, তাঁহারা সমকক্ষভাবে আমার সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাত যাইয়া যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র লাভবান না হই, যাহাতে অণুমাত্র স্বার্থচিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান না পায়, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। যদি উচ্চপদ বা উচ্চ উপাধি লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগকে আমি শিক্ষা দিতে পারিতাম না। জনসাধারণকে লোকে যেভাবে বিচার করিয়া থাকেন, আমার প্রতি যিনি সেই ভাব আরোপিত করিতে যাইবেন, তিনি ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইবেন।

যাঁহারা আমার নিকট শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে, এক্ষণে এই পৃথিবীর উপর আমাদিগকে কিছু খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। সামান্য পদদলিত মৃত্তিকা হইতে কোটি কোটি যোজন অন্তর নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর এই খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রচ্ছন্নভাবে হউক, কি প্রকাশ্যভাবে হউক, এই প্রকৃতি রাজ্যে এই বিশ্বজগতে মুহুর্মুহুঃ নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, একান্ত মনে এই সব ক্রিয়া অবলোকন করিয়া, কার্যকারণ অনুশীলন করিয়া জীবের হিতের নিমিত্ত প্রকৃতির আসুরিক বলসমূহকে পদানত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে কার্যকারণ অনুসন্ধান করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অতি সামান্য সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এক-একটি বিষয়ে এদেশে এমন এক-একটি পণ্ডিত আবির্ভূত হউন যেন পৃথিবীতে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় লোক না থাকে। কি দুরাশা আমার! বর্তমানের অবস্থা দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হয়! এই দেখ, আমাদের দেশে কিরূপ উদ্ভিদ আছে, তাহা কে জানে?—সাহেবরা। আমাদের মাটির ভিতর কিরূপ ধাতু আছে, তাহা কে জানে?—সাহেবরা। আমাদের বনে কিরূপ জীবজন্তু আছে, তাহা কে জানে?—সাহেবরা। আমাদের জলে কিরূপ মৎস্যাদি আছে, তাহা কে জানে?—সাহেবরা। অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর যেদিন হইবে—'বাঙ্গালীরা', সেইদিন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

দেখ, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে উহাই আমার চিন্তা ছিল। আজ তোমরা নিজেরাই সর্ববিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছ, সকল বিষয়ের অধিকারী হইয়াছ, কাজেই তোমরা বৈজ্ঞানিক হও, সর্ববিদ্যাবিশারদ হও—আজ আমার সে কামনা নাই। আজ তাই আমার রচিত উপন্যাসগল্পগুলির গূঢ় মর্মার্থের দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, তোমরা ন্যায় ও সত্যকে আরও দৃঢ়ভাবে আশ্রয় কর। তোমরা সৎ হও, মহৎ হও, পরার্থপর হও। এই কথাটা বলিবার জন্যই আমি আসিয়াছিলাম। আর তোমাকে বিরক্ত করিব না।

এই বলিয়া ত্রৈলোক্যনাথ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য উঠিতে যাইব কোল হইতে 'কঙ্কাবতী'খানা সশব্দে মাটিতে পড়িল। আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি 'কঙ্কাবতী'খানি মাটি হইতে তুলিয়া মাথায় ঠেকাইলাম।*

* এই রচনায় ত্রৈলোক্যনাথের ব্যবহৃত ভাষাপদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।—লেখক।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত *কঙ্কাবতী* উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের (১৮৯২) কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি। ছবিগুলি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এ (কলকাতা) হিতেশ রঞ্জন সান্যাল স্মারক সংগ্রহে রক্ষিত।

সূত্র নির্দেশ

ক্রমিক সংখ্যা	ছবি শিরোনাম	কঙ্কাবতীর পৃষ্ঠা সংখ্যা	হি: র: সা: স্মারক সংগ্রহে সংরক্ষিত স্লাইড নং
১.	কন্যা	১৮৭	২
২.	মশা-প্রভু	২৩১	৫
৩.	ভূতিনী মাসী	২৫৪	৭
৪.	ক্ষোক্কস-শাবক	২৫৮	৮
৫.	চাঁদ ও দুর্দান্ত সিপাহি	২৬২	১০

ভূতিনী মাসী।

আকাশে সব চূণ-থান

খোক্কোশ-শাবক।

এখনও চক্ষু ফুটে নাই! নিতান্ত শিশু!

মশা-প্রভু।

এবারকার শাস্ত্র।

কন্যা।

নাকেশ্বরী অতি সুন্দরী ভূতিনী

চাঁদ ও দুর্দ্দান্ত সিপাহি

অত আর হাঁ করিতে হইবে না।
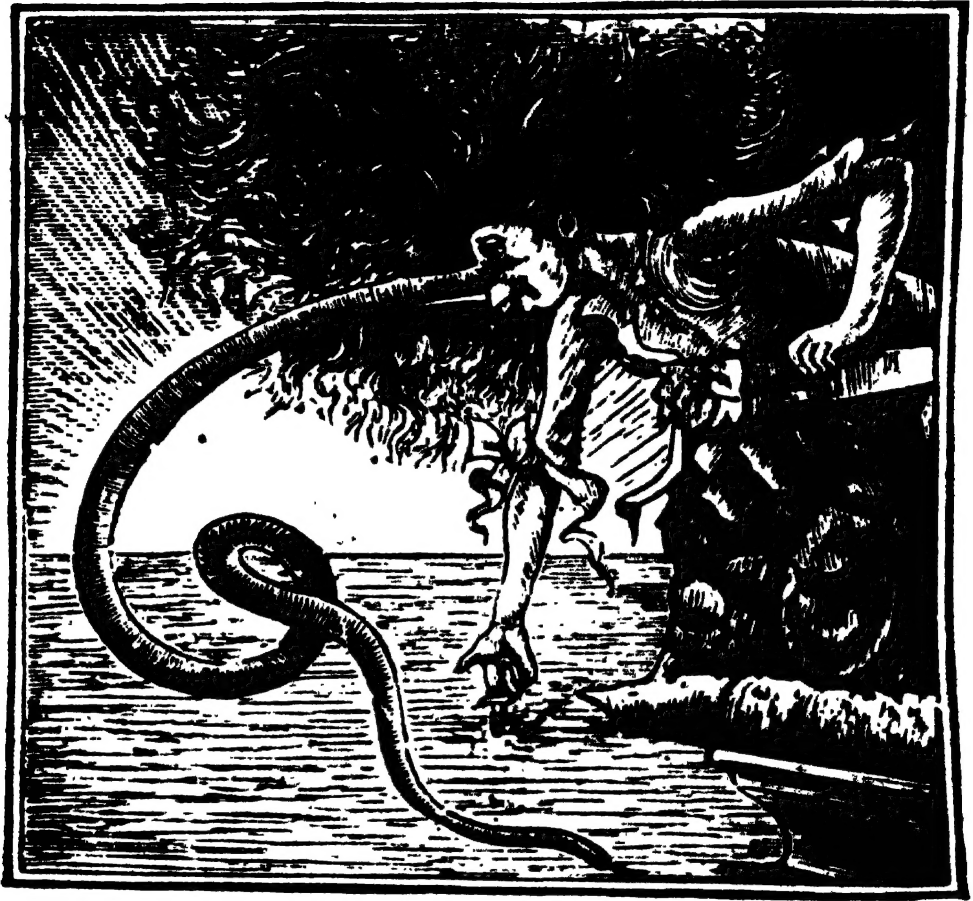
পঞ্জিকায় প্রকাশিত *কঙ্কাবতী*-র বিজ্ঞাপন

কঙ্কাবতী।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বঙ্গবাসীর পাঠকদিগকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় দিতে হইবে না। গল্প লেখায় তাঁহার কিরূপ নিপুণতা, তাহাও সকলে অবগত আছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতগুলি উপন্যাস-পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কঙ্কাবতী শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ। প্রায় তিন শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "একবার পড়িয়া দেখুন!" এই কথা ব্যতীত এ গল্প সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে পারা যায় না।

গল্প পাঠ করিতে করিতে হাসিতে হইবে, কাঁদিতে হইবে, ক্রোধে শরীর কম্পিত হইবে, ঘৃণায় মন ক্ষুব্ধ হইবে, পৃথিবীতে যাহা কিছু রস আছে, সেই সমুদয় রস আস্বাদন করিতে হইবে।. খেতুর মা যখন পুত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন পাষাণ হৃদয় কাহার আছে যে দুঃখিনার সেই সমুদয় কথা পাঠ করিতে করিতে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হইবে? —কে চক্ষুর জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিবে?

মূল্য সাত আনা, (কাগজে বাঁধাই) রাজসংস্করণ (উৎকৃষ্ট বাঁধাই) মূল্য ।৵০ নয় আনা। ডাঃ মাঃ যথাক্রমে তিন আনা এবং চারি আনা।

কলিকাতা, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে অথবা ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্তব্য।

* পুরাতন পঞ্জিকা, প্রথম খণ্ড, (১৮৪৪-১৮৭৪ পর্যন্ত), বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮-১৯